~~[illegible]~~ গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী।

তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে
তখন আমার হৃদয় তারি কাঁপে ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।

# রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্য

# রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্য

চিত্র ১



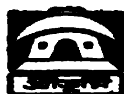
অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রসদন সংগ্রহ

# রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্য

সুগতা সেন



শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

**RABINDRANATHER GITASAHITYA**

**A Literary Appreciation of Tagore's Songs**

**By SUGATA SEN**

Published by Sribhumi Publishing Co.
79, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-9.

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৪ আশ্বিন ১৩৬৭ । ১৯৬০ অক্টোবর



প্রকাশক :
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার রায়
শ্রীসারদা প্রিন্টিং
৩১/১, ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ২৫·০

মা ( শ্রীযুক্তা রুচিরা সেন )

ও

বাপুজি ( শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন )

শ্রীচরণেষু

# আশীর্বাদ

শ্রীমতী সুগতা সেন

পরমকল্যাণীয়াসু

স্নেহের সুগতা, তোমার বইএর মুদ্রিত রূপ দেখে খুশি হয়েছি। পড়া শুরু করতে করতেই তোমার আলোচ্য বিষয় ও ভাষার আকর্ষণে মন এগিয়েই চলল। পড়া শেষ করার পরে অনেক কথাই মনে হল। সব লিখে জানাবার সময়ও নেই, বোধ করি প্রয়োজনও নেই। দেখা হলে বলতে পারি, যদি তখনও সব কথা মনে জেগে থাকে। এই চিঠিতে শুধু দু-একটি কথা তোমাকে বলব।

আমাদের চিরাগত পদ্ধতিতে বলা যায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির তিন প্রস্থান—বৈদিক প্রস্থান, এ যুগের সাংস্কৃতিক ঋক্থ বিধৃত ও বিন্যস্ত হয়েছে চার বেদে; বৌদ্ধ প্রস্থান, তার বাণীসম্পদ সংগৃহীত হয়েছে তিন পিটকে; আর পৌরাণিক প্রস্থান, এ যুগের প্রধান সংস্কৃতিভাণ্ডার মহাভারতের আঠারো পর্ব। এই তিন সংস্কৃতিসাহিত্যেরই একটি করে সংহত রূপ আছে। বৈদিক সংস্কৃতির মর্মবাণী প্রকাশ পেয়েছে উপনিষদে, বৌদ্ধবাণীর সংহত রূপ ধম্মপদ, আর মহা-ভারতীয় সংস্কৃতির সারনিষ্কর্ষ নিবদ্ধ হয়েছে ভগবদ্‌গীতায়। আধুনিক ভারতীয় মানসসত্তার চরম প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের বিচারে রবীন্দ্রসাহিত্যকে বলা যায় আধুনিক কালের মহাভারত। আর এই উপমার অনুসরণে গীতবিতানকে সহজেই রবীন্দ্রসাহিত্যের গীতা বলে বর্ণনা করা যায়। কেননা সমগ্র রবীন্দ্রসংস্কৃতির মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গানেই। তুমি রবীন্দ্র-সংগীতকে বহুব্যাপ্ত রবীন্দ্রসংস্কৃতির সংহত দীপ্তি বলে বর্ণনা করেছ আর বলেছ, 'এরই আলোকবর্তিকা রবীন্দ্রসাহিত্যের সমস্ত দুর্গম পথের নির্দেশ দিচ্ছে।' তোমার এই বর্ণনা ও মন্তব্য খুবই সত্য বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই প্রসঙ্গেই তোমাকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। গীতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন — "ভগবদ্‌গীতা আজও পুরাতন হয় নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবে না।" শুধু গীতা নয়, সব নির্যাস ও সংহত সত্যবস্তু সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য। আর তার ব্যাখ্যাও কখনই শেষ হয় না। কারণ সব সংহত সত্যবাণীরই নিহিতার্থ অফুরন্ত। মানুষের জীবনবিকাশ ও মনো-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওই নিহিতার্থের নূতন নূতন রূপ প্রকাশিত হতে থাকে। উপনিষদ, ধম্মপদ ও গীতা শত শত বৎসর যাবৎ অধীত, অনুধ্যাত ও ব্যাখ্যাত হয়ে চলেছে। কারণ, মানুষ এক যুগ থেকে যুগান্তরে উপনীত হচ্ছে আর তার কাছে এসব মহাবাণীর নূতন নূতন তাৎপর্য উন্মীলিত হচ্ছে। ব্যক্তিজীবন সম্পর্কেও এ কথা সত্য। নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, ইস্কুলে পড়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত সারাজীবনেও গীতা-উপনিষদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য-উপলব্ধি ফুরিয়ে যায় নি। শুধুই মনে হয়—'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে

তোমায় চেনা।' বিশ্বসত্য যেমন অশেষ, মানুষের জীবনসত্যও তেমনি অশেষ। গীতার ন্যায় গীতবিতানেও বিধৃত হয়েছে বিশ্বসত্য ও জীবনসত্যের বাণী। তবে কালের প্রভাবে গীতবিতানে ওই একই বাণী প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন আকৃতিতে ও ভিন্ন প্রকৃতিতে। তাই গীতবিতানের বাণী স্বভাবতঃই ব্যাপকতর, বিচিত্রতর ও গভীরতর তাৎপর্য বহন করে আমাদের প্রত্যেকের কাছে প্রকাশিত হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং জীবন-বিকাশের প্রতি পর্বে নব নব রূপে। তোমার জীবনেও গীত-বিতানের বাণীসত্যের প্রকাশ বিরতিহীন হক; আর তোমার ওই বাণীচর্চার প্রয়াসও তেমনি বিরতিহীন হক—তোমার প্রতি আমার এই আশীর্বাদ। মনে রেখো তোমার এই বই তোমার জীবনে রবীন্দ্রনাথের গীতবাণীচর্চার সূত্রপাতমাত্র। যদি এই বাণীসত্যকে জীবনসত্যরূপে উপলব্ধি করতে পার তবেই তোমার এই প্রয়াস সার্থক হবে এবং তোমার জীবনে এই গীতবাণীচর্চাও আপন প্রেরণাতেই অব্যাহত থাকবে।

রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে আজ পর্যন্ত যত বই প্রকাশিত হয়েছে সে সবেরই মূল লক্ষ্য তার সাংগীতিক প্রকৃতির পরিচয়দান বা বিচারবিশ্লেষণ। বোধ করি তোমার এই বইটিতেই রবীন্দ্রসংগীতের বাণীপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেবার প্রথম প্রয়াস দেখা গেল। এই হিসাবে এ বইটির একটি বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর গানকে তাঁর শেষ পারানির কড়ি বলে বর্ণনা করেছেন, সে কি শুধুই তাঁর গানের সুরসম্বলের ভরসায়? তাঁর 'সুরের রসিক নেয়ে' কি বাণীরসিকও নয়? বাংলা দেশে তো সুরসম্পদের অভাব ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে সুরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে আছে যে বাণীসম্পদ তার তুলনা কি কোথাও আছে? আসলে তাঁর গানের এই সুরাশ্রিত বাণীর মাধুরীতেই তিনি তাঁর খেয়ার নেয়েকে ভোলাতে চেয়েছিলেন। তিনি যে বাণীময় 'সুরের আগুন' জ্বালিয়ে গেছেন সে আগুন আজ সবখানে ছড়িয়ে গেছে। সে সুরের বাণী আজ বাঙালির জীবনের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে। যে সুরের বাণী একটা জাতিকে এমন সর্বতোভদ্র রূপ দিয়ে গড়ে তুলতে পারে সে কি কালের করক্ষেপে কখনও মলিন বা লুপ্ত হতে পারে? তাই তো এই কালজয়ী সুরবাণীর রূপকার তাঁর গানকেই বলে গেছেন তাঁর শেষ পারানির কড়ি। এই সুরবাণীর প্রথম ভাষ্যকার তুমি। আশা করি অচিরেই রবীন্দ্রনাথের গীতবাণীর ভাষ্যরচনার কাজে আরও অনেকেই এগিয়ে আসবেন এবং তুমিও তাঁদের সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই মহৎ জাতীয় কর্তব্যপালনে ও তোমার এই আরব্ধ কর্মকে পূর্ণতাদানে নিরত থাকবে।

শুভানুধ্যায়ী

প্রবোধচন্দ্র সেন

# ভূমিকা

'লীরিক' কথাটি পশ্চিম সাহিত্যে সংগীতের সঙ্গে যুক্ত, 'lyre'-এর ঝংকৃত ধ্বনি এবং ছন্দোময় বাণীসাধন ক্রমে কবিতায় মূর্ত হল। য়ুরোপীয় আদি সাহিত্যেও অবশ্য ছন্দোবদ্ধ কবিতা প্রথমে দেখা দিয়ে তা ক্রমে গানে রূপান্তরিত হয়েছে এমন সাক্ষ্য আছে কিন্তু ট্রুবাডোর ( troubadour ) গীতসাহিত্য, ফ্রান্সে, ইতালী ও স্পেনে এবং ক্রমে সমগ্র পশ্চিম সভ্যতায় সংগীত এবং কাব্যের পরস্পর-নির্ভরশীল রূপই ব্যক্ত করল—সুরশ্রুতি এবং বাক্যের গুঞ্জরণকে ভাগ ক'রে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হল। আজো আমেরিকায়, মেক্সিকোয় এবং অন্যত্র পথচারী গায়ক-গায়িকারা গীটার সহযোগে গান গেঁথে বেড়ান; কিছু তার পূর্ব-ঐতিহ্যের নানা ঘটনা ভাবনায় প্রসঙ্গিত, কিছু বা আমাদের আউল বাউল কীর্তনীয়া কবি-লড়াই দলের মতো সদ্যরচিত সুর ও বর্তমান সমাজচিত্রে গ্রথিত হয়ে দেখা দেয়। মানব-ইতিহাসের প্রাচীন পর্যায় হতে এই মিশ্রণ-রহস্য— সুর ও বাক্যের মিশ্রণ— চলে আসছে। মধ্যযুগের য়ুরোপে তার স্পষ্ট প্রাধান্য। এশিয়া-য়ুরোপের মধ্যবর্তী দেশগুলিতে বেদুয়িনের দল গানের কথকতা, এমনকি বেশ ব্যবহার, আচারের প্রভাব নানা সভ্যতায় ছড়িয়ে দিয়েছে। গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সেই আবহমান কালের গীতময় চলৎসাহিত্যে আধুনিক যুগেব শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সেই অর্থেই শিকাগোর প্রখ্যাত বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডিমক রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন 'The greatest Baul'।

শ্রীমতী সুগতা সেনের বইখানি পড়লেই বোঝা যায় কতখানি সংস্কৃতির অধিকার, কত বিচিত্র দর্শন এবং অনুভূতিশীল বিশাল অভিজ্ঞতা রবীন্দ্র-গীতাশ্রয় লাভ করেছে। বাউল কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ের অগম্য জ্ঞানানুশীলন, ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক বহু ধারণা রবীন্দ্র-গীতিকাব্যে অজস্র শিল্পিত হয়েছে। বোধ হয় জগৎসাহিত্যে এমন ঘটনা পূর্বে ঘটেনি। যে মানুষটি একাধারে সুরতন্ময় ধ্যানময় সাধক, বিজ্ঞানের নবতন দৃষ্টিকে যিনি ঋগ্বেদ, উপনিষদের অন্তর্দৃষ্টি এবং কম্মিক

( cosmic ) উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়েছেন, যিনি ভারতবর্ষের বহু ধর্মধারাকে 'আত্মসৃষ্টির' মানবিকতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁর তুল্য যুগ-সন্ধি যোগ-সন্ধির দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এলিজাবেথান লীরিকে স্পষ্ট গান শোনা যায়, বিশেষ করে সেক্‌স্‌পীয়রের অপরূপ প্রসাধনে, কিন্তু মায়িক এবং সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও সেই সব রচনার পরিধি প্রায়শই সাময়িক ইতিহাস-চেতনায় সীমিত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার যোগ ক্ষণোজ্জ্বল। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যগীতির যেন সীমা নেই। যে-জগৎকালে তিনি জন্মেছেন তা বিশ্বাধার, অজস্র সভ্যতার ঐতিহ্যপ্রসঙ্গ ভারতীয় চৈতন্যের সহযোগে তাঁর রচনায় অন্তঃশীল এবং মাটির উপর-স্তরে প্রবাহিত। মনে হতে পারে কথাটায় অতিবাদিত্ব আছে কিন্তু এই গ্রন্থের লেখিকা গীতবিতানের সমগ্রতা এবং বহু গানের বিশিষ্ট সংকল্প গ্রহমণ্ডলীর মতো একত্র উপস্থিত করেছেন। দু হাজার পঁচাত্তরটি গান আর রবীন্দ্ররচনাবলীর তিন হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর কবিতার প্রামাণিক যোগের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিছু গান ও কবিতা এখনো সংখ্যাগণনার বাহিরে রয়ে গেছে। এই মহাশ্চর্য ব্যাপারের আরো একটি দিক রাগরাগিণীর সুরসঙ্গম, মার্গ এবং লোকসংগীতের বিশেষত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় রীতির উদ্ভাবন ও পরীক্ষা। অপ্রত্যাশিত এবং বহুবিধ সুরসৃজনের অধ্যায়টি লেখিকা তাঁর গীতসাহিত্য আলোচনার অন্তর্গত করেন নি। স্বতন্ত্র গ্রন্থের অপেক্ষা রইল। কিন্তু প্রাঞ্জল, নিবিড় গবেষণার সৌকর্যে লেখিকা যুক্তি, তথ্য, উদাহরণ সহযোগে রবীন্দ্র-গীতপ্রতিভাকে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর অনুশীলনে বিশেষ ক'রে ভারতীয় সাংগীতিক কাব্যপ্রতিভার যুগল মূর্তি—অর্ধনারীশ্বর মূর্তি—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এত ব্যাপক অথচ সংহত বিশ্লেষণ পূর্বে দেখা দেয় নি। রবীন্দ্রপ্রতিভার উপরে বৈদিক, বৈষ্ণব, বৈদেশিক এবং লৌকিক বাংলা গান ও কাব্যের প্রভাব এই মৌল গবেষণায় বর্ণিত ও নির্ণীত হল। নিধুবাবুর টপ্পা, শ্রীধর কথকের গান, হরুঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবিদের রচনা রবীন্দ্রনাথেরই স্বীকৃতিসূত্রে ধরা দিল। আধুনিকতর রামপ্রসাদী, লালন ফকিরের গান, সারি গান, ভাটিয়ালি তাঁর কথা ও সুরকে স্পর্শ করেছে। লেখিকার ভাষায় 'ভাবানুষঙ্গে মীরা, নানক, কবীর প্রমুখ অ-বাঙালি গীতিকবিদের গানের ধর্মচিন্তা ও বাণীরূপ একাধারে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল।' আমরা জানি মীরার ভজন রবীন্দ্রনাথকে আজীবন প্রেরণা দিয়েছে। সমকালীন চারজন বাঙালি গীতরচয়িতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা ও আলোচনা পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে মূল্যবান।

বিরাট এই রবীন্দ্র-সাংগীতিক কাব্যধারা। গঙ্গা-মাতৃক বাংলায় গঙ্গা-যমুনা-পদ্মার

ত্রিবেণীসঙ্গম শুধু নয়, ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক স্রোতস্বিনী শতদ্রু, সিন্ধু, ঝিলম, নর্মদা, গোদাবরীর মতো শত শত শ্রুতিবাহী নদনদী রবীন্দ্রগীতিকায় মিলেছে; সমুদ্রপারের সংগীত এবং কাব্যের সংযোগও তাঁর সৃজনে অঞ্জলিত। সংগীতের বা কাব্যের উৎস-সন্ধান আমাদের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি-সাংগীতিকের ব্যক্তিগত চেতনায়, জীবন-সম্বিতে, স্মৃতিধর্মে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় যদিও তার বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রমানসে কত মেঘচ্ছায়া, সূর্যস্নাত ধানের ক্ষেত, নব পুষ্পপর্ণ সঞ্চারিত তা তাঁর গান শুনলেই বোঝা যায় যদিও বোঝানো যায় না; বীরভূমের তপ্ত গেরুয়া মাঠ এবং অবারিত দিগন্ত তাঁর কাব্য-গীতিতে অন্তর্লীন। আত্মজীবনের অকথিত বেদনা, দুঃখজয়ী আনন্দ তাঁর সুরের ও কথার সঙ্গতে গান হয়ে উঠেছে যা তাঁর আশ্চর্য চিন্তা ও ভাষার দক্ষতা সত্ত্বেও গদ্যরচনায় বা কাব্যশিল্পে প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ সে কথা জানতেন এবং বলেছিলেন আমার অন্য সব রচনা লুপ্ত হয়ে গেলেও আমার গান বেঁচে থাকবে। লেখিকা সেই অরূপবিভাসিত রূপের সন্ধানে রবীন্দ্রগানের সঙ্গমতীর্থে বারবার প্রবেশ করেছেন। সৌরভময়, ভাস্বর, চন্দ্র-অর্ক-প্রজ্জ্বলিত নিটোল পুষ্পের বীথিকার মতো রবীন্দ্রগানের ঋতু-উৎসব এই গানের বইয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে; বিশিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ এক একটি গান নিজস্বত্ব পেয়েছে। লেখিকার প্রয়াস সফল হয়েছে মনে করি। ভাববিন্যাস এবং তারও ঊর্ধ্বতর ধ্বনিবিন্যাসের বহু স্তর আমরা এই গ্রন্থের সহায়তায় উপলব্ধি করলাম। গীতবিতানে যে-কয়েকটি বিষয়গত বিভাগ করা হয়েছিল তার চেয়ে আরো বিশিষ্ট নির্দেশে গানগুলিকে আনন্দ, ধর্ম, প্রেম—এবং 'প্রেমের' বৈচিত্র্য ও ঐক্যনির্ণায়ক মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম আখ্যায় গানের বিভাগ আমাদের কাছে সঙ্গত মনে হয়েছে। যা কোনো স্পষ্ট বিভাগের বাইরে তাকে 'বিবিধ' প' স্বর অন্তর্গত করাও সমর্থনীয়। অবশ্য এই বিভাগগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, বিচ্ছিন্ন নয়; গানের মুহূর্তে সীমাচিহ্নগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

রবীন্দ্রগীতসৃষ্টির পারম্পয এই গ্রন্থে রক্ষা করা হয়েছে অথচ তার প্রতি স্তরের একটি সার্বিকতা এবং সমগ্র গীতচৈতন্যের প্রসার,—ক্ষুদ্রতম গানের সঙ্গে কবির বিশাল বাণী-সংগীতের এক ধারা—আমরা যেন মোহানার কাছে এসে দেখছি। লেখিকা ছন্দের অনুশীলনে দক্ষ, কবিতায় শ্রুতি স্মৃতি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানময় উপলব্ধির রহস্যানুসন্ধানী, বাংলা গানের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তিনি আয়ত্ত করেছেন কিন্তু সকলের চেয়ে যেটা দুর্লভ এবং যার উপরে শিল্পবিবৃতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, সেই প্রারমিক আত্মোপলব্ধি—এবং একাত্মকতা—তাঁর রচনায় প্রমাণিত। মননসিদ্ধ

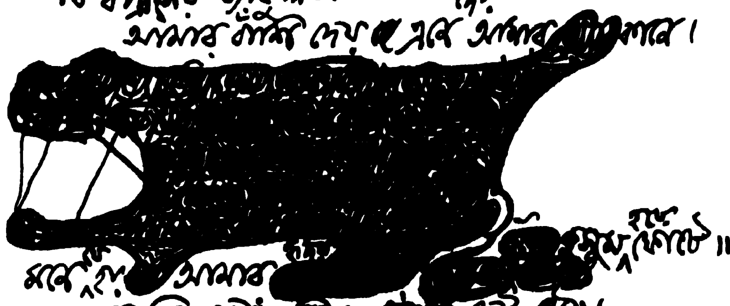
অথবা শুধুমাত্র কল্পনাপ্রবণ কৃতিত্ব যেখানে পৌঁছয় না এই গ্রন্থে স্বভাবের সেই সহজ গভীরতা এবং পরিণত প্রকাশ দেখতে পাই। অসামান্য পরিশ্রমের কুশলতা রচনাটিকে দৃঢ় স্থাপত্যের ধারণশক্তি দান করেছে। অন্যান্য গীতসমালোচক এবং রবীন্দ্র-ভাষ্যকার, শ্রীমতী সুগতা সেনের এই গ্রন্থে দুরূহ পথের সন্ধান এবং নূতন প্রেরণা লাভ করবেন — এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অমিয় চক্রবর্তী

চিত্র ২

৮২

36 যায় নিয়ে যায়
আমায় আপন গানের টানে।
ঘর ছাড়া কোন্ পথের পানে।
নিত্যকালের গোপন কথা
বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশি দেয় এনে আমার কানে।



মনে হয় আমার
আমার হিয়া উছলিয়া সাগর ঢেউ ওঠে।
পরাণ আমার বাঁধন হারায়
নিশীথরাতের তারায় তারায়,
আকাশ আমায় কয়, কি যে কয় কেই বা জানে!

— ॥ —

কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ পারানির কড়ি।
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি।
আমার সুরের রসিক নেয়ে
তারে ভোলাব গান গেয়ে,
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি।

পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে।
দূরের হাওয়া ডাক দিল এই সুরের পাগলাকে।
ওগো তোমরা মিছে ভাব,
আমি যাবই যাবই যাব
ভাঙুক দুয়ার লাগুক দড়াদড়ি॥

পাণ্ডুলিপি 'যায় নিয়ে যায়' এবং 'কণ্ঠে নিলেম গান' (১৬২)

রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ

# নিবেদন

বাংলাদেশ ও বাঙালির জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। বাংলা সাহিত্যকেও অপরিসীম সমৃদ্ধিদান করেছে রবীন্দ্রনাথের গান। সুরের সহযোগিতা ছাড়াও গানগুলির কাব্যরসপানে অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করা যায়। এ বিষয়ে মনস্বী কবি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী বলেছেন, 'ছোটো ছোটো লীরিকের ভিতর দিয়ে যে কাব্যরস মনে সঞ্চারিত হয় তারই পরিবেশন করা রবীন্দ্রনাথেব সাজানো গীতবিতানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ; সব গান খুব ছোটোও নয়। বিশুদ্ধ গীত-কবিতার বিশ্বসাহিত্যে এই রচনাগুলির কোনো তুলনা আছে বলে জানি না।'

রবীন্দ্রসাহিত্য-রত্নাকরে সংগীতগুলিই যে সর্বোত্তম রত্ন — এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন।

"কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ পারানির কড়ি
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি।
আমার সুরের রসিক নেয়ে
তারে ভোলাব গান গেয়ে
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি।"

গান তাঁর বাণীর প্রতীক, তাঁর প্রেরণা, প্রাণের সঙ্গে পৃথিবীর সেতু। গানের সুরে বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে তাঁর যোগ, গীতলীলার মধ্যে প্রিয়ার সঙ্গে বিরহমিলন সাধিত। নিজের গানের সুরে তিনি পথভোলা, আত্মহারা।

কবিগুরুর ধ্যানের ধন শান্তিনিকেতনের আকাশে, বাতাসে, 'খোলা মাঠের খেলা'য় রবীন্দ্রসংগীত জড়িয়ে আছে। আজন্ম সেই পরিবেশে বড়ো হয়ে রবীন্দ্রনাথের গান কখন্ যে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে টের পাই নি। সচেতনভাবে রবীন্দ্র-গানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলাম যখন পড়ি শান্তিনিকেতন 'পাঠভবন'-এ। আর তারপরে যখন সুযোগ এল তখন আমার গবেষণার বিষয়রূপে রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্যকেই নির্বাচন করবার কথা মনে এল সর্বাগ্রে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের এক মহৎ ও বৃহৎ অংশ রবীন্দ্রনাথের গান। গীতবিতানে সংকলিত গানের সংখ্যা মোটামুটি দু'হাজার পঁচাত্তর ( ২০৭৫ ) ; আর রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ( পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ) সংকলিত কবিতার সংখ্যা মোটামুটিভাবে তিনহাজার পাঁচ শো পঁচাত্তর ( ৩৫৭৫ )। অবশ্য কিছু কবিতাই পরে গীতরূপ লাভ করেছে। তথাপি দেখা যাচ্ছে বিশ্বকবির রচিত কবিতার

তুলনায় তাঁর লেখা গানের সংখ্যা তুচ্ছ নয়। তবে গানের আকার ও আয়তন ক্ষুদ্র বলে সমগ্র গীতাবলী একটিমাত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। ভাবের দিক থেকেও গানগুলি সম্পদে, ঐশ্বর্যে, বৈচিত্র্যে ন্যূন তো নয়ই, হয়তো সমৃদ্ধতর। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গানগুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। সেই ত্রুটি অন্ততঃ কিছু পরিমাণে পূরণের ইচ্ছাও আমাকে এই কাজে প্রণোদিত করেছে।

গানগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেও গীত-সংকলনে কাব্যগ্রন্থাবলীর মত কালানুক্রম রক্ষিত হয় নি। অবশ্য এর কারণ আছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম গীতসাহিত্যিক। তাঁর পূর্বে আর কোনো লেখকের ব্যক্তিগত গানের বহু প্রকাশের প্রথা ছিল না — যা ছিল সবই সংকলনগ্রন্থ। তাই কালানুক্রমিক সংগীত-সংকলনের কোনো পূর্বপ্রচলিত আদর্শ রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল না। কবির প্রথম গানের বই 'রবিচ্ছায়া' যখন প্রকাশিত হয় ( ১২৯২ ), তখন বিষয়ানুক্রম অনুসৃত হয়েছিল। 'গীতবিতান' প্রথম সংস্করণ কালানুক্রমিক হলেও দ্বিতীয় সংস্করণে কবি স্বয়ং গানগুলিকে 'ভাবের অনুষঙ্গ' রক্ষা করে সাজিয়েছিলেন, তার ফলে গানগুলির সামগ্রিক কালক্রম হারিয়ে গেছে। এই অপূর্ণতা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় এবং সেই ত্রুটি মোচনেরও আশু প্রয়োজন আছে। তবে বর্তমান গ্রন্থে সেই চেষ্টা আমি করি নি।

এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের গানগুলির কাব্যগত উৎকর্ষবিচার, পাঠসংক্রান্ত বা ঐতিহাসিক বিচার নয়। তবে রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যমূল্য নির্ধারণে তাদের ঐতিহাসিক পটভূমি বা পাঠগত আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জন করা-সম্ভব নয়, সংগতও নয়। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থে সেজাতীয় আলোচনাকে যথা-সম্ভব স্বল্প পরিসরে নিবদ্ধ রাখতেই চেষ্টিত হয়েছি। কেননা, রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বিচার দীর্ঘসময় ও বহুশ্রমসাপেক্ষ স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়।

সংগীত, বিশেষতঃ বাংলা সংগীতে প্রথমাবধি কথা ও সুর অচ্ছেদ্য পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন গানের 'অর্ধনারীশ্বর মূর্তি'। রবীন্দ্রগানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের পক্ষে তার বাণীরূপের সঙ্গে সঙ্গে তার গীতরূপের বৈশিষ্ট্যবিচারও সমান প্রয়োজনীয়। তবে এই গ্রন্থে আমি স্বতন্ত্র ও বিপুল সেই গীতাংশের আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি কারণ তার জন্য যে বিশেষ প্রাকরণিক জ্ঞান ও অধিকার থাকা প্রয়োজন তা আমার নেই। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুর-

তালের কথাও কিঞ্চিৎ উত্থাপন করতে হয়েছে। কেননা রবীন্দ্রসংগীতের সাহিত্যিক মূল্যনিরূপণে সুরতালের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জন করা চলে না। গানের নিতান্ত সরল ও সহজ কথার অর্থও অনেক সময় সুরতালের যোগে অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গীতিকবিতা বলতে বোঝায় লিরিক, যা আজকাল সুরে তালে গীত না হলেও এমন একজাতীয় কবিতা যাতে কবিমনের 'বেদনার গীতোচ্ছ্বাস' স্বতঃই প্রকাশ পায়। তাই এজাতীয় কবিতা বাংলায় 'গীতি'-কবিতা নামে পরিচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সংগীতের বাণীময় রূপকে বলেছি 'গীতরচনা' — যা মূলতঃ গান, 'সুরে বসানো' বা সুরে বসানোর জন্যেই লেখা। অবশ্য মূলতঃ কবিতা হলেও পরবর্তী কালে গানে পরিণত — এইজাতীয় গীতরচনাও কম নয়, তাদের কথাও অল্পবিস্তর বলা হয়েছে।

এই গ্রন্থের সাধারণ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে গ্রন্থের 'বিষয়-ক্রম'-শীর্ষক অনুক্রমণিকাতেই। তবু এখানে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের কথা বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রসংগীতের কোনো আলোচনাই সেগুলির বিবর্তন-ক্রমনিরপেক্ষ হতে পারে না। কিন্তু পূর্বেই বলেছি গীতবিতানে ধৃত গীতরচনা-গুলির কালক্রমনিরূপণ সহজসাধ্য নয়। তাই বর্তমানে সবগুলি রচনাকে মোটামুটি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেই কাজ চালাতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই রচনাগুলিকে বিভিন্ন ভাববর্গে সাজানো আরও দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথও একসময়ে ওভাবে সাজাতে গিয়ে তার দুঃসাধ্যতা কতখানি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই পরে তিনি গানগুলিকে কয়েকটি মাত্র স্থূল পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। তার একমাত্র লক্ষ্য বিভিন্ন উপলক্ষে গাইবার জন্য গান নির্বাচনের সুবিধা। কিন্তু এই পর্যায়-বিভাগ ত্রুটিহীন নয়। তা ছাড়া এই স্থূল পর্যায়গুলির উপর নির্ভর করে রবীন্দ্র গানের ভাববৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের গীতময় ভাবানুভূতির সূক্ষ্মতর পরিচয় দেবার প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত পর্যায়বিভাগ-গুলির কয়েকটি উপবিভাগ স্বীকার করে নিতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই উপবিভাগগুলিও মোটামুটিভাবে কাজ চালাবার উপযোগী, অধিকতর গুরুত্ব পাবার অধিকারী নয়। তৃতীয়তঃ, একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে রবীন্দ্র-গীতরচনার ভাষা, ছন্দ ও অলংকার-গত কলাবৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেছি। কারণ এই গানগুলির রচনাগত কলাবৈচিত্র্য সেগুলির ভাব, সুর, তাল ও লয়-গত কলাবৈচিত্র্যের সঙ্গে অপরিহার্যরূপেই সমন্বিত। ফলে এই গীতরচনাগুলির ভাষা,

ছন্দ ও অলংকারগত কারুবৈচিত্র্য স্বকীয় বিশিষ্টতা ও ঐশ্বর্যে সমুজ্জ্বল। এমন বৈচিত্র্য, বিশিষ্টতা ও ঐশ্বর্য সাধারণ আবৃত্তিযোগ্য কবিতায় অপ্রাপ্য ও অপ্রত্যাশিত। অধিকন্তু অন্য কারও গীতিরচনায় এমন অফুরন্ত কলাবৈচিত্র্য দেখা যায় না। অথচ এই কলাসৌন্দর্যের রত্নখনির প্রতি এখনও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি বললেই হয়। তাই এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসাধনকলার দিক্‌টাকে উপেক্ষা করা সমীচীন মনে করি নি। চতুর্থতঃ মানুষের মনে অন্যনিরপেক্ষ চিন্তার কোনো স্থান নেই। রবীন্দ্রগানের কাব্যমূল্যনিরূপণও অনন্যসাপেক্ষ হতে পারে না। তাই রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যমূল্যবিচারের ক্ষেত্রেও প্রাচীন ও সমকালীন অন্য রচয়িতাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আপেক্ষিক বিচারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছি। কিন্তু তাও করা হয়েছে স্বল্প পরিসরে ও মোটামুটিভাবে। আসল কথা, এই গ্রন্থে আমি রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গের একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি এবং কোনো বিশেষ অঙ্গের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে সব অঙ্গের আলোচনায় যথাযোগ্য অনুপাতে সমতা রক্ষার প্রতি লক্ষ রেখেছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্যের প্রত্যেক অঙ্গ অন্য সব অঙ্গের সঙ্গে অতি নিগূঢ়ভাবে আত্মিক সম্পর্কে সমন্বিত। এই সমন্বয়সৌষ্ঠবই রবীন্দ্রসংগীতের সৌন্দর্যসুষমার মূল কারণ। এইজন্যই গীতকবি রবীন্দ্রনাথ সর্বশিল্পের অধিগম্য 'অধরা মাধুরী'কে তাঁর গানে ছন্দ-বন্ধনে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। এই সমন্বয়-সৌষম্যের প্রতি লক্ষ না রেখে রবীন্দ্রসংগীতের কোনো এক অঙ্গের বিশদ পরিচয় দিতে গেলে একদেশ-দর্শিতার দোষ এড়ানো দুঃসাধ্য। তাই রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের কোনো বিশেষ অঙ্গকে প্রাধান্য না দিয়ে তার সর্ব অঙ্গের সংক্ষিপ্ত অথচ সু-সম পরিচয়দানই এই গ্রন্থের মূল লক্ষ্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এক কথায়, এই গ্রন্থ রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনার প্রাথমিক কাঠামোরূপে পরিকল্পিত। যদি এই গ্রন্থের দ্বারা রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গের পরিপূর্ণ পরিচয়দানের পথ কিছুমাত্র সুগম হয় তা হলেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থটি মূলতঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি-পরীক্ষার গবেষণা-নিবন্ধরূপে রচিত হয়েছিল। পরীক্ষান্তে উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে পি. এইচ ডি. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই উপলক্ষে আমি আমার সমস্ত শিক্ষাগুরু ও অন্যান্য নমস্য ব্যক্তিদের জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে নিবন্ধটিকে আদ্যন্ত যথোচিতরূপে পরিমার্জনা করে এটির উন্নতিবিধানে যত্নের ত্রুটি করি নি। কিন্তু অভ্রান্ত কেউ

নয়, আর এজাতীয় গ্রন্থকে সম্পূর্ণ ক্রুটিহীন ও দুর্বলতামুক্ত করা কিংবা সমস্ত মতভেদের নিরসন করাও সম্ভব নয়। যদি মনোযোগী পাঠক তথ্যগত বা অন্যবিধ কোনো ভ্রান্তি বা ক্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকৃতি জানাব ও পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থের ক্রুটিমোচনে যত্নবান্ হব।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার কাজে যাঁদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহায়তা ও প্রেরণা পেয়েছি তাঁদের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। সর্বাগ্রে স্মরণ করি কবি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর নাম। আমার এই সামান্য গ্রন্থের জন্য একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার সাহিত্যগুরু শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্যের অকুণ্ঠ সহায়তা ও আগ্রহ এই কার্যসাধনের প্রতি পদে আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছে। বিশেষভাবে স্মরণ করি আমার পিতা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের সাগ্রহ শিক্ষাদানের কথা। প্রতি পদেই তাঁর কাছ থেকে উপদেশ লাভ করে আমি রচনাকার্যে অগ্রসর হতে পেরেছি। এ ছাড়া আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য হিতৈষীদের কাছেও নানা সময়ে নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যথেষ্ট প্রেরণা ও সহায়তা পেয়েছি, তাঁদের সকলকেই জানাই আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

গ্রন্থ রচনার কালে যাদবপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী সাধারণ গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার ব্যবহারের অবাধিত সুযোগ পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রতিকৃতি ও চারটি পাণ্ডুলিপিচিত্র ব্যবহারের অনুমতি পেয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি ঋণী। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভবন সংস্থার শ্রীসনৎকুমার বাগচী ও শ্রীগৌরচন্দ্র সাহার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। আমার পিতার মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহও আমার বিশেষ উপকারে লেগেছে। দুষ্প্রাপ্য 'বাউল' গ্রন্থটি আমি তাঁর কাছেই পেয়েছি।

'শ্রীভূমি' প্রকাশন-সংস্থার অধিকর্তা শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থের বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন ছাড়া এই গ্রন্থের এমন সুষ্ঠু ও দ্রুত প্রকাশন সম্ভব হত না। প্রুফ-সংশোধক শ্রীধীরেন চক্রবর্তী, প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর যাঁরা আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

পি ৫১৫ রাজা বসন্ত রায় রোড
কলকাতা-২৯

সুগতা সেন

বিষয়ক্রম

চিত্রক্রম

পাণ্ডুলিপি-চিত্রের পার্শ্বস্থ বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যা বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির ক্রমাঙ্ক সূচক।

"খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের তরীখানি॥"

—গীতবিতান

"অতিদুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সংগীতে
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোটো এই বাঁশরিতে॥"

—'সোনার তরী', পুরস্কার

"গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্তকাল সেই তোরণের নিচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল—তার বেশি আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য।"

—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

## প্রথম অধ্যায়

# অবতারণা

## *রবীন্দ্র-পূর্ব গীতসাহিত্য*

### ১. বাংলা সাহিত্যে গীতরচনার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

গীতসাহিত্য অধুনা-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম সম্পদ। গদ্য ভাষার প্রচলনের পর থেকে বাংলা সাহিত্য বিভিন্নমুখী হয়ে উঠলেও, গীতরচনার ধারাটি অক্ষুণ্ণই থেকে যায়। বাঙালি স্বভাবতই গীতপ্রেমিক; তাই সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে গীতসাহিত্যেই বাঙালি-প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপটি ধরা পড়ে। বাংলা গীতসাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যাক্।

> "বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এ দেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্যবিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু, আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এ দেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে। গুন্‌গুন্ করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম 'তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে', তখনই দেখিলাম, সুর যে-জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না।"
>
> —'জীবনস্মৃতি', গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

অন্যত্র ভাষান্তরে বলেছেন—

> "কীর্তনে, বাঙালীর গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু শ্রীধরকথকের টপ্পা গানে, হরুঠাকুর রামবসুর কবির গানে, সংগীতের সেই যুগলমিলনের ধারা।"
>
> —'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা ৩

রবীন্দ্রসংগীতেও সেই ধারা অব্যাহত। একটু বিশদ করে বলা যাক্।

গদ্য ভাষায় লেখা প্রবন্ধ মূলতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য। তার আবেদন মানুষের চিন্তা-বৃত্তির কাছে। কিন্তু কবিতার মুখ্য আবেদন মানুষের হৃদয়বৃত্তির কাছে, তাই কবিতাকে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"কথাকে পদে পদে আড় করে দিয়ে ছন্দের মন্ত্র লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের জাদু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্দ্রজালে বাক্য সুরের সমান ধর্ম লাভ করে।"

—'সংগীতচিন্তা', কথা ও সুর

কবিতাতেও সেই কথা বলেছেন—

"মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে…।"

—'কাহিনী', ভাষা ও ছন্দ

ছন্দের জাদুস্পর্শে বাক্য অনির্বচনীয়তা লাভ করে। তথাপি তার মধ্যে যে কিছুটা বচনীয়তা থাকেই, সে কথা বলা বাহুল্য।

"অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁট বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। …বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে।"

—'সাহিত্যের স্বরূপ', কাব্যে গদ্যরীতি

ছন্দ বাক্যকে অনির্বচনীয়ের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু কখনই তা সম্পূর্ণ ভাবে অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ, ছন্দের জাদুমন্ত্রে কাব্য কিছু পরিমাণে সংগীতের ধর্ম গ্রহণ করলেও পুরোপুরি সংগীত হয় না। কেবলমাত্র সুরের তরী বেয়েই কাব্য যথার্থ অনির্বচনীয় আনন্দলোকের দিকে ভেসে যেতে পারে—বুদ্ধি, চিন্তা, মননের পথ যেখানে রুদ্ধ। গানেও বাণী আছে, সেই বাণীই সুর-তাল-ছন্দ-সমন্বিত হয়ে, আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করে ব্যঞ্জনার্থ লাভ করে এবং মনকে অনির্বচনীয় রসলোকে নিয়ে যায়। এই কারণেই বাংলা গানে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তার কাব্যাংশ অর্থাৎ বাণী ও বীণা সর্বদাই সমান আসন ও সমান আদর লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথও সেই ভাবে 'সুর অনির্বচনীয়ের প্রধান বাহন'—এ কথা স্বীকার করেই বাংলা সংগীতে কাব্যাংশের মূল্য নিরূপণ করেছেন—

"কথাকে সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দিগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ

করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলা গানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এই-সকল কারণে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা-কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।"

—'ছন্দ', বাংলা শব্দ ও ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেশবিশ্রুত সংগীতশিল্পী গ্লুক'এর (Gluck) বচন থেকে উদ্ধার করেছেন—

"My idea was that the relation of music to poetry was much the same as that of harmonious colouring and well-disposed light and shade to an accurate drawing, which animates the figures without altering their outlines."

—'সংগীতচিন্তা', কথা ও সুর ১

সকল দেশের সাহিত্যেই, গদ্যসৃষ্টির আগে কাব্য ও সংগীত সহোদরা ভগ্নীর মতো বড়ো হয়েছে। তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। বীণাপাণি ও বাগ্‌দেবী মূর্তি-পরিকল্পনাতেও তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(The) "mingling of music and poetry is a notable feature in the earlier stages of evolution in every language. ... Poetry and music were born as twins in the womb of nature. The sisters grew up together in the same cradle and had, at first, such an exact likeness, that it was hard to distinguish one from the other. Thus they passed for one goddess, were worshipped in one name, and received a joint homage."

—চন্দ্রমোহন ঘোষ: 'ছন্দঃসারসংগ্রহঃ', ১৮৯৩, ভূমিকা, পৃ ১

আমাদের দেশেও সাহিত্যের জন্ম কাব্য তথা সংগীতের পক্ষপুটে। বৈদিক যুগ থেকেই সংগীতে কথা ও সুর অঙ্গাঙ্গী। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি সুরসংযোগে সামবেদে পরিণত হয়েছে। এই বৈদিক যুগেই দেবী সরস্বতীর রূপকল্পনা হয়েছিল—যাঁর এক হাতে গ্রন্থ, অন্য হাতে বীণা। রামায়ণের যুগেও দেখি কাব্য ও গান ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত, লবকুশের 'তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্' রামায়ণ গান তার প্রমাণ।

কিন্তু কালক্রমে সংগীতে কথা ও সুরের বিচ্ছেদ ঘটল। অ-বাংলা মার্গ-সংগীতে কথা বহুলাংশে পরিবর্জিত। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কবীর, নানক, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ—এঁদের গানে কথার মর্যাদা রক্ষিত। হয়তো বা সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এঁদের গানের ভক্ত ছিলেন। মীরা, নানক,

কবীর, সুরদাস প্রমুখ অ-বাঙালি গীতিকবিদের গানের ধর্মচিন্তা ও বাণীরূপ একাধারে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল।

মীরাবাঈএর ভজন কবির বিশেষ প্রিয় ছিল। শৈশবে শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে শিখেছিলেন, 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী'। যোগাযোগ উপন্যাসে (১৯২৯) নায়িকা কুমুদিনীর মুখে মীরার কয়েকটি ভজন বসিয়েছেন। এমন কি কুমু-চরিত্রটিও খানিকটা মীরার আদর্শে অঙ্কিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শিখধর্মের সঙ্গে নিজের ধর্মসাধনা ও ধর্মভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। পিতার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এই ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। শিখগুরু নানকের একটি গানের ভাষান্তর আছে গীতবিতানে।

"'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ॥"[১]

—পূজা ও প্রার্থনা

'এ হরিসুন্দর' গানটিও একটি শিখভজনের অনুসৃতি।

সাধক কবীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কবীরের 'পানী মে মীন পিয়াসী রে' গানটির উল্লেখ করেছেন তিনি একাধিকবার। ১৯১৪ সালে Evelyn Underhill-এর সহায়তায় 'One Hundred Poems of Kabir' নামে কবীরের এক শত দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। নানক এবং বিশেষভাবে কবীর তাঁর ধর্মচিন্তাকেও প্রভাবিত করেছিলেন এবং তাঁদের মহান উদার ভারতীয় ধর্মবোধই কবির দৃষ্টিতে তাঁদের চিরন্তন ভারতপথিক হিসাবে মূল্যায়িত করেছিল।

"সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্ম-প্রসারণের উদ্‌বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্যযুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক, কবীর প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে।"

—'পরিচয়', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

১. 'শনিবারের চিঠি', ১৩৪৬, মাঘ সংখ্যা অনুসারে গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত।
দ্রষ্টব্য: প্র. মু. 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী', ১ম খণ্ড, ১৩৮০, পৃ ১

বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। বাংলা সংগীতে প্রথমাবধি কথা ও সুর সমমর্যাদা লাভ করে এসেছে। জয়দেব-চর্যাপদাবলী থেকে শুরু করে অধুনা-পূর্ব যুগ পর্যন্ত কাব্য ও সুর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আধুনিক কালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ও গদ্যরীতির উদ্‌ভবের পর কাব্য থেকে সুর বাদ পড়ল। কিন্তু এই যুগেই এমন অনেক সংগীতরচয়িতা জন্ম নিলেন, যাঁদের গানে কাব্যাংশ সুরের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়, আবার সুরই সেই কাব্যাংশকে অনির্বচনীয় রসলোকে উত্তীর্ণ করে। এই শ্রেণীর সংগীতকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"গান-রচনা, অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।"

—'সংগীতচিন্তা', আমাদের সংগীত

এ কথা গানের ভাষায় বলা যায়—

'আমি যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা।'

জয়দেব থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সহস্রবৎসরব্যাপী গীতসাহিত্যধারায় তাই দেখি বাণী ও বীণার যুগল-মূর্তি, সুরের রথে চড়ে বচনের অতীত অনির্বচনীয় অমরাবতীতে বাণীর মহাযাত্রা। কোথাও এই ধারার ছেদ পড়েনি। পরন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই ধারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। বাংলা গীত-সাহিত্যের বিশিষ্টতা ও সার্থকতা এইখানেই।

প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে বাংলা সংগীত তথা চিরন্তন সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ মূল্যায়ন স্মরণ করি।

"যা অমৃত, ···মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। ·· সংগীত মানবের সেই আনন্দরূপ—সে মানবের নিজের অভাব মোচনের অতীত ব'লেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের—···এই আনন্দরূপ চিরন্তন।"

—'সংগীতচিন্তা', আমাদের সংগীত

## ২. প্রাচীন বাংলা গীতসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যসাহিত্যের জন্ম প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের প্রথমেই। তৎপূর্বে বাংলা সাহিত্য পদ্যকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমগ্র পদ্যসাহিত্যই ছিল মূলতঃ গেয়, কিছু পদক্রমে ও কিছু পালাক্রমে গাওয়া হত। রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের পটভূমি হিসাবে রবীন্দ্র-পূর্ব গীতসাহিত্যের আলোচনায়, পালাসংগীতগুলিকে বাদ

দেওয়াই সমীচীন মনে করি, কেননা এই পালাসংগীতগুলির ( শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি ) সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের গঠনে, ভাবে তথা সামগ্রিক রূপে কোনই মিল নেই। এগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে দল বেঁধে গাওয়া হত এবং সেই বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতেই এদের তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে নিহিত ছিল।

প্রাচীন পদসাহিত্যের আলোচনায় চর্যাগীতি পদাবলীর কথাও অনাবশ্যক মনে করি। কারণ চর্যাপদগুলির সঙ্গে সাধারণ মানবজীবনের বিশেষ কোন যোগ নেই; উপরন্তু এদের সাহিত্যমূল্যও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যে সমস্ত গীত-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, যাদের রূপ ও ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের কিছু মিল আছে কিংবা রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানতঃ যে সাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন, সেই জাতীয় গীতসাহিত্যই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। পরন্তু, নিছক সাহিত্যের ইতিহাসরূপে আলোচনা না করে, কেবলমাত্র কালপরম্পরা বজায় রেখে, রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং সেই আলোকে সাহিত্যজগতে এদের গুরুত্ব কোথায়, সে কথাও আলোচনা করা যাবে সংক্ষেপে। এই বিচারে গীতগোবিন্দ-প্রণেতা কবি জয়দেব সর্বাগ্রগণ্য। বাংলা গীতসাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক জয়দেব। সেই সূত্রে তাঁকে বাংলার আদিকবি বলা যায়। জয়দেব পদাবলী থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল পদাবলী প্রভৃতি অধুনা-পূর্ব যুগের গীতসাহিত্যের সমৃদ্ধিগত দুই ভাগ—কাব্যসৌন্দর্য ও সুরসম্পদ। এই সুবিপুল ও সুসমৃদ্ধ পদাবলীসাহিত্যের কাব্যগত ঐশ্বর্যই বর্তমান আলোচনার প্রধান বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' রচয়িতা জয়দেবকে শ্রেষ্ঠ গীতিকবির সম্মান দিয়েছেন। জয়দেব পদাবলী যে খুব ছেলেবেলাতেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তার উল্লেখ 'জীবনস্মৃতি'তে পাওয়া যায়।

> "একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীত-গোবিন্দ পাইয়াছিলাম।...সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।...জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।"

—'জীবনস্মৃতি', পিতৃদেব

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন এই সৌন্দর্যমুগ্ধতার প্রধান কারণ গীতগোবিন্দের শব্দমাধুর্য এবং ছন্দোঝংকার। ঠিকমত যতি রেখে যেদিন তিনি ছন্দপাঠ করতে পেরেছিলেন, সেদিন আনন্দে তাঁর মন ভরে উঠেছিল।

জয়দেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন নি, কিন্তু বিভিন্ন স্থানে জয়দেব সম্পর্কে বহু উক্তি করেছেন। জয়দেবকে তিনি কলাকুশলী কবি হিসেবেই সম্মান দিয়েছেন। পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনদের কবিতার গভীর, ব্যাকুল ও ঐকান্তিক আবেদন-নিবেদনের সুর জয়দেবের কাব্যে যে নেই—সে কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন এবং হরিস্মরণেচ্ছু ভাবরসিকদের অপেক্ষা বিলাস-কলা-কুতূহলী ব্যক্তিই যে এর প্রকৃত সমঝদার—তাও কবির অজানা ছিল না।

জয়দেবের কাব্য থেকে বহু শব্দ, অলংকার ও ছন্দ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ জয়দেবের কাছে কবির ঋণ রূপগত। সে ঋণ অপরিমেয় সন্দেহ নেই। জয়দেব-কাব্যের আঙ্গিককে সাঙ্গীকৃত করে রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেছে।

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রথম পদটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পক্ষপাতদৃষ্টি ছিল। শ্লোকটি হল—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ।"

বর্ষার দিনের সমস্ত স্মৃতির সঙ্গে এই শ্লোকটি যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল কবির মনে।

"জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।"

—'মানসী', মেঘদূত

পরবর্তী কালেও এই ভাবনার পুনঃপ্রকাশ।

"আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি 'ভরা বাদরের' সুর।
খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি 'মেঘে অম্বর মেদুর'।"

—'সোনার তরী', বর্ষা-যাপন

তবে নিছক কাব্যসৌন্দর্যই নয়, এর প্রতি কবির আকর্ষণের অপর কারণ ছন্দের তরঙ্গায়িত ভঙ্গি ও শব্দচয়নের নিপুণতা।

"আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশি কিছুই নয়; খবরটা এক বারের বেশি দু বার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। কবি বরাবরকার মতো বলতে থাকলেন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ।

কবির মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ-পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।"

—'ছন্দ', গদ্যছন্দ

শুধু এই একটিমাত্র শ্লোকই নয়, পূর্বেই বলেছি, জয়দেবের সমগ্র কাব্য সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান আকর্ষণ তার ছন্দের দোলা ও শব্দের মাধুর্য। জয়দেবের কাব্যগঠনকুশলতা রবীন্দ্ররচনাকে যত প্রভাবিত করেছে এমন হয়তো আর কারো রচনাই করে নি। আঙ্গিক আলোচনায় এ প্রসঙ্গের পুনরবতারণা করা যাবে।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি জয়দেবের সার্থক উত্তরসাধক। জয়দেবের কাব্যে যে বিলাসকলার দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছে, বিদ্যাপতির ভাষায় তা আরও রসদ্যোতক হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজ্ঞ সমালোচনা স্মরণ করি।

"জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি।"

কিন্তু তারপরেই আবার বললেন,

"যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।"

—'বিবিধ প্রবন্ধ', ১ম খণ্ড, বিদ্যাপতি ও জয়দেব

এই উক্তির সূত্র ধরেই যেন রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা—

"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই।
…বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি।"

—'সমালোচনা', চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি

জয়দেব ও বিদ্যাপতি চৈতন্য-পূর্ব যুগের গীতিকবি। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ চৈতন্যোত্তর কবিদের কাব্যে ভক্তির যে আবেগ ও গভীরতা, তা ছিল তাঁদের কাব্যে বিরল। তথাপি, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাপতির

রাধিকা' প্রবন্ধে বিদ্যাপতির পদের নব-মূল্যায়ন করেছেন, বিদ্যাপতিকে চণ্ডীদাসের অগ্রদূত বলেছেন।

"বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে, অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে।···

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ···চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস আসিয়া চিরপুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।"

—'আধুনিক সাহিত্য', বিদ্যাপতির রাধিকা

বিদ্যাপতির এই পদটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল। এ ছাড়া 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিও তিনি বহু ব্যবহার করেছেন—পদটিতে সুরারোপও করেছেন। সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির অন্যান্য পদও তিনি বারংবার উদ্ধার করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাল্যকালে অগ্রজ ভ্রাতাদের অনাদৃত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' পাঠকালীন এই আকর্ষণের সূচনা হয়। আজীবন পত্রে, প্রবন্ধে, কবিতায়, গানে তিনি পদাবলী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, পদাবলীর উদাহরণে সাহিত্য-সমালোচনা করেছেন, পদাবলীর ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার 'স্বীকৃত' করে তাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী সবদাই তার 'সাহিত্যের সঙ্গী' ছিল। এই পদাবলী-প্রীতিই তাকে বৈষ্ণব পদ-সংকলনে প্রবৃত্ত করে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় ১২৯২ সালে 'পদরত্নাবলী' সংকলন করেন। কিন্তু কেবলমাত্র সংকলন করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বৈষ্ণব গানের সম্যক সমালোচনা করে পাঠকসাধারণকে বৈষ্ণব পদের রসগ্রাহিতায় দীক্ষিত করতেও চেষ্টা করেছিলেন।

ছেলেবেলাতেই বৈষ্ণব পদের শব্দঝংকার, ব্রজবুলি ভাষার লালিত্য, তদুপরি তার ছন্দোবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের মনকে আন্দোলিত করে। তাই তিনি কিশোর বয়সে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেছিলেন (১২৯১)। কিন্তু তাঁর মতে এই কাব্য বাহ্য অনুকরণমাত্র, বৈষ্ণব পদকর্তার ভাবতন্ময়তা এতে নেই। পরিণত বয়সে তাই ভানুসিংহের পদাবলী নিয়ে তাঁর কুণ্ঠার শেষ ছিল না।

বৈষ্ণবীয় ধর্মতত্ত্ব, যাকে রাগানুগা বা রাগাত্মিকা সাধনপদ্ধতি বলে, তার সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার কোন মিল নেই ; কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন। কারণ সেই প্রেম সত্য। সেই সর্বজনীন প্রেমের সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্মের রসনির্যাস বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং সেই আকুল প্রেমের আর্তিতেই বৈষ্ণব পদ শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের স্থান পেয়েছিল তাঁর মনে।

চণ্ডিদাসের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"চণ্ডিদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা কিছু সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।—

যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল,
অধিক সৌরভময়,
শ্যাম বধুয়াঁর পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়।

দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়। যতই ঘর্ষিত হইবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে। ...কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।"

—'সমালোচনা', চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতে পূজা, প্রেম, দুঃখ, আনন্দ কেমন একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, সে কথা স্মরণ করলেই বোঝা যায় বৈষ্ণব কবির গান রবীন্দ্রনাথের কেন এত প্রিয় ছিল এবং প্রতিক্ষণেই কবি কেন এই প্রাচীন পদকর্তাদের স্মরণ করেছেন।

শুধু প্রেম নয়, প্রকৃতির, বিশেষতঃ বর্ষাঋতুর সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যের তথা গীত-গোবিন্দের স্মৃতি কবির মনে একত্রে গ্রথিত।

"প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ, এই-সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়..., এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্ত-বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণব-কবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ১৪৭, ২৪ আগস্ট, ১৮৯৪

'কালিদাসের কালে' জন্ম নেবার কথা ( 'ক্ষণিকা', সেকাল ) যেমন তিনি বলেছেন তেমনই, 'ব্রজের রাখাল বালক' হবার আকাঙ্ক্ষাও ( 'ক্ষণিকা', জন্মান্তর )

অ-ব্যক্ত থাকে নি। বিদ্যাপতি, বসন্তরায়, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাসের পদ সংকলন করে, স্মরণ করে, বিশ্লেষণ করে তাঁর যেন আর তৃপ্তি ছিল না। বিশ্বের রসসাহিত্যের দরবারে বৈষ্ণব গীতসাহিত্যকে তিনি শ্রেষ্ঠ মাপকাঠির মূল্য দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি, জয়দেব থেকে শুরু করে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীর শব্দসৌন্দর্য ও ছন্দোঝংকার রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। বৈষ্ণব গানের অনুসরণে তিনি প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ( রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জয়দেবীয়' ছন্দ ) ব্রজবুলি ভাষায় গান রচনা করেছেন, আবার বাংলাতেও সেই ছন্দ ব্যবহার কবেছেন। কিন্তু এ ছন্দ স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের অন্তরায়। তাই তিনি সেই ছন্দকে ভেঙে বাংলা রূপ দিলেন। মূল রূপটা একই রইল, কেবল দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব অস্বীকার করে, রুদ্ধদলকে দুইমাত্রা গণ্য করা শুরু হল। 'মানসী' কাব্য থেকে ছন্দের এই নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত। এর পূর্বে বাংলা কাব্যে কেবলমাত্র মিশ্র কলাবৃত্ত ( এবং কিছু কিছু দলবৃত্ত ) ছন্দেরই প্রচলন ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই নব্য কলাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ভাববৈচিত্র্যের জন্য বৈষ্ণব কবি ছন্দকে বিচিত্র করেছেন ; বৈষ্ণব গানের বিভিন্ন আকৃতির পর্ব এবং ছন্দোবন্ধের বিপুল বৈচিত্র্য অল্পবয়সেই কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই কারণেই তিনি বলেছেন বৈষ্ণব কাব্যে 'ছন্দের ঢেউ' উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও, সম্ভবতঃ ভাববৈচিত্র্যের জন্য, বাংলায় প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব গঠন করেন। শুধু তাই নয়, এই ছন্দ-ভাঙা নতুন কলাবৃত্ত ছন্দেও চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব গঠন করেছেন। বন্ধেরও বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন কাব্যে।

আর সেই ছন্দের বিচিত্রতম রূপ ও পরিণতি রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যে। বৈষ্ণব-কাব্যছন্দের আদর্শে শুধু নতুন ছন্দোরীতির প্রবর্তনই নয়, তার পূর্ণাঙ্গীন বিকাশও ঘটেছে তাঁর রচনায়। যথাস্থানে সেই ছন্দোবৈচিত্র্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাবে।

বৈষ্ণব সংগীত-এর পরেই আসে শাক্ত সংগীত-এর কথা। বৈষ্ণবীয় সত্যধর্ম বা প্রেমধর্ম যা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, শক্তিপূজার ভীষণতার মধ্যে তার কোন স্থান নেই। সেই ভীষণতাকে কবি চিরকাল বিদ্বেষের চোখেই দেখেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলি এই শক্তিপূজার গান। কিন্তু "যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ব অবস্থায় পরিহার করে।

যথার্থ ভক্তি সুতীব্রকঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদি বা প্রাধান্য দেয় শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে।” তাই “বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা, অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা পত্নী ও কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দররূপে—দরিদ্র বাঙালির ঘরে…রসসঞ্চার করিয়াছেন…।”

—‘সাহিত্য’, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

এই প্রসঙ্গেই কবি লিখলেন—

“মাধুর্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল।”

—পূর্ববৎ

শাক্ত সংগীত যথার্থই বাংলার নিজস্ব—কি ভাবে, কি রূপে। এই আগমনী বিজয়ার গানগুলি রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করেছিল। ‘গ্রাম্যসাহিত্য’ প্রবন্ধে এই গানগুলি সম্পর্কে কবি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

“হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা।…শরৎসপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারী-ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।”

—‘লোকসাহিত্য’, গ্রাম্যসাহিত্য

আগমনী বিজয়ার গানে কবি কোন ধর্মীয় অনুপ্রাণনা পান নি, পেয়েছেন বাঙালি পিতামাতার বিচ্ছেদবিধুর হৃদয়ব্যথার কথা। তাই এগুলি কবিকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ‘বউঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসে (১২৯০) তিনি একটি আগমনীর গান ব্যবহার করেছেন। শরৎপ্রকৃতি কখনও কখনও তাঁর কাছে শারদাদেবী রূপে প্রতিভাত।

“মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দিভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই…।”

—‘বিচিত্র প্রবন্ধ’, শরৎ

কখনও-বা শারদীয়া দেবীমূর্তি ও বিশ্বময়ী স্বদেশ-মাতৃকামূর্তি অভিন্নরূপে বর্ণিত।

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!...
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।"

—স্বদেশ, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে

কখনও ধরিত্রীতে শরৎ ঋতুর আবির্ভাবকে তিনি শারদাদেবীর আগমনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে॥
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণ রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে॥...
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।"

—প্রকৃতি, আমার নয়ন-ভুলানো এলে

ভীষণ শক্তিকে করুণায় স্নিগ্ধ ও প্রেমে মধুর করে আনন্দ-বেদনাবিধুর গীতি-কবিতা রচনা করলেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। এই ভক্তকবির গানে যে প্রেম ও আর্তি সরল সহজ সুগভীর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, যথার্থই তার তুলনা মেলা ভার। সম্ভবতঃ রামপ্রসাদেরই প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বশক্তিকে মাতৃরূপে বন্দনা ও বর্ণনা করেছেন। তাঁর সহজ ভাষাও মাঝে মাঝে বংশহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য বাক্‌ভঙ্গির সঙ্গে। বস্তুতঃ ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলংকারে-রূপকে স্বাভাবিকতা রামপ্রসাদের স্বকীয়। রামপ্রসাদী গানের ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ কখনও বলেছেন 'রামপ্রসাদী ছন্দ', কখনও বলেছেন 'বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ'।

"ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়...।...যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।"

—'ছন্দ', বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ

রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি বিশেষ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়, বাংলার লোকসংগীত, বিশেষতঃ রামপ্রসাদী গানের ছন্দকে তিনি কতখানি সার্থক, সুষ্ঠু ও

বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছেন। 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' এবং 'পলাতকা' প্রভৃতি কাব্যে এই ছন্দই তাঁর ভাবপ্রকাশের মুখ্য বাহন। তাঁর পূর্বেও কোন কোন কবি এই 'লোকছন্দ' রচনা করেছেন, কিন্তু একে ভদ্র সাহিত্যের যোগ্য স্থান দেন নি এবং এর গুরুত্ব ও মূল্যবত্তা সম্পর্কেও হয়তো সতর্ক ছিলেন না। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই এর সৌন্দর্য, মাধুর্য ও স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং তাকে অন্য দুই ছন্দোরীতির সমপর্যায়ে উন্নীত করে, সুগভীর ও সুকঠিন ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন করে তোলেন।

কবি বলেছেন—

"বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে।···সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে।···আমার শেষবয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে।"

—'ছন্দ', বাংলা ছন্দ : প্রথম পর্যায়

শুধু ব্যবহারে লাগানোই নয়, উপরোক্ত প্রবন্ধ থেকে আরও বোঝা যায়, বাংলার চলতি ভাষার এই ছন্দ কবির কত প্রিয় ছিল। নানা সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি এর চর্চা ও ব্যবহার করে চলেছিলেন। গীতবিতানের অসংখ্য গানে এই ছন্দের ব্যবহার হয়েছে এবং এই লৌকিক বা দলবৃত্ত চন্দ যে কত শক্তিশালী এবং তার যে কত বিচিত্র রূপায়ণ সম্ভব, তারও পরিচয় আছে সেখানে। আবার, বাংলার চলতি ভাষাও যে তাঁকে সমভাবেই আকৃষ্ট করেছিল, পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। রামপ্রসাদের মত তিনি গভীর ও উচ্চাঙ্গের ভাবকে সহজ চলতি বাংলায় অনবদ্য ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন, পূজার গানে বা স্বদেশপ্রেমের গানে আছে তার নিদর্শন। অর্থাৎ, ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে রামপ্রসাদের পথ অনুসরণ করেছেন এবং সেই অনুসরণ ছিল সচেতন ও স্বেচ্ছাকৃত।

শাক্ত সংগীত-এর পরেই বাউল সংগীত। বাউলের গান একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের গান, অশিক্ষিত নিরক্ষর কবিদের মুখে মুখে রচিত। এগুলি যথার্থ লোকসংগীত। কিন্তু বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ ধরনের গান হলেও এই গানে

সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ চিরন্তন সত্যধর্মের কথাই বলা হয়েছে। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বাউল গান সম্পর্কে এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

> "আমার লেখা যারা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সাবে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন্-এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"
>
> —'সংগীতচিন্তা', পরিশিষ্ট ১ : বাউল-গান

এই 'অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস' বাউল গানের ধারা রবীন্দ্র-পূর্ব যুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রিয় কবি লালন ফকির ও গগন হরকরা—দুজনেই তার সমকালীন ছিলেন। বাউল গানের গভীরতা ও সৌন্দর্যের যথার্থ মূল্য অনুভব করে তাকে জনসমাজে সুপরিচিত করেন প্রথম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যঝংকার ও অনুভূতির গভীরতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক রসসাধনা 'শান্ত উপাসিত' মন্ত্রে দীক্ষিত কবির মনকে স্পর্শ করেনি। পরন্তু চতুরঙ্গ উপন্যাসে (১৯১৬) তিনি রসের রাক্ষসীর সবনাশা নেশার ছবিই এঁকেছেন। অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব বা সাধনা হিসেবে নয়, সাহিত্য হিসেবেই তাঁর কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্য। বৈষ্ণব যে প্রেমের মধ্যে ভগবানকে পেয়েছে, সেই প্রেমের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত ছিল। বস্তুতঃ যে মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্বমানবচিন্তা, যাঁর চোখে ভারতবর্ষ মহামানবমিলনের মহাতীর্থ, তিনি বৈষ্ণব রসসাধনার বহু ঊর্ধ্বে। তাই 'সোনার তরী,' 'চিত্রা', 'চৈতালি'র সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্টিক কবির বৈষ্ণব গান সম্পর্কিত উচ্ছ্বাস, পরবর্তী কালে প্রশমিত হয়ে এসেছে। প্রৌঢ় কবিও বৈষ্ণব গানকে স্মরণ করেছেন, কিন্তু সে প্রধানতঃ সাহিত্য-সমালোচনায় রসের মাপকাঠি হিসেবে।

পরিণত রবীন্দ্রনাথের মনে যখন বীরভূমের গেরুয়া রঙের ছোপ, তখনও কিন্তু বাউলের গান তাঁর মনে বিশেষভাবে জাগরূক। শিলাইদহবাসী যুবক রবীন্দ্রনাথ বাউল গানে আত্মহারা হয়েছিলেন, জীবনপথ-পরিক্রমার অন্তে সেই গানের মূল্য

তাঁর কাছে অধিকতর হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ বাউলের গানে উপনিষদের বাণীর প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন।

> "আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—
>
> কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে !
> হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
> দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
>
> …এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে : তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণবেদনা। …'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল।"
>
> —পূর্ববৎ

উপনিষদের সোপান বেয়ে কবিমনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়েব ভাবধারার প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। তাই ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে 'হিবার্ট লেকচার' দিতে গিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে নিঃসংকোচে বাউলের বাণীকে তুলে ধরেছেন। এই বক্তৃতাই 'The Religion of Man' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে, বিদেশী পাঠকের কাছে বাউলের বাণীকে সুস্পষ্ট করবার জন্য ক্ষিতিমোহন সেন-লিখিত 'The Baul Singers of Bengal' নামক প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে যুক্ত হয়। কলকাতায় প্রদত্ত তাঁর 'কমলা বক্তৃতা'ও ('মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩) বাউলদের কথায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ তার ধর্মচিন্তার যে নির্যাস, তার সঙ্গে তিনি বাউলের মনের ভাবের গভীর সাদৃশ্য দেখেছিলেন। বাউলের 'মনের মানুষ'ই রবীন্দ্রনাথের 'মহামানব' বা 'মানবব্রহ্ম'। আবার, বিশ্বপ্রেম বা Universal Love এবং সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানবপ্রেম ও মানব-মিলন সাধনার কথাও আছে বাউল গানে।

> "আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিস হিন্দু মুসলমান

উভয়েরই, এই মিলনে গান জেগেছে, এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধে নি

—পূর্ববৎ

এই ভাবে বাউলের গান রবীন্দ্রদর্শনে, রবীন্দ্রব্যাখ্যায় নতুন মূল্য লাভ করেছে। তাঁর নাটকে বাউল চরিত্র আছে। 'প্রায়শ্চিত্ত'-'পরিত্রাণ' এবং 'মুক্তধারা' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউল। নিজেকে তিনি 'রবীন্দ্র বাউল' বলে আখ্যাত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে বাউলের সুর ও বাণী তাঁর মনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। বাউলের সাধনাও যে তাঁর সাধনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে সে কথা পাঠকের অজ্ঞাত নেই। বাউলের গানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচীন গীতসাহিত্যের আর কোন শাখা কবির কাব্য ও সাহিত্যে বোধহয় এতখানি প্রভাব বিস্তার করে নি।

শুধু বাউলের সুর নয়, কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরও তাঁর 'সুরের সুরধুনী'তে স্থান পেয়েছিল। যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

রবীন্দ্র-পূর্ব গীতসাহিত্যের আলোচনায় আর একজাতীয় গানের কথা না বললে কথা অসম্পূর্ণ থাকে— তা হচ্ছে কবিগান বা কবিসংগীত। রবীন্দ্রনাথ কবিগান সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। কবিগানের সমালোচনা প্রসঙ্গে পূর্বতন গীতিকারদের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন—

> 'গীতিকবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং গীতিকবিতাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য। রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।
>
> এই কবির গানগুলিও গান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়ত্ব এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।"
>
> —সংগীতচিন্তা পরিশিষ্ট ১ : কবিসংগীত

না থাকবার কারণ, এগুলি 'নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক-সম্প্রদায়ের' 'সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে আমোদের উত্তেজনা' বিতরণের জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। সৌন্দর্যের সরলতা বা ভাবের গভীরতায় নিমগ্ন হবার মতো অবসর শ্রোতাদের ছিল না। 'পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং

কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া' এই গানগুলি রচিত,—সে কারণেই 'বিজন-বিলাসিনী সরস্বতী'র প্রসাদলাভে বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের মতে এদের যেটুকু মূল্য তা ঐতিহাসিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করেছেন—

"আমরা সাধারণ এবং সমগ্র-ভাবে কবির দলের গানের সমালোচনা করিয়াছি। স্থানে স্থানে সে-সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতাও আছে।"

—পূর্ববৎ

তাঁর এই উক্তির অনুসরণে অপর একটি উক্তি স্মরণ করা যাক্।

"কীর্তনে, বাঙালীর গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু শ্রীধরকথকের টপ্পা গানে, হরুঠাকুর রামবসুর কবির গানে, সংগীতের সেই যুগলমিলনের ধারা।"

—'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা ৩

নিধুবাবু, শ্রীধরকথক, রামবসু, হরুঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন কবি তাদের পূর্বতন কবিদের রচনাধারার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সেই ধারায় জল ও চটক মিশিয়ে সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন নি। তাই এঁদের কথা কবি একাধিকবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এঁদের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি লিখেছেন, রামপ্রসাদের পরে—

"কতকগুলি কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই।"

—'বিবিধ প্রবন্ধ', ১ম খণ্ড, বিদ্যাপতি ও জয়দেব

এই কবিরা যে প্রেমসংগীতগুলি রচনা করেছিলেন, সেগুলির সঙ্গে বৈষ্ণব প্রেমসাধনা বা শাক্ত ভগবৎসাধনার মিল নেই। এগুলি নিতান্তই লৌকিক বা মানবিক প্রেম। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় গানের কোন ঐতিহ্য ছিল না। দেশের লোকসাহিত্যের মধ্যে এই লৌকিক প্রেমের গান ছিল, ('যুবতী ক্যান বা করো মন ভারী'— এই গানের কথা রবীন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ বলেছেন), কিন্তু সেগুলি যথার্থ ভদ্র ও শিক্ষিত সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত ছিল না। নিধুবাবু প্রমুখ কবিদের দ্বারাই এই লৌকিক প্রেম সাহিত্যের দরবারে স্থান পেল।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর মারফৎ এঁদের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে কৈশোরেই। তিনি 'মনে রৈল সই মনের বেদনা' বা 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে' প্রভৃতি গানের উল্লেখ করেছেন বহুবার। এঁদের গানের কোন্

প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্ররচনায় পড়েছে বলে মনে হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথের কিছু গানে যে পার্থিব প্রেমের পরিচয় আছে ( ইংরেজি love-song-এর মত ), তার মধ্যে এই কবিদের প্রেমসংগীতের ধারাটি বজায় রয়েছে। কৈশোরেই কবি এই জাতীয় পার্থিব প্রেমসংগীত রচনা শুরু করেন, সম্ভবতঃ নিধুবাবু প্রমুখ কবিদেরই অনুসরণে। পরিণত বয়সেও নিছক পার্থিব প্রেমের গান কিছু কিছু দেখা যায় 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি', 'বলি ও আমার গোলাপবালা,' 'তোমার গোপন কথাটি, সখী রেখো না মনে', 'বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে', 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে', 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না', 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' প্রভৃতি অনেক গান এই পর্যায়ভুক্ত। বস্তুতঃ নিধুবাবুদের দ্বারা যে লৌকিক প্রেম সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করল, তারই পূর্ণতর বিকাশ রবীন্দ্রনাথে।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল, রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিপুল সম্ভার বাংলা সাহিত্যে আকস্মিক নয়। জয়দেব থেকে শুরু করে উনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসরব্যাপী বাংলা গীতসাহিত্যধারায়, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল পদাবলী এবং নিধুবাবুদের প্রেমসংগীত— এই কতকগুলি প্রধান শাখার পরিচয় পাই। এ ছাড়া উনবিংশ শতকে, রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে, কিছু ব্রহ্মসংগীত ও কিছু জাতীয় সংগীত ছিল এই সমস্ত ধারাই রবীন্দ্র-সংগমে এসে মিলিত হয়েছে এবং নদী যেমন সাগরসংগমে এসে বহুবিস্তৃত হয়ে যায়, তেমনই এরাও স্ফীত ও বহুপ্রসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গীতরচনায় তদুপরি আরও কিছু নতুন শাখা যুক্ত হয়েছে এদের সঙ্গে, তন্মধ্যে প্রকৃতিপ্রেমের গানগুলিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
> দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে সমুদ্রে হল হারা।"
>
> —'গীতাঞ্জলি', ১০৬, 'হে মোর চিত্ত'

তেমনই বাংলা গীতসাহিত্যেরও বিভিন্ন ধারা দুর্বার স্রোতে এসে রবীন্দ্রসংগীত-সমুদ্রে মিশেছে এবং চরম সার্থকতা ও পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

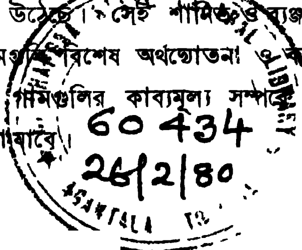
# রবীন্দ্র-গীতসাহিত্য

## ১. রবীন্দ্রসাহিত্যে গীতবিতানের স্থান

বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যসম্ভারের একটি শাখা রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্য। কিন্তু কেবল একটি শাখারূপের মধ্যেই তার সমগ্র তাৎপর্য নিহিত নয়। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ মূল্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের মধ্যে ছোট গল্পগুলিকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। গল্পের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ভাবসৌন্দর্য ও কাব্যসৌন্দর্যের যে রসঘন সংহতি সম্ভব, উপন্যাসের বিস্তৃতিতে তা অনেকাংশেই তরলায়িত হয়ে যায়। সেইভাবে, তার প্রবন্ধজাতীয় রচনার মধ্যে অনেকগুলি চিঠিপত্র সবচেয়ে মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী। চিঠির স্বল্প পরিসরে, ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে, গভীর তত্ত্ববাহী ভাব অনায়াসে ব্যক্ত এবং ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই, জীবনের শেষ পর্যন্ত বক্তব্যবিষয়কে সুস্পষ্ট করবার জন্য কবি নিজের চিঠি থেকেই বারবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নাটকেও, যেখানে নাটকগুলি সংক্ষিপ্ত, সেখানে তাদের ভাবদ্যোতনা গভীরতর। সেই কারণেই হয়তো কবি নিজেই তাঁর অনেক নাটককে সংক্ষিপ্ত করেছেন। 'রাজা' নাটককে করলেন 'অরূপরতন', 'শারদোৎসব'কে করলেন 'ঋণশোধ', 'অচলায়তন'কে করলেন 'গুরু'। এই সংক্ষিপ্তকরণ ব্যর্থ হয় নি। তেমনই, রবীন্দ্রনাথের সুবিস্তীর্ণ কাব্যকীর্তির মধ্যে গানগুলিকে আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে স্বীকার করে নিতে পারি। কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই অতিবিস্তার বা অতিকথন ভাবধারাকে মূল কেন্দ্র থেকে দূরে নিয়ে যায়, গানগুলি সেই ত্রুটি থেকে সর্বৈবরূপে মুক্ত। পরন্তু, গানের সীমিত আয়তনের মধ্যে ভাবাবেগ যে রকম অখণ্ড, স্বচ্ছ, প্রাণোজ্জ্বল অথচ গভীর হৃদয়-স্পর্শী, এমন বোধ হয় তাঁর আর কোন রচনাতেই নয়।

বস্তুতঃ স্বল্পায়তনেই রবীন্দ্রপ্রতিভা অধিকতর দীপ্যমান, অল্প কথায় বৃহৎ ভাব প্রকাশের জন্য বৃহৎ প্রতিভারই আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ভাষাকে নানা অলংকারে সাজিয়ে বহুভাবে বিস্তৃত করেছেন, তার হাতে ভাষা শানিত ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। সেই শানিত ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ স্ফটিকখণ্ডের মত স্বচ্ছ ভাষা ব্যবহারে গানগুলি বিশেষ অর্থদ্যোতনা ও কাব্যসমৃদ্ধি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর গানগুলির কাব্যমূল্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। সে কথা ক্রমে সুস্পষ্ট করা যাবে।



রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত-সংকলন 'রবিচ্ছায়া' যখন প্রকাশিত হয় ( বৈশাখ, ১২৯২ ), তখন তিনি এই গানগুলি ছাপাতে একান্ত কুণ্ঠিত ছিলেন

"অনেক কারণে গান ছাপান নিষ্ফল বোধ হয়। সুর সঙ্গে না থাকিলে গানের কথাগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তাছাড়া গানের কবিতা সকল সময়ে পাঠ্য হয় না, সুরে ও কথায় মিলিয়া তবে গানের কবিতা গঠিত হয়। এই জন্য সুর ছাড়া গান ছাপার অক্ষরে পড়িতে অনেকস্থলে খাপছাড়া ঠেকে।"

—'রবিচ্ছায়া' রচয়িতার নিবেদন

তার মতে সুর ছাড়া গানের কথা যেন পাখা ছেঁড়া প্রজাপতি'র মতো। অন্যত্র বলেছেন—

"চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সংকোচ বোধ করি। কেননা, গানের বহিতে আসল জিনিসই বাদ পড়িয়া যায়। সংগীত বাদ দিয়া সংগীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়, যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।"

— 'বনবাণী' গান সম্বন্ধে পত্র

অর্থাৎ গান যে অতীন্দ্রিয় ভাবলোক রচনা করে, সুরই সে পথে যাত্রার প্রধান বাহন। তাই সুরকে বাদ দিলে সংগীতের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হতে পারে, তার প্রধান কারণ গীতরচনায় ছন্দ সর্বদা সুপরিমিত হয় না এবং তার ফলে পাঠের সময় ভাবধারা পদে পদে ব্যাহত হয়। কবিতার ছন্দ তো গানে সুরব্যঞ্জনারই প্রতিরূপ, তাই গানের কবিতা পাঠে ছন্দপতন ঘটলে ভাবানুভূতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতরচনা এই ত্রুটি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর গান ভাবসমৃদ্ধিতে, ছন্দে, অলংকারে, শব্দপ্রয়োগ নৈপুণ্যে অতি সুপাঠ্য। এই বিষয়ে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রমাণ আছে 'প্রবাহিণী' গীতগ্রন্থের ভূমিকায়

"প্রবাহিণীতে যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের পালন নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

— 'প্রবাহিণী' ভূমিকা, ১ম প্রকাশ ১৩২২

'গীতবিতান' প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে। গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণের ( ভাদ্র ১৩৪৬ ) 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখলেন—

"সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

অর্থাৎ জীবনের প্রথমে গানগুলির কাব্যমূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় না থাকলেও, পরিণত বয়সে এ সম্পর্কে তাঁর আর কোন দ্বিধা ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, প্রবাহিণীর পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলির কাব্যমূল্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তার 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' মূলতঃ গীতগ্রন্থ। কিন্তু তিনি এগুলিকে কাব্যগ্রন্থ রূপেই প্রকাশ করেছেন, এবং ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' কাব্য হিসেবেই সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে ( 'আমেদাবাদ'-বাস প্রসঙ্গে ) 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' গানটি সম্পর্কে কবি লিখেছেন, 'আমি যেমন খুশি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরী করিয়াছিলাম। কিন্তু গানটির প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি ছাড়া বাকী অংশ 'পরে ভদ্রছন্দে বাধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার [ 'রবিচ্ছায়া' ] গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম।'

—'জীবনস্মৃতি', গ্রন্থপরিচয়

অর্থাৎ সুরসংযুক্ত গানে 'ভাঙা ছন্দ' ব্যবহার করা গেলেও, সেই গীতরচনাকে পাঠ্যরূপে গ্রন্থভুক্ত করতে হলে যে সুনিয়মিত, সুপরিমিত 'ভদ্র ছন্দে'র প্রয়োজন, সে কথা কবি জানতেন। 'রবিচ্ছায়া'র 'রচয়িতার নিবেদনে' গীতরচনার ছন্দ সম্পর্কে কবির সতর্কতা ও সচেতনতার পরিচয় আছে। আর, উপরোক্ত গানটির ছন্দসংশোধনও সেই সচেতন ছন্দোবোধেরই ফল। এই ছন্দসচেতনতা ও ছন্দ কুশলতার জন্যেই রবীন্দ্রনাথের গীতরচনাগুলি এমন সুপাঠ্য 'গীতিকাব্য' হয়ে উঠতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে 'গীতিকাব্য' বললেও, মনে হয়, 'কাব্যগীতি' বললে অর্থটি আরও সুস্পষ্ট হত। সমাসের নিয়মানুসারে পদের শেষাংশের অর্থই মুখ্য। গীতিকাব্য বলতে বোঝায় lyric, যা মূলতঃ কাব্যই, কেবল নিছক আত্মভাবনামূলক বলে এখনও 'গীতি' শব্দটি যুক্ত আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতরচনাগুলি মূলতঃ গান, 'সুরে বসানো'। সুর ছাড়া এদের পাঠ করলে কাব্যরসাস্বাদন ব্যাহত হয় না বটে, কিন্তু সুরসংযোগে এদের রসঘন মূর্তি আরও নিবিড় ও পূর্ণ হয়, এ কথা বলা বাহুল্য। তাই, 'কাব্যগীতি' অভিধায় এদের রসরূপ স্পষ্টতর হয়।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রসংগীতের কথাবস্তু যে কাব্যগুণ-বর্জিত নয়, এ কথা কবি জানতেন। আরও একটু অগ্রসর হয়ে যদি বলা যায়, গানগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা, বোধ করি ভুল হবে না। কিন্তু কেবল শ্রেষ্ঠ কবিতাই নয়, গানগুলি তাঁর সমস্ত সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। যে বিচিত্র, বিভিন্ন

ভাবধারা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গদ্যে, পদ্যে, প্রবন্ধে, নাটকে— সবই সংহত আকারে স্থান পেয়েছে তাঁর গানে।

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালবাসার অমৃত।"

—'পত্রপুট', পনেরো, 'ওরা অন্ত্যজ'

কবি হয়তো এখানে আক্ষরিক অর্থে 'গান' শব্দটি ব্যবহার করেন নি, কিন্তু একে আক্ষরিক অর্থে ধরে নিলেও কোন ভুল হয় না। তার জীবনের সমস্ত অনুভূতিই গানে ব্যক্ত হয়েছে।

'গীতা'র মূল্য নিরূপণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আতসকাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতি-রাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদগীতা।···মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা।"

—'পরিচয়', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কেও এই কথা বলা যায় সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাপ্ত সূর্যালোকেরই সংহত দীপ্তিরশ্মি রবীন্দ্রসংগীত এরই আলোকবর্তিকা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমস্ত দুর্গম পথের নির্দেশ দিচ্ছে।

অল্পবয়সে বঙ্গভূমির দৈন্য সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"বিশ্বের মাঝারে ঠাই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
এক বার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—"

—'কড়ি ও কোমল', আহ্বানগীত

পরবর্তী কালে গান গেয়েই কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন ( ১৯১৩ ), সমস্ত বিশ্বে বাংলা দেশ সম্মানলাভ করল। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সংগীতই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাঁর সাহিত্য-রত্নাকরের সর্বোত্তম রত্ন, জীবনপথের শেষ পাথেয়।

'কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি।'

এবং সেই কারণেই—

'আমার সুরগুলি পায় চরণ
আমি পাই নে তোমারে।'

গান ও কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের মনে সমান স্থান লাভ করেছিল প্রথমাবধি—তার প্রমাণ পাই বিভিন্ন প্রকারে। 'শৈশব সংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাত-সংগীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', 'পূরবী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নামে আছে তার পরিচয়। এই কাব্যগুলিতে অনেক গানও স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া, 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্যেও গান আছে। অপর পক্ষে, 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রভৃতি গীতগ্রন্থে বহু অ-গেয় কবিতা আছে। অনেক কবিতায় কবি পরবর্তী কালে সুরযোজনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'ভারততীর্থ', 'কৃষ্ণকলি', 'বর্ষামঙ্গল', 'ছবি', 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতার নাম করা যেতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে কবি কোন কবিতাকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে সংগীতরূপ দিয়েছেন। সে পরিবর্তন প্রধানতঃ বাহুল্যবর্জন। কবিতার ব্যাখ্যা বা বিস্তারকে কবি সচেতনভাবেই বর্জন করেছেন সুরের অবকাশ, রসানুভূতির অবকাশ বৃদ্ধির জন্য। তার ফলে একদিকে গানের আকৃতিগত সংহতি ও অন্যদিকে সুরের আকাশে ডানা মেলে অনির্বচনীয়ের জগতে সংগীতের যাত্রা সম্ভব হয়েছে। 'মানসী' কাব্যের 'তবু' কবিতাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আবার, এমন গান আছে, যা শব্দে-ছন্দে-অলংকারে, ভাবগাম্ভীর্যে শ্রেষ্ঠ এবং অনবদ্য কবিতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গীতিমাল্যে'র একটি গান তুলে দিই—

"সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত ॥
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে ॥
জীবনশেষের শেষজাগরণসম ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত॥"

—'গীতিমাল্য', ৩০, 'সুন্দর বটে'

ভগবানের রুদ্ররূপের বর্ণনায় ও বন্দনায়, ভাষার জ্যোতিতে, ছন্দের দোলায়, অলংকারের ঝলকে এ এমন এক অপূর্ব সৃষ্টি যা রবীন্দ্রসাহিত্য-ভাণ্ডারেও খুব সুলভ নয়।

গানে রবীন্দ্রকল্পনা যে কত সুদূরপ্রসারী, কত গভীর ও সেই সঙ্গে কত বেদনাময় তার পরিচয়রূপে 'এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা দলে দলে' গানটি স্মরণ করা যায়। এতে বৈষ্ণবকল্পনা শুধু নয়, মূল বৈদিককল্পনাকে কবি গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এর নবরূপায়ণ সুন্দরতর হয়ে উঠেছে কবির লেখনীতে। অথচ এর ভাষা কত সহজ, ভঙ্গি কত সাবলীল। আবার গানের শেষে যেখানে কবি বলছেন—

"আশা তৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত—
মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে ?।"

—পূজা, এই তো তোমার আলোকধেনু

সেখানে গীতিকবির আত্মনিবেদন চরম মূর্ছনায় নিবিড় হয়েছে। ভাষা এখানে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। বৈদিককল্পনার মাধুর্য ও মহিমা রবীন্দ্রনাথের হাতে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতা লাভ করেছে। এই গানটিকে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন-অভিহিত 'রবীন্দ্রসূক্ত'[১]—পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়।…শেক্‌স্‌পীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে।… সাহিত্যের আসরে এই রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব।"

—'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের মূল্য

জীবনশিল্পী যুগে যুগে যে শিল্পরচনা করে চলেছেন, সাহিত্যশিল্পী তাকেই সাহিত্যে চিরস্থায়ী করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগৎ তথা সাহিত্যজগতের

১. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাণী ও বীণা', গীতবিতান পত্রিকা, শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৬৮

চিত্রময়তার কথাই ব্যক্ত করেছেন, তার গীতময়তার কথা বলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে গীতময়তাই প্রধান। কবিতা ও সংগীত তো বটেই, তাঁর গল্পগুলিও গীতময়। পড়া শেষ হয়ে গেলেও গল্পগুলির ভাবগত সুরের ঝংকার মনের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকে। তাঁর রচনায় চোখে দেখার আনন্দের চেয়ে কানে শোনার আনন্দই বেশি পাওয়া যায়। এগুলি সবই যেন—

'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

কবি জগৎ'ক সংগীতময় রূপেই দেখেছিলেন।—

"মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, [ তা হলে ] কী-একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে!···আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি।"

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ৭৩, ২ ডিসেম্বর, ১৮৯২

এই কারণেই জগৎ ও জীবনকে তিনি 'গানের ঝরনাতলা' বলে বর্ণনা করেছেন এবং বিশ্বস্রষ্টাকে গায়ক মনে করেছেন। সমগ্র সৃষ্টি যেন সেই গায়কেরই গান।

"তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,
আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি॥
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী॥"

—পূজা, তুমি কেমন করে গান করো হে

কবিতায় লিখেছিলেন—

"অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে ঝর্ঝর সংগীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা—
সেথা হতে টানি লব গীতধারা ছোটো এই বাঁশরিতে।"

—'সোনার তরী', পুরস্কার

সেই বিশ্বসংগীতধারা থেকেই কবি নিজের বীণায়ও সুরটি টেনে নিতে চান

"আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে॥···
বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে··· ।"

—পূজা, আমার বেলা যে যায়

অথবা,

"যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে ।"

—পূজা, যে ধ্রুবপদ

বিশ্বস্রষ্টাকে তিনি বিশ্বকবিও বলেছেন, বিশ্বসুরের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনেব ক্ষুদ্র সুব মিলে তাঁরই পায়ে গিয়ে ঠেকে নির্ঝরধারার মতো।

"বাজাও তুমি, কবি, তোমাব সংগীত সুমধুর
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম—
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝব নির্ঝব তব পায়ে॥"

—পূজা, বাজাও তুমি কবি

আকাশে, বাতাসে, আলোকে, ফুলে, ফলে, পল্লবে যে বিশ্বসুর-নির্ঝরধারা ছড়িয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে শুধুমাত্র নিজের বীণাতেই ধরতে চান না, নিজের গানের সুরকেও তিনি প্রতিরণিত করতে চান নিখিলবিশ্বে তথা মানবমনের চিরন্তন অনুভূতিতে—

"আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দি·
যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীণ ॥
সুরগুলি তার নানাভাগে রেখে যাব পুষ্পরাগে
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন ॥
কিছু বা সে মিলনমালায় যুগলগলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা।
কিছু বা কোন্ চৈত্রমাসে বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন ॥"

—প্রেম, আসা-যাওয়ার পথের ধারে

বিশ্বজগৎ সুরময়, বাণীময়, ছন্দোময়—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদর্শন। এই বিশ্বদর্শনের সঙ্গে জীবনদর্শন মিলিয়ে নেওয়াই কবির সংগীতদর্শন। সংগীত কেবল

কণ্ঠশিল্প নয়, সংগীতের বাণী আছে। তেমনই, বিশ্বজগৎও কেবল শিল্প নয়, তারও বাণী আছে। সে বাণী আভিধানিক অর্থে বাণী নয়। শেক্সপীয়র বলেছেন, 'Music of the Stars'। সেই 'অরূপ' বাণীর প্রকাশ রূপে, আনন্দে, গানে। তাই—

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।"

—পূজা, গানের ভিতর দিয়ে যখন

বিশ্ববাণীকেই কবি সংগীতের বাণীতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বিশ্বসংগীত ও জীবনসংগীত যদি না মেলে, তাহলে সুরহারা প্রাণের বেগে যে কোলাহল জেগে ওঠে, তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই 'সুরের গুরু'র কাছে দীক্ষালাভের প্রার্থনা। সুরের স্থান জীবনের প্রারম্ভে। 'গীতবিতানে'র ভূমিকা-গীতটিতেই কবি বলেছেন, প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে যে উষা ধরিত্রীর বুকে নেমে এসেছিল, তার মধ্যে ছিল অনন্ত সুরের পিপাসা। সুরের সে পিপাসা কবিজীবনেও ছিল সুগভীর। তার চিত্ত-'চকোর' 'গীতসুধা'র জন্যই 'পিপাসিত'।

সাহিত্যকলায় হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মতম ও পূর্ণতম বিকাশ হচ্ছে গান। অন্ততঃ রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। গানে ভাবকে অনির্বচনীয়তা দান করা হয়, শব্দচয়ন ও শব্দপ্রয়োগ ভাবকে তির্যক গতি দান ক'রে বাক্যের অতিরিক্ত হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত করে, তদুপরি অলংকার, ছন্দ ও সুরের সমাবেশ হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকেও অনুরণিত করে তোলে। আর, এই সূক্ষ্মতার ফলেই হৃদয়বৃত্তির পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রসংগীতে যত বিচিত্র ভাব ব্যক্ত হয়েছে— রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্য কোন শাখাতেই এমন হয় নি। ভগবৎপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, মানবিকপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বচিন্তা, আনন্দচিন্তা, জীবনচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরস, করুণরস, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপযোগী মনোভাব— সবই প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্যে। উপলব্ধি এবং ভাবের এমন বিপুল সম্ভার আর কোথাও একত্র হয়েছে বলে জানি না। আবার প্রতিটি গানই ভাবে, রূপে, ছন্দে, সুরে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শুধু হৃদয়বৃত্তির পূর্ণতম বিকাশই নয়, রবীন্দ্রপ্রতিভারও পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে গানে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বদেবতাকে একটি বিশিষ্ট স্বকীয়রূপে কল্পনা করেছেন, পূজা করেছেন। সে পূজার মন্দির তাঁর ভক্তহৃদয়, আর পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার সংগীত। বিশ্বদেবতার সঙ্গে মিলনের উপায়ও সংগীত।

"তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।"

—পূজা, তোমার আমার এই

বিশ্বজগৎসভায় নিজেকে তিনি গায়করূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান, কেননা গানই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—

"আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান॥"

—পূজা, আমি হেথায় থাকি

শুধু দেবতাই নন, প্রেয়সীর কাছেও তাঁর শ্রেষ্ঠ উপহার 'বসন্তের গানখানি'। প্রিয়ার গলায় তিনি 'গানের রতনহার'-ই পরাতে চান। পূজা ও প্রেমের গানে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে গানের কথা বলেছেন। গান কখনও 'মাল্য', কখনও 'অঞ্জলি', কখনও 'অলি', কখনও 'আগুন'। কোথাও সে 'সুরধুনী', কোথাও 'তরী', কোথাও 'আলো', কোথাও 'হাওয়া', আবার কোথাও 'তারা'। কখনও পূজা বা প্রেমের 'ডালি', কোথাও 'আসন', কখনও 'লিপি' গানেই তাঁর 'বন্ধন', আবার গানেই তাঁর 'মুক্তি'।

গানের সুরে তাঁর ব্যক্তিজগৎ এবং বিশ্বজগৎ প্লাবিত, গানেই এদের পরিপূর্ণতা তথা শেষ পরিচয়। তাই শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, রবীন্দ্রজীবনেও গানগুলির স্থান সর্বাগ্রে। গানগুলি তাঁর অমূল্য সৃষ্টি।

## ২. রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিবর্তন ও পর্ববিভাগ

মানবজীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটতে থাকে। এ কথা লেখকজীবন সম্পর্কে অধিকতর সত্য। আর, রবীন্দ্রজীবনে ও রবীন্দ্রসাহিত্যে এই বিবর্তন যত সুস্পষ্ট, গভীর এবং ব্যাপক— এমন হয়তো আর কোন কবির জীবন ও সাহিত্যেই নয়। রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যে এই বিবর্তন কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এবং তদনুসারে গীতসাহিত্য-রচনার পর্ববিভাগ সাধন করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, জীবনের এক এক পর্যায়ে এক এক ভাবধারা বিশেষত্ব বা প্রাধান্য লাভ করলেও, পরবর্তী পর্যায়ে তা সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়ে যায় না। কোন ভাব যখন প্রবল ও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, অন্য ভাব তখনও অন্তঃশীলা ধারায় প্রবাহিত থাকে। তাই,

জীবন বা সাহিত্যকে কখনই বিভিন্ন পর্বে পূর্ণযতি দ্বারা খণ্ডিত করা যায় না। কেবল ভাবনার প্রাধান্য বা নবোন্মেষ দ্বারাই নতুন পর্ব নির্দেশ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ( ১৮৭৪, নভেম্বর-ডিসেম্বর )। কবিতাটিকে 'দ্বাদশ-বর্ষীয় বালকের রচনা' বলা হয়েছিল, লেখকের নাম ছিল অ-প্রকাশিত। 'হিন্দু-মেলায় উপহার' রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বনামে প্রকাশিত কবিতা। দ্বি-ভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয় ২৫শে ফেব্রুআরি, ১৮৭৫ সালে। তদনুসারে মোটামুটিভাবে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দকে রবীন্দ্রকাব্যের আরম্ভকাল বললে হয়তো অন্যায় হবে না। কিন্তু সংগীতরচনার শুরু ঠিক কখন হয়েছিল সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি ১৮৭৫ সালের রচনা হলেও এবং রবীন্দ্রনাথের একটি পরোক্ষ মন্তব্যের জোরে গানটি গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেলেও, বস্তুতঃ গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত একটি শিখভজনের অনুবাদ। একে রবীন্দ্রসংগীত বলা চলে না।[১] 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড ( ১৯৭০, পৃ ৮২ ), শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' ( ১৯৭০, বাল্যজীবনে সংগীতের প্রভাব, পৃ ৩৮ ), এবং সর্বোপরি, 'জীবনস্মৃতি' ( গ্রন্থপরিচয় : আমেদাবাদ ) অনুসারে রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাধীন সংগীতরচনা 'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়' ( ১৮৭৮, আমেদাবাদ)। কিন্তু 'তোমারি তরে, মা সঁপিনু এ দেহ', 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন', 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' প্রভৃতি গান এর পূর্বে রচিত বলে অনুমান করা যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতার ভাবানুষঙ্গে প্রথম দুটি গান 'সঞ্জীবনী সভার' আমলে ১৮৭৪/৭৫ সালের মধ্যেই রচিত মনে হয়। শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর মতে, এগুলির সুরসংযোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাত ছিল বলে এদেরও যথার্থ রবীন্দ্রসংগীতের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কিন্তু সুরপরিকল্পনায় হাত থাকলেও সম্পূর্ণ সুরই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া, এমন কোন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই অন্যের দেওয়া সুর, বা অন্যজাতীয় সুর থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গতের সুর আছে, অক্ষয় চৌধুরীর রচিত গান আছে, সেগুলি কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত হিসেবেই স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৮৭৮ সালের 'নীরব রজনী দেখ' প্রভৃতি গানকে প্রথম রচনা

১. দ্রষ্টব্য : অমিতাভ চৌধুরী, 'প্রথম রবীন্দ্রসংগীত কোনটি', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই শ্রাবণ ১৩৮২ এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী', ১ম খণ্ড, ১৩৮০, পৃ ১

বলেছেন, সম্ভবতঃ তার কারণ এগুলি কোন উদ্দেশ্য বা উপলক্ষে রচিত নয়। গীতিকবির প্রথম 'আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস' বলেই হয়তো এগুলির কথা কবির মনে ছিল। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে ঐতিহাসিক বিচারে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তি সর্বদা প্রামাণ্য নয়। কবি নিজেও সে কথা জানতেন। 'অভিলাষ', 'প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যকীর্তির কথা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাই, 'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়' গানটিকে তাঁর সর্বপ্রথম গান বলতে দ্বিধাবোধ হয়। নানান্ কারণে মনে হয় 'তোমারি তরে মা' এবং 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' তাঁর রচিত প্রথম সংগীত, এবং কাব্যজীবনের মত সংগীতজীবনেরও শুরু ১৮৭৫ সালেরই কাছাকাছি সময়ে। আমার এই নিবন্ধের মূল লক্ষ্য রবীন্দ্র-সংগীতের কাব্যমূল্য-নিরূপণ। তৎপ্রতি দৃষ্টি রেখে এবং সুরের কথা বাদ দিয়ে, অন্ততঃ কাব্যসংগীত হিসাবে এই গান দুটিকে সর্বপ্রথম অধিকার দিলে, ও তদনুসারে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দকেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতরচনার আরম্ভকাল বললে হয়তো অন্যায় হবে না।

যাই হোক, প্রথমবার বিলাতযাত্রার (১৮৭৮) পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সমকালীন ধর্মসংগীত (অর্থাৎ ব্রহ্মসংগীত), জাতীয় সংগীত ও হাসির গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বাড়িতে তখন বিষ্ণুর কাছে মার্গসংগীত শিক্ষাও চলেছিল। এই শিক্ষণপর্বেই রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনাও করছিলেন। শিক্ষা-পর্ব শুধু দেশী সংগীতের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। পিয়ানো, বেহালা বাজানো ও দেশী-বিলাতী গানের চর্চা ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান শখ। পিয়ানোয় তিনি নিত্যনব সুরোদ্‌ভাবন করতেন ও তাকে কথায় ধরে রাখতেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতেই আছে—

> "সরোজিনী প্রকাশের (নভেম্বর, ১৮৭৫) পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্য-চর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় চৌধুরী, রবি ও আমি।"[১]

এই পর্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'ছেলেবেলা'তে লিখেছেন, 'এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা'। শুধু গান রচনাই নয়, অন্ততঃ জাতীয় সংগীত রচনা

১. দ্রষ্টব্য: 'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, ১৯৭০, বাল্মীকিপ্রতিভা, পৃ ১০১

করে যে এই যুগেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার প্রমাণ 'জাতীয় সংগীত' দ্বিতীয় সংস্করণে ( ১৮৭৮ ) তাঁর চারটি স্বদেশী সংগীতের প্রকাশ।[১]

বিলাতে বাসকালীন বিদেশী সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয় এবং তিনি সেই সুরে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ইওরোপীয় সুর তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

> "য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক।· ·ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।"

—'জীবনস্মৃতি', বিলাতি সংগীত

দেশে ফিরে আসবার পর ( ১৮৮০ ) রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর গানের আসরে পুনর্বার যোগ দিলেন। তাঁরা দুজনে তখন দেশী-বিলাতী সুরের সাহায্যে সংগীতের বিভিন্ন পরীক্ষায় নিরত, বাংলা গানে নূতন নূতন রূপসৃষ্টির সাধনায় তন্ময়। এই ভাবে 'দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল।' ইওরোপে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে—

> "সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া···গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে··· ।"

—'জীবনস্মৃতি', বাল্মীকিপ্রতিভা

কিন্তু 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় কবি ইওরোপীয় আদর্শে দেশী সুরেরই 'বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে' লাগিয়েছেন। তাঁর মতে—

> "সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।"

—পূর্ববৎ

বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বন্ধনমোচন করে তাকে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগানোর পিছনে আরও একটি কারণ ছিল।

> "হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু

১. দ্রষ্টব্য: সজনীকান্ত দাস. 'রবীন্দ্রনাথ, জীবন ও সাহিত্য', ১৩৬৭, রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী, পৃ ২১৭ গান চারটি হল: 'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা। জলদে', 'তোমারি তরে, মা সঁপিনু এ দেহ', 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' এবং 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি'।

চিত্র ৩



বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ

সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার-আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্‌সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।"

—পূর্ববৎ

উপরি-উল্লিখিত হার্বাট স্পেন্‌সরের প্রবন্ধটির নাম 'The Origin and Function of Music'। এই মতের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন (১২৮৮, ভারতী)। স্পেন্‌সরের মতের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন পরীক্ষায় নিযুক্ত হন, তারই ফল বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১)। এই নাটকে সকল প্রকার ভাব ও ভাষাই সুরসংযোগে ব্যক্ত। এই জাতীয় রচনা বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, বিশ্ব-সাহিত্যেও দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের এই নতুন পরীক্ষা ও প্রয়াস অসাধারণ সফলতা অর্জন করেছে। পরিণত বয়সে অনুরূপ রচনা তিনি আর করেন নি, কিন্তু অল্পবয়সের এই রচনাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, বিশেষতঃ প্রথম প্রয়াস হিসেবে এর সার্থকতার তুলনা নেই।

বাল্মীকিপ্রতিভায় বৈঠকী-ভাঙা গানের সুর, জ্যোতিদাদার উদ্‌ভাবিত গতের সুর এবং অন্তত তিনটি গানে বিলাতী সুর দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ বাল্মীকিপ্রতিভায় নাটকীয়তাই মুখ্য। সাধারণ গানের মত গান নয় এগুলি, সুরে কথোপকথন।

"উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা ;···ইহা সুরে নাটিকা, অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র···।'

—পূর্ববৎ

এই নূতন পরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে আর একটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন 'কালমৃগয়া' (১৮৮২)। বাল্মীকিপ্রতিভার মত এতেও হাস্যরস, করুণরস, নাট্যরস এবং বিলাতী সুরের সংমিশ্রণ আছে। বাল্মীকিপ্রতিভার কয়েকটি গানও ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে এতে ব্যবহৃত হয়েছে। দুটি নাটকই 'দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে' লেখা।

কিছুকাল পরে এই জাতীয় আর একটি 'গীতনাট্য' লিখেছিলেন—'মায়ার খেলা' ( ১৮৮৮ )। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতে 'তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য'।

বস্তুতঃ বাল্মীকিপ্রতিভা রচনার সময়ে, অর্থাৎ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর, সংগীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত ছিলেন। বিলাতগমনের পূর্বে আমেদাবাদ, বোম্বাইয়ে ও প্রত্যাবর্তনের পর কারোয়ারে মারাঠী সুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বাড়িতে জ্যোতিদাদারও মারাঠী ভাষা ও সুরে দখল ছিল। পিতার সঙ্গে অমৃতসর গুরুদরবারে গিয়ে শিখভজনেরও পরিচয় পেয়েছিলেন। আবার, 'সাহিত্য-দীক্ষা-দাতা' অক্ষয়চন্দ্রের মারফৎ তিনি প্রাচীন বাংলা গীত-সাহিত্য ও লোকসংগীতের আস্বাদও লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলা গান, অ-বাংলা গান ও বিলাতী গানের চর্চা ও পরীক্ষানিরীক্ষা এবং তৎসঙ্গে অনুকরণ-স্বীকরণের পর্ব চলতে থাকে এই সময়ে। গানের এই সমস্ত পালা সাঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ স্ব-প্রতিষ্ঠিত হলেন 'ছবি ও গান' কাব্য রচনার কালে ( ১৮৮৪ )।

রবীন্দ্র-গীতসাহিত্য বলতে যা বোঝায়, রবীন্দ্রসংগীতের সেই যথার্থ স্বরূপটির প্রথম প্রকাশ 'ছবি ও গানে'। এই সময়েই ছন্দে, ভাষায়, অলংকারে, ভাবে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তাকে খুঁজে পেলেন। 'ছবি ও গান' থেকে যে পর্বের আরম্ভ, 'কড়ি ও কোমল' হয়ে 'কল্পনা' কাব্যে ( ১৯০০ ) তার পরিসমাপ্তি। 'কল্পনা'য় প্রেম সংগীত ( 'যাচনা', 'কাল্পনিক', 'ভিখারী', 'লীলা', 'বিরহ', 'লজ্জিতা', 'সংকোচ' প্রভৃতি ), স্বদেশী সংগীত ( 'সে আমার জননী রে', 'ভারতলক্ষ্মী' ) এবং যথার্থ রাবীন্দ্রিক ধর্মসংগীতের ( 'জন্মদিনের গান', 'পূর্ণকাম', 'পরিণাম' ইত্যাদি ) পরিচয় আছে। প্রেমসংগীত এই সময় সম্যক পরিণতি লাভ করে, যার ফলে আজও সেগুলি অম্লান ও আদরণীয়। এর পূর্বেকার জাতীয় সংগীতে ছিল যুগোচিত উন্মাদনা ও ভাবাবেগ। এবারে নিজস্ব গভীর অনুভূতি ধরা দিল গানে। বস্তুতঃ গভীর হৃদয়াবেগ-জাত স্বদেশপ্রেমের গান 'কড়ি ও কোমলে'ই আছে। 'বঙ্গভূমির প্রতি', 'বঙ্গবাসীর প্রতি' প্রভৃতি গানে যে স্বদেশানুভূতির প্রকাশ, তারই পরিণত রূপ 'কল্পনা' কাব্যে। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি' কাব্যে গান নেই, স্বদেশচিন্তা-মূলক কবিতা আছে। 'ছবি ও গান' থেকে শুরু করে 'কল্পনা' পর্যন্ত কালপর্বকে যথার্থ রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিকাশপর্ব বলা যায়।

'নৈবেদ্য' কাব্যে ( ১৯০১ ) ভগবৎপ্রেম আরও গভীর হয়ে দেখা দিল। 'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী', 'নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে', 'তোমারি

রাগিণী জীবনকুঞ্জে', 'জীবনে আমার যত আনন্দ', 'তোমার পতাকা যারে দাও' ইত্যাদি বহু গানে রবীন্দ্রনাথের ভগবৎপ্রেম সুস্পষ্ট রূপলাভ করেছে। 'কল্পনা'য় স্বদেশচিন্তার সঙ্গে কর্মযোগের কথাও বলা হয়েছে ( 'অশেষ' )। কর্মের কথা 'সোনার তরী'র ভূমিকায়, 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় খুবই স্পষ্ট। 'নৈবেদ্য' রচনার কালে কবির মনে স্বদেশপ্রেম ও কর্মপ্রেরণা আরও তীব্র ও গভীর হয়ে ওঠে। স্বদেশকে তিনি প্রাচীন ভারতের আদর্শেই গড়ে তুলতে চাইলেন এবং সেই আদর্শায়িত স্বদেশচিন্তাকে কর্মের মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট রূপদান করবার জন্য সেই সময়েই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনা করেন। 'কল্পনা' কাব্যে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে রোমান্টিক 'স্বপ্ন' দেখেছেন কবি। কিন্তু 'নৈবেদ্যে'র সনেটগুলিতে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ও আদর্শগত রূপটি কবির কাছে মহৎ ও বৃহৎ হয়ে ধরা দিল। তার এই সময়কার স্বদেশী গানেও ( আঃ ১৯০২ খৃঃ ) সেই মহান্ ভারতের কাছেই স্বদেশের দীক্ষা নেবার বাসনা ও সংকল্প ধ্বনিত।

> "নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা—
> তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।"

এবং

> "হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান।
> তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।"

—জাতীয় সংগীত

সাহিত্যজীবনের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সংগীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র সময় থেকে তাঁর নিজস্ব, গভীর ও আত্মগত দেশপ্রেম ব্যক্ত হতে থাকে। দেশগঠনের কর্মপ্রেরণা ও প্রাচীন ভারতের আদর্শে আদর্শায়িত দেশপ্রেম দেখা দিয়েছিল 'নৈবেদ্যে'র কালে। আর, এই দেশপ্রেমের পটভূমিতে যখন ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ করলেন বিদেশী সরকার, তখন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের ধারা হঠাৎ-বাঁধন-হারা কুলপ্লাবী বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হল। এই স্বদেশী গানগুলিকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহ্য করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এগুলিতে লোকছন্দ, লোকভাষা, লোকপ্রচলিত উপমা ও লোকগীতির সুর ব্যবহার করেছেন। স্বদেশপ্রেম পর্যায়ে এই গানগুলির বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করা যাবে।

'খেয়া' কাব্য ( ১৯০৬ ) পূর্বতন ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হলেও, গীতরচনাধারা একটা নূতন বাঁক নিল 'খেয়া'র যুগে। প্রকৃতপক্ষে, 'খেয়া' থেকে

'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালি' (১৯১৪) পর্যন্ত কালপর্বকে রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের যৌবনকাল বলা যায়। এক সঙ্গে গীতরচনাধারার বিভিন্ন উৎসমুখ খুলে গেল এই সময়, রবীন্দ্রপ্রতিভা পরিপূর্ণ স্ফূর্তি লাভ করল।

এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ 'পূজা'র গান রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভগবৎপ্রেম তৎপূর্বেই স্বকীয় রূপটি ধারণ করতে শুরু করে, এই পর্বে সেই বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক ভক্তি ও অনুভূতির চরম বিকাশ ঘটে। পরবর্তী 'ধর্ম' অংশে সে কথা বিস্তৃতাকারে বলা যাবে।

এই পর্বে রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যে আরও কয়েকটি নতুন ধারা যুক্ত হয়। নাট্য-সংগীতরচনা শুরু হয় এই যুগে। এর পূর্বেকার রবীন্দ্রনাটকে ('রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি) এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যান্য নাট্যকারদের রচনাতেও সংগীত স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যথার্থ 'নাট্যসংগীত'-গুলি নিছক নাটকে সন্নিবিষ্ট সংগীতমাত্র নয়, এদের সাহায্যেই নাটকের মূল বক্তব্য এবং অভিপ্রায় বহুলাংশে অভিব্যক্ত। নাটকের প্রাণস্বরূপ এই গানগুলিকে বাদ দিলে নাটকের অঙ্গহানি তো হয়ই, নাটকের মূল রসরূপটিও থাকে অপ্রকাশিত। 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) এবং 'অচলায়তন' (১৯১২) নাটকে প্রথম এই জাতীয় যথার্থ নাট্যসংগীতের উদ্ভব হল।

'শারদোৎসবে'র অনেকগুলি গান 'গীতাঞ্জলি'তে স্থান পেয়েছে। 'শারদোৎসব' হচ্ছে ঋতুনাট্য। 'শারদোৎসব' থেকেই ঋতুনাট্য রচনার ধারাও চলতে থাকে। 'শারদোৎসবে'র ঋতুসংগীত ছাড়া, অন্যান্য ঋতুসংগীতও 'গীতাঞ্জলি'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিসংগীত রচনারও সূত্রপাত হয়। তাঁর প্রকৃতিসংগীতগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ। এর পূর্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তরূপে প্রকৃতির গান রচিত হলেও যথার্থ প্রকৃতিসংগীত রচনার আরম্ভ হয় এই পর্বেই। আত্মগত ভাবানুভূতির প্রেরণায় স্বদেশ, ঈশ্বর বা প্রেমবিষয়ক সংগীতরচনাই এতকাল আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এবারে সেই প্রেরণায় প্রকৃতিসংগীত রচনা চলতে থাকল।

'খেয়া' থেকে যে পর্বের শুরু, তা চলতে থাকে 'ফাল্গুনী'র (১৯১৬) পূর্ব পর্যন্ত। 'ফাল্গুনী' থেকে যে পর্বের সূচনা, সেখানে ঋতু-প্রকৃতির আধিপত্য। 'ফাল্গুনী' সংগীতপ্রধান ঋতুনাট্য— গানের ভিতর দিয়ে বক্তব্যবিষয় সুপরিস্ফুট। এর পরেও 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬) প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যসংগীতের ধারাটি প্রবাহিত হয়ে চলল। অন্যদিকে মূলতঃ প্রকৃতিকেই অবলম্বন করে 'বসন্ত'

(১৯২৩), 'শেষবর্ষণ' (১৯২৬), 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' (১৯৩১), 'নবীন' (১৯৩১), 'শ্রাবণগাথা' (১৯৩৪) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচিত হয়। তা ছাড়া, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রকৃতিসংগীতরচনা চলতে থাকে নিরন্তর, বিশেষতঃ বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে। বলা বাহুল্য, ধর্মসংগীত, স্বদেশী সংগীত রচনার আবেগ এই সময় প্রশমিত হলেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। প্রেমসংগীতরচনার ধারাও ছিল অচ্ছিন্ন।

রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিবর্তনে সর্বশেষ পর্যায়ে রচিত হয় তার নৃত্য-নাট্যগুলি। 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮) ও 'শ্যামা' (১৯৩৯) —এই তিনটি নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। জীবনের প্রারম্ভে কবি 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' রচনা করেছিলেন, সংগীতের এক নূতন পরীক্ষা হিসেবে। সেই নাট্যগুণ-সমন্বিত সংগীত-প্রধান রচনাগুলির দ্বারা যে জাতীয় নাট্যধারার সূত্রপাত ঘটেছিল, তারই পরিপূর্ণ বিকাশ এই তিনটি নৃত্যনাট্যে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা'কেও নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছিলেন (রচনা ১৩৪৫, পৌষ), কিন্তু সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় কখনও হয় নি।[১] 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' নামক কবিতাটিকে একসময় অভিনয়যোগ্য রূপ দিয়েছিলেন 'পরিশোধ' নামেই (প্রবাসী, ১৩৪৩, কার্তিক)। একে তিনি 'নাট্য-গীতি' আখ্যা দেন। নৃত্যাভিনয়ই যে এই রচনার উদ্দেশ্য, সে কথাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। 'পরিশোধ'-রচনার সময়ে নৃত্যরস ও নাট্যরসের যে সম্মিলনের কথা কবির মনে এসেছিল, তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ পূর্বোক্ত নৃত্যনাট্য তিনটি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, 'শ্যামা'র বিষয়বস্তুও 'পরিশোধ' থেকেই গৃহীত। 'পরিশোধে'রই পরিবর্তিত, পরিশোধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ 'শ্যামা'। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে বলেছেন 'দেহভঙ্গির সংগীত'। নৃত্যকলা, সংগীতকলা ও নাট্যকলা— এই তিন শিল্পকলার সমন্বয়ে নৃত্যনাট্যগুলি ভারতীয় কাব্যনাটক ও নৃত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্ত উদ্‌ভাসিত করেছে। এগুলি একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নূতন সাহিত্যসৃষ্টি। যে প্রেমসংগীতধারা চলে এসেছিল অল্পবয়সের রচনাকাল থেকেই, তারও চরম পরিণতি 'চিত্রাঙ্গদা'-'চণ্ডালিকা'-'শ্যামা'র গানে। প্রেমের সু-উচ্চ ও মহৎ আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই নৃত্যনাট্যগুলিতে। অধিকন্তু 'চণ্ডালিকা'য় কবির সমাজদৃষ্টি, সামাজিক বিভেদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত। মহামানবিক রবীন্দ্রনাথের সামাজিক মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে

১. দ্রষ্টব্য: 'গীতবিতান' তৃতীয় খণ্ড: গ্রন্থপরিচয়

বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে। আর, 'শ্যামা' নাটকীয়তার গুণে সমৃদ্ধ। শ্যামা ও বজ্রসেনের মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্ব সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে অতি অনায়াসে ও আশ্চর্য সুন্দররূপে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিল্প এই নৃত্যনাট্যগুলিতে বিশেষতঃ 'শ্যামা'য় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। 'পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য'— এই উক্তির যাথাথ্য সুপ্রমাণিত হয়েছে এই তিনটি নৃত্যনাট্যে। ছন্দে, বন্ধে, ভাষায় ও অলংকারে এগুলি চিরন্তন সংগীতের আদর্শস্থানীয়। অথচ গানগুলি প্রধানতঃ সংলাপময় এবং সাধারণ গানের মত করে এগুলি গাওয়াও হয় না। নাটকীয় গতি গানের মধ্যেও সঞ্চারিত। কোন পুনরাবৃত্তি নেই, ধুয়া নেই, একটানা গেয়ে যাওয়া হয় গানগুলি। কিন্তু তার মধ্যেই এদের শিল্পগত চমৎকারিত্ব অপূর্বরূপে পরিস্ফুট।

অর্থাৎ নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়— এই তিন শিল্পকলার সঙ্গে মানবিকতা, নাটকীয়তা ও আলংকারিকতা মিশ্রিত হয়ে এই তিনটি নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী-মানসের বিস্ময়কর সৃষ্টি। এগুলির সাহায্যে রবীন্দ্র-গীতপ্রতিভা জীবনের শেষে উৎকর্ষ ও সার্থকতার তুঙ্গ স্পর্শ করেছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের ভাবসম্পদ

গীতবিতানে রবীন্দ্রসংগীতগুলিকে 'পূজা', 'স্বদেশ' ( এবং 'জাতীয় সংগীত' ), 'প্রেম', 'প্রকৃতি', 'বিচিত্র' এবং 'আনুষ্ঠানিক'—এই কয়েকটিমাত্র বৃহদায়তন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। কিন্তু এই ক'টি খণ্ডের দ্বারা গানগুলির ভাবসম্পদের যথার্থ মূল্যবত্তা ও পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় না। সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গীতবিতান দ্বিতীয় সংস্করণের ( ভাদ্র, ১৩৪৬ ) 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছিলেন—

"গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন-কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

তৎসূত্রে, উক্ত সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ গানগুলিকে সূক্ষ্মতর বিভাগে বিন্যস্ত করেন। 'পূজা'র গানগুলি—গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ এবং পরিণয়—এতগুলি উপবিভাগে বিভক্ত। 'প্রেমে'র গানে—গান এবং প্রেমবৈচিত্র্য—এই দুটিমাত্র উপবিভাগ। 'প্রকৃতি'র গানগুলিও—সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত—এই ক'টি উপবিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে।

কিন্তু এই উপবিভাগগুলির দ্বারাও রবীন্দ্রসংগীতের বিচিত্রতম এবং সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকে যথাযথভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় না। হয়তো সেই কারণেই তৃতীয় সংস্করণে উপবিভাগগুলি রক্ষিত হয় নি। কেবলমাত্র প্রকৃতির গানগুলিতে ছয়টি ঋতুর উপবিভাগ রক্ষা করা হয়েছে।

বস্তুতঃ রবীন্দ্র-গীতরচনায় হৃদয়ানুভূতি ও রসোপলব্ধি এত সূক্ষ্ম, বিচিত্র, গভীর ও নিবিড় যে, অনেক গানকেই কোন উপবিভাগে তো নয়ই, কোন

মূল পর্যায়ের অন্তর্গত করতেও দ্বিধা জন্মায়। পূজা, প্রেম বা প্রকৃতির চিন্তা বহুক্ষেত্রেই এমন বিমিশ্রিত যে, কোন কোন গীতরচনার বিশিষ্ট শ্রেণীনির্দেশ করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, গীতবিতানের প্রতিটি পর্যায়ের গানেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য ও রসবৈচিত্র্য ঘটেছে— সেগুলির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞানিরূপণ প্রায় অসম্ভব। তাই, সে দুঃসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হয়ে, কেবল ভাবনার বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, বর্তমান অধ্যায়টিকে— 'আনন্দ,' 'ধর্ম'. 'প্রেম', ( মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম ) এবং 'বিবিধ'— এই চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে, গানগুলির ভাবসম্পদের বিবর্তন ও স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস করা গেল।

## আনন্দ

রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মকে এক কথায় প্রকাশ করতে হলে বলা যায়, তিনি আনন্দের কবি। বিশ্বভুবনে যে আনন্দধারা প্রবাহিত, তাতে অবগাহন করে, সেই ধারাজল পান করে তিনি স্নিগ্ধ, পরিতৃপ্ত। তাঁর প্রেমবোধ, সৌন্দর্যবোধ— সবই সেই আনন্দবোধ-জাত।

আবাল্য উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' কিংবা 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' প্রভৃতি আনন্দমন্ত্রগুলি স্বভাবতই অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর জীবনের এক পরম শুভক্ষণে সদর স্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দায় সূর্যোদয়ের সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, 'একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত'। সেদিন তাঁর প্রথম বিশ্বের আনন্দরূপ-দর্শন। তদবধি নিখিলবিশ্বকে তিনি তার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে দেখতে শুরু করেন। এই আনন্দদর্শন রবীন্দ্রনাথের জীবনেব শেষ পর্যন্ত ছিল নিরবচ্ছিন্ন। গদ্যে, পদ্যে, প্রবন্ধে, গানে তিনি নিরন্তর আনন্দের পূজারী। তাই তাঁর আত্মপরিচয়—

> "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
> ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন॥
> নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
> শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন॥"

—পূজা, জগতে আনন্দযজ্ঞে

জীবনের উপান্তেও উপনিষদের আনন্দবাণী তিনি স্মরণ করেছেন—

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।"

—'রোগশয্যায়', ২৫, 'জীবনের দুঃখে শোকে'

এই অনুভূতিরই পুনঃপ্রকাশ—

"যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
... তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।"

—'রোগশয্যায়', ৩৬, 'যাহা কিছু চেয়েছিনু'

গানেও বললেন—

"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে॥"

—পূজা, আনন্দধারা বহিছে

উপনিষদীয় ঋষির বাণীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের রচনায় থাকলেও, উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে তিনি নূতনতর তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন। উপরন্তু তাঁর চিন্তায় আনন্দবোধ বিশেষ ব্যাপ্তিলাভ করেছে।

বিশ্বদেবতার বিশ্বসৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি—তা খেলারই নামান্তর।

"খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল, খেলতে খেলতে ফল যে ফলে—
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।"

—বিচিত্র, মোদের যেমন খেলা

মানবজন্মও তার খেলারই ফল। এই খেলা বা লীলার কোন কারণ নেই, ফলাফলও নেই। বিশুদ্ধ আনন্দেই এর শেষ পরিচয়। অতএব সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূলেই রয়েছে আনন্দের উদ্‌বোধন। তাই, 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা'। বিশ্বের এই আনন্দরূপটি রবীন্দ্রসাহিত্য-সৃষ্টির অনন্ত প্রেরণা।

"ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার

আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই-যে মানস-সংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই-যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ।"

—'সাহিত্য', সাহিত্যের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথের আনন্দচিন্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ। যা দেখেন তাই সুন্দর মনে হয়, ভালো লাগে, তাতেই আনন্দলাভ হয়।

"এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।
··· সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমাব বীণা বাজায়।"

—বিচিত্র, এই তো ভালো লেগেছিল

আনন্দ কিন্তু নিছক সুখ নয়, আনন্দ জীবনেব সত্যরূপ। আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে কবি লিখেছেন—

"আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহেব অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়, এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত।···আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য।···আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে।···সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ, দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে।"

—'আত্মপরিচয়', তৃতীয় প্রবন্ধ

আনন্দ সম্পর্কে কবিকৃত ব্যাখ্যা পাঠ করলেই বোঝা যায়, কেন তিনি তার রচনায় দুঃখকে বরণ করেছেন, রুদ্রকে আবাহন করেছেন। দুঃখের মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যেই আনন্দের প্রকৃত পরিচয়।

"আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে— ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।"

—পূর্ববৎ

চিত্র ৪

এই ত ভালো লেগেছিল
আলোর নাচন পাতায় পাতায়, —
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া
এই ত আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোট মেয়ে ধুলায় বসে
খেলার ডালি একলা সাজায়, —
সামনে চেয়ে এই যা দেখি
চোখে আমার বীণা বাজায়।

আমার এ যে বাঁশের বাঁশি,
মাঠের সুরে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছে রে
এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা
পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া
নিয়েছি মোর দু চোখ পুরে।
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি
ওদের কচি গলার সুরে।

পাণ্ডুলিপি : 'এই তো ভালো লেগেছিল' (১১১)

রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ

সমস্ত দুঃখ-মৃত্যু-বিরোধের অবসানেই অসীমের আবির্ভাব, আনন্দের অভ্যুদয়। 'দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ'। তাই,

"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে ॥
... সকালবেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে ॥"

—পূজা, যে রাতে মোর

মহাদুঃখের মধ্যেই ভূমানন্দের প্রকাশ। এই দুঃখকে নিছক সুখের অভাব ভাবলে ভুল করা হবে। 'রক্তকরবী' নাটকের বিশুপাগল তাই কেবল দুঃখের গান গায়। দুঃখের তরী বেয়েই আনন্দের সাগরে ভাসতে হয়।

"আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস রে সবাই, টান রে সবাই টান ॥
বোঝা যত বোঝাই করি করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি—যায় যদি যাক প্রাণ ॥"

—বিচিত্র, আনন্দেরই সাগর হতে

সেই কারণেই বলেছেন

"সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে
যাক-না গো সুখ জ্বলে।"

—পূজা, সুখে আমায়

দুঃখের মধ্য দিয়ে সত্যকে জানা যায়, আঘাতের ভিতর দিয়েই আসে ভগবানের আশীর্বাদ।

"এসো দুঃসহ, এসো এসো নিদয়, তোমারি হউক জয়
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয় ॥"

—পূজা, ভেঙেছ দুয়ার

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ দুঃসহ দুঃখ এবং আঘাত পেয়েছেন বারংবার। দুঃখের নিষ্ঠুর পীড়নের ফলে তিনি দুঃখবাদী কবি হলেও আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু দুঃখের মধ্যে তিনি গভীরতর সত্যরূপে আনন্দকেই প্রত্যক্ষ করলেন। কবি ও দার্শনিক

দুই রূপেই তিনি আনন্দবাদী। এই উপলব্ধি তাঁর কাব্যকল্পনা নয়, অভিজ্ঞতাজাত। তিনি যথার্থ ই ঔপনিষদিক, আনন্দবাদী কবি।

"চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তা হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোন আশ্রয় পেত না···। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্— রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ।···কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন. সে সত্য নয়।

··· ··· ···

আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।"

—'আত্মপরিচয়', তৃতীয় প্রবন্ধ

পরিচ্ছেদের সূচনাতেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি। 'আত্মপরিচয়' দ্বারাই সেই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টা করা যাক্।

"আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারিনে—···কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি— কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে-বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে-আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ববিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

… সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
… মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।

… শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্।"

—পূর্ববৎ

আনন্দের যে বিচিত্রতা এবং ব্যাপ্তি কবি উপলব্ধি করেছিলেন, বহু গানে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। তার নিদর্শনস্বরূপ দুটিমাত্র গীতাংশ উৎকলিত করে বর্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করা গেল।

"জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি,
জয় তোমার করুণা।
জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা।
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা।"

—পূজা, জয় তব বিচিত্র আনন্দ

"মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন।
জয় জয় আনন্দময়
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন
জয় জয় আনন্দময়।
আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে,
আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যু বিরহে শোকে—
জয় জয় আনন্দময়॥"

—বিচিত্র, মোরা সত্যের পরে মন

## ধর্ম

সংগীতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার প্রকাশ ও প্রতিফলন কি ভাবে ঘটেছে, সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ও ধর্মজীবনের পটভূমি ও বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

১

বাংলা দেশের এক পরম শুভক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সে যুগ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তি—

"১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়।"

—শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'

বস্তুতঃ এই মাহেন্দ্রক্ষণেই বঙ্গের পূর্বদিগন্তে 'সূর্যোদয়' হয়েছিল। সে যুগের ভারতবর্ষে ধর্মীয়, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের যে ত্রিবেণী-সংগম ঘটেছিল, তার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Religion of an Artist' গ্রন্থে নিজেই ব্যক্ত করেছেন।

ধর্মান্দোলনের সূচনা হয় রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা। রামমোহন রায় বেদান্ত অবলম্বনে যে ধর্মসংস্কার করেছিলেন, পরবর্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তারই অনুসরণ করেন এবং তাকে নবরূপ ও নবশক্তি দান করেন। কিন্তু, কালক্রমে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ব্রাহ্মসমাজে, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,—এই তিনটি বিভাগ সৃষ্ট হয়। অন্যদিকে সেই সময়েই দয়ানন্দ স্বামী আর্যসমাজী হিন্দুধর্মের আন্দোলন শুরু করেন। চট্টগ্রামে ও কলকাতায় বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা বৈষ্ণবধর্মের পুনরুত্থানে প্রয়াসী হন। রামকৃষ্ণ পরমহংস এই সময় আর এক উদার ধর্মভাবনার প্রবর্তন করেন। খৃষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচারে বহু বাঙালি মনীষী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। আবার হিউম, মিল, কোঁত, হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীদের নাস্তিত্ববাদও আমাদের দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এইরূপ ব্যাপক ধর্মীয় সংঘর্ষ ও তীব্র বিপ্লবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তার প্রভাব ও প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে সুস্পষ্ট। কেননা,

"বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে, প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়।"

—'কালান্তর', রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

পারিবারিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের উত্তরাধিকার লাভ করলেও, একমাত্র সেই ধর্মমতকেই তিনি চিরকাল অনুসরণ করে চলেন নি। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি সমাজনির্দিষ্ট

বিধির পরিবর্তন করে অব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্য দান করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ধর্মমত সম্পর্কেও তিনি সর্বদা পিতৃপন্থাবলম্বী ছিলেন না—

"আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।"

—'জীবনস্মৃতি', ভগ্নহৃদয়

পঞ্চাশ বৎসর বয়সের এই স্বীকারোক্তি সত্তর বৎসর বয়সেও ছিল অক্ষুণ্ণ।

"আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। ...পিতৃদেব...নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনো কখনো তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।"

—'মানুষের ধর্ম', মানবসত্য

'জীবনস্মৃতি'র উপরি-উক্ত অংশেই কবি বলেছেন নাস্তিকদের ধর্মবিদ্রোহ তাঁকে পীড়া দিলেও 'ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে।' শুধু নাস্তিত্ববাদ নয়, তৎকালীন ধর্মবিপ্লবের সম্পূর্ণ চিত্রটিই তাঁর মনে অধিকার বিস্তার করেছিল, সে কথা ক্রমে সুস্পষ্ট করা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা' কেবল উত্তেজনালাভের জন্য।' কিন্তু এই 'উত্তেজনার আগুন' সেকালকার মত প্রশমিত হয়ে গেলেও, তার পরোক্ষ প্রণোদনা জীবনপথের সঙ্গী হয়েই ছিল। সেই কারণেই সুদীর্ঘ জীবনপথ-পরিক্রমায় তাঁর ধর্মমত বারংবার বিবর্তিত হয়েছে এবং তাঁর মতে এই বিবর্তনই কাম্য—

"মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। ...ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না।"

—'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ২

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কবির যোগসূত্র ক্রমে ছিন্ন হয়ে যায়। মহর্ষি কর্তৃক আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হলেও,

"প্রথম দিকে কবি এই কার্য কর্তব্য হিসাবে নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন,

তদধিক উৎসাহ কখনও দেখান নাই। সেই উৎসাহ হ্রাস পাইতে পাইতে এমনই হইল যে শেষকালে তাঁহারই জীবদ্দশায় আদিব্রাহ্মসমাজের নিত্যকাজ বন্ধ হইল।"

—'রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড, ১৯৭৭, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ', পৃ ২৪২

এ কথা সর্বথা সত্য না হলেও, এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সত্য নিহিত আছে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে দেখি রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অনুরক্ত। 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে, তৎকালীন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নানান্ বিধিনিষেধের মধ্যে এই ধর্মনিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে। এই মনোবৃত্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্ম-পুনরুজ্জীবনের পরোক্ষ প্রভাব বলেই মনে হয়। সে যুগের বিভিন্ন ধর্মবিপ্লবের চিত্র পাই 'গোরা' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ধর্মীয় পটভূমিতে। 'গোরা'য় হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের দ্বন্দ্ব এবং 'চতুরঙ্গে' নাস্তিক জ্যাঠামশাই-এর মানব-সেবা ও লীলানন্দ স্বামীর বৈষ্ণব রসসাধনার চিত্র পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথেব মনে সে যুগের ধর্মান্দোলনের যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, তারই প্রকাশ গোরা চরিত্রে। আর, গোরা যেখানে সকল দ্বন্দ্ব-সমস্যার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়ে প্রার্থনা কবল—'আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই…যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা'—সেখানে রবীন্দ্রনাথেরও সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে মুক্তি। তখনই তিনি তাঁর যথার্থ সত্যধর্মকে খুঁজে পেলেন, যে ধর্ম সর্বজনীন ভারতীয় ধম।

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।"

—'গীতাঞ্জলি', ১০৬, 'হে মোর চিত্ত', (ভারততীর্থ)

এই উদার সর্বজনীন ধর্ম সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণ বিধিনিষেধের বহির্ভূত। এ হল চিরন্তন সত্যধর্ম।

"আমার যে ধর্ম এটা নিত্যধর্ম, এর উপাসনা নিত্য-উপাসনা।…জগতের

ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে।"

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ১৮৭, ১১ ফেব্রুআরি, ১৮৯৫

এই প্রেমধর্মের ভক্তিবিগলিত গান আছে 'গীতাঞ্জলি'তে। সগুণ ঈশ্বরের প্রতি সেই ভক্তিবিহ্বলতা—

"কেবল লৌকিক হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক্ তাহা নহে তাহা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অন্যরূপ ; তাহার ধর্ম তাঁহার নিজেরই।"

—'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খণ্ড, ১৯৭৭, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ', পৃ ২৪২

'গীতাঞ্জলি'তে, ভক্তিবিহ্বল গানগুলির পাশেই কিন্তু আবার এমন গান স্থান পেয়েছে, যেখানে ঈশ্বর নেমে এসেছেন 'সব-হারাদের মাঝে', 'যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ'। সেই দেবতার সঙ্গে মিলবার উপায় 'কর্মযোগ', 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা'য় সে মিলন সম্ভব নয়।

কবিগুরু 'ধর্মমোহ'কে অতিক্রম করেছিলেন। সকল প্রকার dogma, creed বা বীজমন্ত্র, এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতাকে তিনি নির্মম আঘাত করে ধূলিসাৎ করতে চেয়েছিলেন। তাই বলেছেন—

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।...
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।...
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

—'পরিশেষ', ধর্মমোহ

সর্বসাম্প্রদায়িক উদার বিশ্বজনীন ভারতীয় ধর্মই তাঁর সত্যধর্ম। এই সত্যধর্মের প্রতি আকর্ষণ 'গীতাঞ্জলি'তে সুপরিস্ফুট। এই ধর্মাদর্শে একদিকে আছে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রুদ্ররোষ ও বিনাশের শক্তিমন্ত্রের বাণী, অন্যদিকে উদার বিশ্বজনীনতার প্রতি প্রসন্ন চিত্তের আকর্ষণ ও সৃষ্টি আনন্দবাণীর আশ্রয়।

প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে নিরাকার ভগবৎভক্তির প্রগাঢ়তা কমে এল, ভগবানকে তিনি পেলেন মানবের অন্তরতম সত্তা হিসাবে। উপনিষদের 'সোঽহং'

তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই তিনি আবিষ্কার করলেন 'মানবব্রহ্ম'কে, 'পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ'। এ ধর্মের সাধনা 'মনুষ্যত্বের সাধনা'। উনবিংশ শতকের অজ্ঞেয়বাদীরা মানবতাবাদী ছিলেন। তাঁদের সেই মানবপ্রেম কবির মনকে নাড়া দিয়েছিল। পূর্বোক্ত কবিতাতেই আছে তার প্রমাণ।

"নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।"

"কোনো ব্যক্তি নাস্তিক হতে পারে কিন্তু সেই নাস্তিক যাকে সত্য ব'লে জানে দূরদেশে, ভাবীকালে, সেও তাকে সার্থক করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।"

—'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ৯

রবীন্দ্রনাথ সেই মানবপ্রেমকে আত্মিক রূপ দিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক সংজ্ঞা দান করলেন। জ্ঞান ও প্রেমের সম্মিলনে সেই 'ব্রহ্ম'কেই আবিষ্কার করলেন, যিনি 'মানব পরমাত্মা ··· সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।

উনবিংশ শতকের অপব একজন মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন, উপনিষদের 'তৎত্বমসি' মন্ত্র তাঁর ধর্মভাবনার মূলমন্ত্র ছিল। তার সঙ্গে তিনি মিলিয়েছিলেন বৌদ্ধ প্রেমসাধনা ও কল্যাণসাধনাকে। কর্মেব দ্বারাই তিনি প্রেম, মৈত্রী ও কল্যাণের বাণী প্রচার করেছিলেন, উপনিষদেব অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধ সর্বজনীন প্রেমধর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি দেশবিদেশে সেবামন্দির প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও একবার বললেন—'মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহম; এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যেই আমরা মানুষ।' আবার বললেন—

"সেই মানবদেবতাকে মানুষেব মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরকৃখে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।"

—'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ৩

দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মভাবনা ছিল মূলতঃ একই। তবে বিবেকানন্দ প্রধানতঃ কর্মী, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি-দার্শনিক।

বিবেকানন্দ মানব কল্যাণকর্মের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্ববিকাশের সাধনা দ্বারা মানবজীবন চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন।

'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতায় কবি আত্মপরিচয় ও নিজ ধর্মমতের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

"শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।"

তাই

"দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।"

পূজা নেমে এল

"দেবলোক থেকে
মানবলোকে।"

এইভাবে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের ভগবৎচিন্তার বিবর্তনে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের বিভিন্ন ধর্মবিপ্লবের সুস্পষ্ট ও সুসমন্বিত পরিণতি ঘটেছিল। এই বিবর্তনের কিছু পরিচয় তাঁর গানেও আছে। তবে, রবীন্দ্রসংগীতের কালক্রম-অনুযায়ী পর্যায়বিভাগ না থাকায়, এমন কি 'পূজা'র গানগুলিও গীতবিতানে কালানুযায়ী ধারাবাহিক ও সুপরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত না থাকায়, সংগীতে ধর্মচিন্তা-বিবর্তনের চিত্রটি সুপরিস্ফুট নয় এবং বর্তমান সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সমগ্র পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য। তবুও যথাযোগ্য দৃষ্টান্ত সহযোগে পরবর্তী অংশে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা গেল।

২

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, ধর্মসংগীতের ক্ষেত্রেও সর্বশ্রেষ্ঠ গীতকার। 'গীতবিতানের 'পূজা' পর্যায়ের গানগুলিই তাঁর ধর্মসংগীত। সমগ্র রবীন্দ্রসংগীতসম্ভারে পূজার গানগুলি সংখ্যায় সর্বাধিক এবং এই গানগুলিই গীতবিতানে স্থান পেয়েছে সর্বাগ্রে।

রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন রায় নিজে ব্রহ্মসংগীত রচনা করতেন। ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য অনেকের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথও ব্রহ্মসংগীত-রচনা শুরু করেন। এর কিছু ছিল ফরমায়েসী, কিছু স্ব-প্রণোদিত। এই কিশোর বয়সের রচনাকালকে রবীন্দ্রনাথ 'কপিবুকের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এই যুগের রচনায় স্বকীয়তার অভাব ছিল। যদিও সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ বিচারে দেখা যায়, পরবর্তী কালের রবীন্দ্রসাহিত্যরূপ বিশাল মহীরুহের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটেছিল এই যুগেই। যাই হোক, এই যুগে রচিত গানগুলিতে ভাষা ও সুরের আড়ম্বর ছিল, ভাব ছিল সে তুলনায় অ-গভীর। জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবের গভীরতা অতলস্পর্শী, ভাষা স্বচ্ছ, সুসমঞ্জস, শক্তিশালী এবং সুর সহজ ও সরল হল। আত্মপ্রতিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ভগবৎপ্রেমের যথার্থ রূপটি খুঁজে পেলেন, আর তাঁর অন্তরতম আকুতির পরিচয়েই তাঁর আধ্যাত্মিক গানগুলি 'ব্রহ্মসংগীত' থেকে 'পূজার গানে' পরিণত হল। 'পূজা'র গানগুলি প্রধানতঃ বিশ্ববোধ বিশেষতঃ বিশ্ববেদনাবোধের মধ্য দিয়ে প্রেম ও আনন্দে উত্তীর্ণ হবার গান। এগুলিতে একদিকে যেমন অন্তর্মুখিতা, অন্যদিকে তেমনই বিশ্বজনীনতা। সে বিশ্বজনীনতা ধর্মনিরপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা নানা প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মূল সূত্রটি গানেই আছে। এইখানেই 'পূজা'র গানগুলির সার্থকতা। তথাপি, এই কথাও স্মরণীয় যে, তাঁর ব্রহ্মসংগীতগুলিও অধিকাংশ ব্রহ্মসংগীতকারের রচনা থেকে শ্রেষ্ঠ।

বাংলা সাহিত্যধারায় পদাবলী সাহিত্য একটি প্রধান শাখা। চর্যাপদাবলী, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী এবং বাউল পদাবলী এই শাখার অন্তর্গত। রামমোহন রায় থেকে ব্রহ্মসংগীত-রচনার যে ধারাটি প্রবাহিত হল, তাকেও তদনুসারে 'ব্রাহ্মপদাবলী' আখ্যা দেওয়া যায়। চণ্ডীদাস যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর, রবীন্দ্রনাথও তেমনই ব্রাহ্মপদাবলীর শ্রেষ্ঠ গীতিকার।

ব্রাহ্মধর্ম দ্বৈতবাদী।

"তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।"

রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'র গানে এই দ্বৈতবাদী ভক্তিচিন্তার বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকাশ আছে। দেবতাকে পিতা বলে, প্রভু বলে, কবি ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পূজা' পর্যায় থেকে কয়েকটি গানের অংশ উৎকলন করা গেল।

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।"

আবেগবিগলিত চিত্তের ভক্তিবিহ্বলতা—

"ওই আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥"

কোথাও বলপ্রার্থনা—

"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

কখনও বা চিরকাল প্রভুর কৃপালাভ করার ইচ্ছা—

"চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর, নির্জনসজনে সঙ্গে রহো॥"

কখনও আকুলতা—

"প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে।"

কখনও নিশ্চিন্ত নির্ভর—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥"

এই জাতীয় সমস্ত গানেই কবি দ্বৈতবাদী। দেবতাকে তিনি মানবসত্তার বাইরে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে কল্পনা করেছেন।

কিন্তু কোথাও কোথাও তিনি স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদীও নন, স্পষ্টতঃ অদ্বৈতবাদীও নন। নিজের মধ্যেই সর্বশক্তিমানের পূর্ণ প্রকাশ কোথাও বললেন না, আবার তিনি একান্তই মানবসত্তার বাইরে তাও বললেন না।

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর—
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥"

আমি ও তুমি ভিন্ন হয়েও এক, এক হয়েও ভিন্ন। এখানে তাঁকে বলা যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।

কোনদিনই ভগবানকে সম্পূর্ণ জানা যায় না। 'যত জানি তত জানি নে'। জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই জানারও বিকাশ। কিন্তু জানার শেষ নেই। তিনি জ্ঞাতাজ্ঞাত, ব্যক্তাব্যক্ত। মানবজীবনও তাই। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিপুল মানবাত্মার প্রতিনিধিরূপে কল্পনা করে লিখেছেন—

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা ॥"

আবার কোথাও ভগবানকে বলেছেন 'মহা-অজানা', 'অশেষ'। তিনি মানব-জীবনকেও 'অশেষ' করেছেন। জীবনের ঘাটে ঘাটে দেহতরী ভিড়িয়ে সেই একই মানবজীবন চলে আসছে আবহমান কাল।

"আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব ॥"

তিনি 'অমৃত', তৎসঙ্গে 'আমি'ও অমৃতের স্পর্শলাভ করেছি।

"জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে—...
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রসবরষন ॥"

কখনও পরিবারের সকলের মধ্যেই তিনি দেবতাকে অনুভব করলেন।

"পিতামাতা ভ্রাতা সব পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে
তুমি আছ মোর সাথ।"

—জীবনে আমার যত আনন্দ

আবার কোথাও দেবতাকে মাটির মানুষের সঙ্গে দেখেছেন।

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে॥"

এই জাতীয় চিন্তা কাব্যেও প্রতিফলিত, রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠক মাত্রই তা জানেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় বলেছিলেন—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

—'নৈবেদ্য', বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি

গানেও বললেন—

"জানি জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে,
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে॥"

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন চিন্তায়, বিভিন্ন রূপে তিনি দেবতার আরাধনা করেছেন। এই 'পূজা' একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক। সকল সময়োপযোগী, সকল মনোভাবের উপযোগী গান তিনি রচনা করেছেন। এই সংস্কারমুক্ত, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার ভগবৎপ্রেমের গান সম্পর্কে বিনয়কুমার সরকার বলেছেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উচ্চতম উৎকর্ষ হচ্ছে 'ভগবান্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রকল্পনা'।

"পৃথিবীর যে-কোনো জাতের লোক, যে-কোনো ধর্মের লোক, যে-কোনো দলের লোক এইরূপ ভগবান্ পেয়ে নিজেকে শক্তিমান সমঝিতে সমর্থ। রাবীন্দ্রিক ভগবৎ-সাহিত্যের মুদ্দাটা দেখবি? 'প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামি, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে',—এই গানটা শুনেছিস্ বোধহয়। রাবীন্দ্রিক ভগবান্ আগাগোড়া এই সুরে গড়া।...

...সকল প্রকার ভারতীয় ভগবানের কল্পনা রবীন্দ্র-চিত্তে ঠাই পেয়েছে। তবুও বল্‌ছি,—উপনিষদের মন্তরগুলায় যে-ভগবান্ পাওয়া যায় সেই ভগবানের সমান সনাতন ও বিশ্বজনীন রৈবিক ভগবান্। কিন্তু সেই ভগবানের চেয়ে এই রৈবিক ভগবান্ সরস, আত্মীয় ও মানুষ-ময় বেশী।... রবীন্দ্র-সৃষ্ট ভগবানের মতন মানুষমাত্রের কার্যোপযোগী, মানুষমাত্রের স্বাধীনতা-সেবক ভগবান্ আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।"

—'বিনয় সরকারের বৈঠকে', প্রথম ভাগ, ১৯৪৪, পৃ ৫৮

উক্ত গ্রন্থেই বলেছেন ( পৃ ৪৪৫ )—

> "আমি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধর্ম-গীতগুলার কথা বল্‌ছি। এই গানগুলা হিন্দু গানও নয়, মুসলমান গানও নয়। এ সব হচ্ছে বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ মাত্রের জন্য জগদীশ্বর-বিষয়ক স্তোত্র।"

রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন, যাব মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম মিলিত; উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মেব মৈত্রী ও করুণা এবং বৈষ্ণব ও খৃষ্টধর্মের প্রেম-ভক্তি একত্রে গ্রথিত। শিক্ষিত মনের উপযোগী, সাম্প্রদায়িকতা ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী তাঁর ধর্মসংগীতগুলিতে মন্দির, মসজিদ, বা গির্জার কোন উল্লেখ নেই। সর্ব-মানবধর্মের উদার মিলনক্ষেত্র এই 'পূজা'র গানগুলি যথার্থই অতুলনীয়। রসের প্রগাঢ়তা ও অনুভূতির গভীরতার সঙ্গে গানগুলিতে আছে মন্ত্রেব পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য। এগুলির সাহায্যে যে কোন মঙ্গলকার্য সাধিত হতে পারে।

বৈষ্ণব পদে ভক্তিরসেব কতকগুলি বাঁধাধরা রূপ আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি। রবীন্দ্রসংগীতে ভক্তির যে আরও কত বিচিত্র রূপ প্রকাশিত তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবানকে তিনি পিতা, প্রভু, নাথ, স্বামী, সখা, প্রিয়, অন্তরতম, অন্তর্যামী প্রভৃতি বহু সম্বোধনে অভিহিত করেছেন; সেই সঙ্গে তাঁর কাছে হৃদয়ের প্রেম, ভক্তি, নির্ভর, সংশয়, সংকট, দ্বন্দ্ব, বিপদ, শান্তি, ভরসা সকলই নিবেদন করেছেন। অবশ্য ভগবানকে তিনি কোথাও সন্তানরূপে দেখে বাৎসল্যভক্তি নিবেদন করেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু নিজে শিশুর মত বিনা প্রয়োজনেও তাঁকে ডেকেছেন—

> "তোমাবি নাম বলব নানা ছলে,...
> শিশু যেমন মাকে নামেব নেশায় ডাকে,
> বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে।"

রাবীন্দ্রিক 'পূজা' বা ভগবৎ-উপলব্ধির বিভিন্নতার কিছু কিছু পবিচয় দেওয়া হয়েছে। একঘেঁয়েমি ও নীরসতার ভয়ে অতিরিক্ত দৃষ্টান্তপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা গেল। তবে, উপরিলিখিত উদ্‌ধৃতিগুলি থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে ভগবৎ ভক্তির প্লাবনের সময়েও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িকতা বা বাঁধাধরা ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। এ ক্ষেত্রে তিনি চিরন্তন মানবমনেরই অনুসারী। সেই জন্যই হয়তো তাঁর ধর্মসংগীতগুলি এত বিচিত্র। ভক্তির গান তথা তাঁর সমস্ত গান সম্পর্কে তাঁর ভাষাতেই বলা যায় 'কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী'।

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ধর্মকে অতিক্রম করে এক মহান্ মানবধর্মকে স্বীকার করলেন। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত 'নিরাকার পৌত্তলিকতা'কেও অস্বীকার করে দেবতাকে বললেন 'মানবব্রহ্ম'। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেই আছে 'অমিতমানব', তাই 'মানুষের দায় মহামানবেব দায়'। মানুষ, 'শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম।' জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত মানবসত্তাই মানবব্রহ্ম'। 'সর্বমানবচিত্তের মহাদেশে' তাঁর অধিষ্ঠান।

যুগে যুগে ভারতপথিকেরা যে বাণী বহন করে এনেছেন, তারই সারসত্যটিকে তিনি 'মানুষের ধর্ম' বলে অভিহিত করলেন। যথার্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে যে বিশ্বজনীনতা নিহিত আছে, তারই চিরন্তন ভিত্তির উপর এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তার সাধনা সহজ নয়।

> "বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম-মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা।"
>
> —'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ৩

এখানেই রচিত হয়েছে বিশ্বধর্মের মিলনভূমি। এই ধর্ম অ-সাম্প্রদায়িক।

এই ধর্মচিন্তার সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ সুগভীব ঐক্য দেখেছিলেন বাউল ধর্মের। উপনিষদের বাণীরই প্রতিধ্বনি তিনি শুনেছিলেন 'অশিক্ষিত মাধুর্যে সবস' বাউল পদাবলীতে ( 'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ৩ )।

> "বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—
>
> অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে
> অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
> ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।
>
> যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুব মতোই।...
>
> এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে, আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ'।"

বাউলের মত তাই কবিও গাইলেন—

> "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
> তাই হেরি তায় সকল খানে॥

আছে সে নয়নতারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়—
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক-পানে ॥"

অথবা—

"আমার মন, যখন জাগলি না রে
ও তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।"

পরিণত রবীন্দ্রনাথ 'মানবজন্মতরীর মাঝি'কেই দেবতা বলে বরণ করলেন। একটি ধর্মসংগীতে লিখেছিলেন—

"যদি কোনো দিন তোমার আসনে আর-কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥"

—যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার

জীবনসন্ধ্যায় কবি কিন্তু তাঁর চিরদিবসের রাজার আসনে সত্যিই অন্য কাউকে বসালেন সযত্নে ও সদর্পে। তিনি 'মহামানব' বা 'নরনারায়ণ'। তাঁর অভ্যুদয়ের বিজয়বার্তা অকুণ্ঠে ঘোষিত হল—

"ওই মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে ॥···
উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি-উঠিল মহাকাশে ॥"

এই মহামানব কিন্তু ঈশ্বর নন, তিনি মানুষ। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' গ্রন্থে এই গানটির যে পূর্বতন খসড়া পাই, তার দ্বারা এ কথা স্পষ্টতর হয়।[১] পূর্বতন রূপটি ছিল—

"ঐ মানব আসে
মহামানব আসে
দিকে দিগন্তে রোমাঞ্চ লাগে
সারা ধরণীর ঘাসে ঘাসে।" ইত্যাদি

১. দ্রষ্টব্য; 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', ১৯৭০, 'রবীন্দ্র-জীবনের শেষ বৎসর', পৃ ২৬৫

উক্ত গ্রন্থ থেকে এই কথাও জানা যায় যে, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে 'মানবের জয়গান' করবার জন্যই গানটি রচিত হয়।[১]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন মনুষ্যত্ববিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হয় এবং হওয়া উচিত। তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যজীবনে সেই মোহমুক্তি ঘটেছিল। জীবনের প্রারম্ভে যে দেবতাকে তিনি ভক্তিবিগলিত চিত্তের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, জীবনসায়াহ্নে তাঁকে আবিষ্কার করলেন সকল মানুষের মধ্যে। দেবালয় বা ধর্মশাস্ত্র তাঁর কাছে 'দেবতার বন্দীশালা' বা 'ধর্মকারা' রূপে প্রতিভাত হল। চলিষ্ণু, জীবন্ত এবং পরম বিপ্লবী মনের পক্ষেই এই জাতীয় বিদ্রোহাত্মক উক্তি করা সম্ভব।

> "আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি— তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে— এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, তারই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"
>
> • —'আত্মপরিচয়', পঞ্চম প্রবন্ধ

সত্তর বৎসরের অধিক বয়সে এই জাতীয় আত্মবিশ্লেষণের পরে, তাঁর পক্ষে আর পূর্বতন পদ্ধতিতে ধর্মসংগীত-রচনা সম্ভব ছিল না। যদি এ সময় কোন ভক্তিবিহ্বল গান রচনা করেও থাকেন, মনে হয় তা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক বা কোন বিশেষ উপলক্ষে রচিত। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'র গানে ভক্তি-আপ্লুত গানের সংখ্যাই বেশি। ধর্মচিন্তা-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানে 'মনের মানুষে'র কথা এলেও, প্রকৃতপক্ষে এই সময় তাঁর সংগীত-উৎসধারায় ভগবৎচিন্তা গৌণ হয়ে প্রকৃতি ও মানুষ পেল প্রাধান্য। কেননা, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেই আছেন 'অমিতমানব'।

তাই, রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের ভাবসম্পদ-আলোচনায় ধর্মের পরেই মানব ও প্রকৃতিচিন্তার কথা বলা প্রয়োজন।

---

১. দ্রষ্টব্য: 'গীতবিতান', তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় এবং 'রবীন্দ্রজীবনী', ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৪, 'শেষ কয় মাস', পৃ ২৭১

## প্রেম

সাধারণতঃ কবিরা 'প্রেম' শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে, বৃহৎ এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। ভগবৎপ্রেম, মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম এবং স্বদেশপ্রেম সবই সেই ব্যাপক প্রেমের অন্তর্গত। গানে রবীন্দ্রনাথের ভগবৎপ্রেমের প্রকাশ ও পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা গেছে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মানবিক প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম সংগীতে কি ভাবে রূপলাভ করেছে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিক্‌নির্দেশ করা গেল।

### ১. মানবপ্রেম

গীতবিতানের একটি বৃহৎ অংশের নাম 'প্রেম'। এই প্রেম ভগবৎপ্রেম ( 'পূজা' ) বা প্রকৃতিপ্রেম ( 'প্রকৃতি' ) নয়। এ মানবিক প্রেম অর্থাৎ নরনারীর প্রেম। পৃথিবীর সকল দেশে সকল কালেই প্রেম সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বস্তু। বাংলা সাহিত্যেও জয়দেব থেকে শুরু করে ভক্তিমূলক কাব্যরচনাধারার পাশে পাশে প্রেমসংগীতের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতকে চিরাচরিত প্রেমগীতির সঙ্গে কখনই এক পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। গানগুলি স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যে একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক।

১

সমগ্র রবীন্দ্রচিন্তার কেন্দ্রে আছে এক গভীর ঐক্যচিন্তা, অখণ্ড বিশ্ববোধ ও অনন্ত আনন্দবোধ থেকে কবির যাবতীয় চিন্তার জন্ম। ধরণীতে যে অনন্ত আনন্দধারা নিরন্তর বইছে, মানবপ্রেম তারই অংশ। নরনারীর ব্যক্তিগত সংরাগের সংকীর্ণ পরিসরে সে প্রেম কখনই সীমায়িত হতে পারে না। বিশ্বপ্রেমের পটভূমিতে তার প্রতিফলন। প্রেমের দায়িত্বও সুগভীর। কেবলমাত্র ক্ষণিক ও বাহ্য সুখদুঃখের খেলা এ নয়। 'প্রেমে'র একটি গানে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। দীর্ঘ হলেও তাই সমগ্র গানটিই উৎকলিত হল।

> "আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
> মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে॥

পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে—
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি॥

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গমপথমাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি॥

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী 'তুমি আছ আমি আছি'॥"

বাংলা সাহিত্যে প্রেমের গানের কোন অভাব নেই। কিন্তু এই জাতীয় প্রেমের গান সত্যিই অ-পূর্ব। প্রেম তো সুখ নয়, প্রেম আনন্দ; সে আনন্দের সঙ্গে দুঃখের কোন বিরোধ নেই। তাই—

"সুখ যারে কয় সকল জনে বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে—
গভীর সুরে 'চাই নে চাই নে' বাজে অবিশ্রাম॥"

—যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা

এক অখণ্ড বিশ্ববোধ এবং আনন্দবোধ থেকে উদ্ভূত বলে কবির ভগবৎপ্রেম, মানবিক প্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম অনেক সময়ই একাকার হয়ে গেছে। বিশেষ করে ভগবৎপ্রেম ও মানবিক প্রেম ( বা নারীপ্রেম ) অনেক ক্ষেত্রেই একীভূত।

"যখন কোনো প্রেম আমাদের সমস্ত আত্মাকে বিচলিত করিয়া তোলে তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার

ধারণ করে, দেশকালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মতো অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।"

—'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য

উদাহরণ দিয়ে এ কথা স্পষ্ট করা যাক্।

রবীন্দ্রনাথ এই জগৎকে সৃষ্টিকর্তার খেলা বা লীলার প্রকাশ বলে মনে করতেন, সে কথা আগে বলেছি ( রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের ভাবসম্পদ : আনন্দ )। তাই 'পূজা'র অনেক গানেই তিনি ব্যক্ত করেছেন ভক্ত ও ভগবানের খেলার সম্পর্ক। 'প্রেম'র একটি গানে বলেছেন—

"আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়—
বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও॥
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ ক'রে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয়॥"

এই যে প্রেম, এ তো পূজা ; নরনারীর ব্যক্তিগত প্রেমের অনেক উর্ধ্বে এর স্থান। এখানে ভক্তির আত্মনিবেদনের সুরই প্রেমের আকৃতিতে ও আবেদনে করুণ মূর্চ্ছনায় বেজে উঠেছে। তেমনই আর একটি গানে আছে—

"তোর দুখের শিখায় জ্বাল্ রে প্রদীপ জ্বাল্ রে
তোর সকল দিয়ে ভরিস পূজার থাল রে।
যেন জীবন মরণ একটি ধারায় তার চরণে আপনা হারায়,
সেই পরশে মোহের বাঁধন রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে॥"

—ওরে, কী শুনেছিস

ব্যক্তিগত মোহ দুঃখের আগুনে পুড়ে তবেই প্রেমের মূল্য লাভ করতে পারে, আর সেই প্রেমই ভগবানের আনন্দরূপ। তখনই জীবনের অমৃতস্পর্শলাভ। এই হল রবীন্দ্রনাথের প্রেম— ভগবৎপূজার সঙ্গে এর ভিন্নতা নির্ণয় করা দুরূহ।

এরই সঙ্গে তুলনা করা যায় 'পূজা' পর্যায়ের একটি গানের।

"হার-মানা হার পরাব তোমার গলে—
দূরে রব কত আপন বলের ছলে॥
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান—
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে॥"

পূর্বোক্ত 'প্রেমে'র গানগুলির সঙ্গে 'পূজা'র এই গানটির ভাবগত পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন।

আবার অন্যত্র দেখি প্রেম ও প্রকৃতি একীভূত। মানবিক প্রেম প্রতিবিম্বিত প্রকৃতিপ্রেমে।

"ভালোবাসি, ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি ॥
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি ॥"

কোন কোন 'প্রেমে'র গান নেহাতই প্রাকৃতিক বর্ণনা ও প্রকৃতির সৌন্দর্যোপলব্ধি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গানটি স্মরণ করা যায়।

প্রেম ক্ষণিক নয়, চিরন্তন, নূতন হয়েও চিরপুরাতন, একক হয়েও বহু। তাই প্রেমের যাদুস্পর্শে মানবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও নবযৌবন লাভ করে।

"এ কী সুধারস আনে
আজি মম মনে প্রাণে ॥
সে যে চিরদিবসেরই, নূতন তাহারে হেরি—
বাতাস সে মুখ ঘেরি মাতে গুঞ্জনগানে ॥
পুরাতন বীণাখানি ফিরে পেল হারা বাণী।
নীলাকাশ শ্যামধরা পরশে তাহারি ভরা—
ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে ॥"

প্রেম সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন মোহ বা কামনা নয়। সবার সঙ্গে মিলেই প্রেমের যথার্থ বিকাশ—'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'।

এই পৃথিবীর ধূলিকণা, তৃণমাটি সবই কবির বড় আপন। তাঁর প্রেমও এদের নিয়েই। ধরণীর সঙ্গে তাঁর এই একাত্মতাবোধ প্রেমের গানেও ব্যক্ত, কারণ এই উপলব্ধি তাঁর অন্তরতম উপলব্ধি।

বৈজ্ঞানিক মত অনুসারে এই প্রাণজগৎ জড়জগৎ থেকেই সৃষ্ট। বিশ্ব-বিবর্তনের ফলে তাই মানুষও মূলতঃ জড়জগতেরই সৃষ্টি। যে চৈতন্য মানুষের প্রধানতম সম্পদ, সে চৈতন্যও জড়জগৎ বা মূকজগতে সুপ্তাকারে ছিল। এই চেতনা রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর ধূলিমাটি সম্পর্কেও সংবেদনশীল করে তুলেছিল। তাই তিনি বলেছেন, 'মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে'।

সেই কারণেই বলতে পারলেন—

'আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়
আছে প্রেম ঘাসে ঘাসে।'

শুধু ধূলিমাটি তৃণপুষ্প নয়, অসীম শূন্যের গ্রহতারকার সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তা। 'প্রবাসী' ('নবজাতক') কবিতায় এই ভাবটিই ব্যক্ত। তাঁর প্রেম বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত। সুতীক্ষ্ণ বাসনার ছুরি দিয়ে বিশ্ববিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা যে প্রেম, সে তো মোহ, তা ব্যর্থ হবেই। 'রাজা ও রানী' নাটকে, 'নিষ্ফল কামনা' ('মানসী') কবিতায় এই জাতীয় মোহের প্রতি কবির বিদ্বেষ ধ্বনিত। আর, তাঁর নিজের প্রেমচিন্তায় তাই স্বভাবতই ভগবৎপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম সবই মিলে গেছে। কারণ এরা সবই পরস্পরসাপেক্ষ, এক অখণ্ড চিন্তা ও উপলব্ধির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। প্রেমসংগীতে এই উপলব্ধিগুলি সুপরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রেমসংগীতে তাঁর প্রেমিকরূপের মধ্যে নারীত্বের আভাস আছে। এ কেবলমাত্র নারীর জবানিতে প্রেমের গান নয়। প্রেমবৈচিত্র্য-উপলব্ধির জন্য এ প্রেমিকসত্তার নারীরূপ-গ্রহণ। চৈতন্যদেবের প্রেমের মধ্যে এই রূপ পাওয়া যায়। এ জাতীয় প্রেমের গান সত্যিই অতুলনীয়।

"সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি॥"

## ২

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ— এ প্রেম বাস্তব প্রেম নয়, অতিমাত্রায় আদর্শায়িত বায়বীয় প্রেম। পার্থিব নরনারীর রক্তমাংসের প্রেম, (যে প্রেম স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের কবিতায় আছে: 'আমি তারে ভালবাসি রক্তমাংসসহ') এ নয়। অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যে যাকে 'Passionate Love' বলে, 'রোমিও জুলিয়েটে' প্রেমের যে মাদকতা ও উন্মাদনা দেখা যায়, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার একান্তই অভাব।

বস্তুতঃ এই অভিযোগ অনেকাংশে সত্য। রবীন্দ্রনাথ কখনই দৈহিক প্রেমকে স্বীকার করেন নি। তাঁর প্রেম শান্ত, ধ্রুব, স্থির — উত্তেজনা বা মাদকতা দ্বারা প্রেমকে তিনি কলঙ্কিত করতে চান নি।

প্রেম রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও ধারণায় এক মহৎ প্রবৃত্তি। জীবের দেহসীমায় আবদ্ধ প্রেম সংকীর্ণ, মলিন, বন্ধন; সে প্রেম বর্জনীয়। নরনারীর বাস্তব প্রেমকে

তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু বাস্তবতার সংকীর্ণ পরিসরেই তাকে আবদ্ধ করে রাখেন নি। যথার্থ প্রেম মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, বিস্তৃত করে। পক্ষান্তরে, বাস্তবের ব্যক্তিগত দেহসীমায় আবদ্ধ প্রেম জীবনের বিস্তারকে ব্যাহত করে, জীবনের গতিকে রোধ করে। তাঁর গান সেই ব্যক্তিগত প্রেম থেকে উত্তীর্ণ হবার গান। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ব্যক্তিপ্রেমের সোপান বেয়ে আদর্শায়িত মহাপ্রেমের পথে যাত্রা করেছেন এবং সেখানেই প্রেম পূজার স্তরে উন্নীত হয়েছে।—

"মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

—'নৈবেদ্য', ৩০, 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'

প্রেমের জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্যই প্রেম। 'শা-জাহান' ( বলাকা : ৭নং ) কবিতায় জীবনের গতিরোধক প্রেমের প্রতি কবির ধিক্কার ধ্বনিত।

"যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।"

কবির চিত্তে প্রেমের স্থান যে কত উচ্চে এবং প্রেম ও জীবনের সম্পর্ক কত সুগভীর ও সুমহৎ, 'মানসী' কাব্যের বহু কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

"তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে—
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা সকলে।…
জীবনের কাজ আছে— প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।"

—'মানসী', সংশয়ের আবেগ

জাগতিক নরনারীর প্রেমই ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে বিশ্বসীমায় উন্নীত হয়। তা যদি না হয়, তবে ব্যক্তিগত বিকৃত প্রেমের বিনাশই কাম্য।

"একেবারে ভুলে যেয়ো, শত গুণে ভালো সেও,
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি।"

—'মানসী', বিচ্ছেদের শান্তি

যথার্থ প্রেম সুখদুঃখের অতীত বস্তু। তাকেই কবি বলেছেন 'ভালবাসার অমৃত'।

"অনাদি বিবহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমাব মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে বহে,
তাই তো আমাব মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমাব সুখ নহে, দুখ নহে।"

—'মানসী', পূর্বকালে

সেই কারণেই 'দিনান্তবেলায়' যে ফসল তিনি সঞ্চয় করলেন প্রেমের ক্ষেত্র থেকে—

'সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা।'

—দিনান্তবেলায়

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে তাঁর প্রেমকে আদর্শায়িত করেছেন। অন্যান্য কবি থেকে তাঁর প্রেমেব আদর্শ ভিন্ন— সেই কারণেই তিনি মহাকবি, বিশ্বকবি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রেম, ভালবাসা, নারীসৌন্দর্য কোনকিছুকেই উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তাকে যখন সাহিত্যে স্থান দিলেন, তখন স্বভাবতই তার ক্ষণিক রূপকে নিত্যতায়, চিরন্তনতায় পরিণত করতে প্রয়াসী হলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'একদা তুমি প্রিয়ে' গানটি স্মরণ করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয়া-বিরহের গভীর দুঃখ, সাহিত্যে চিরন্তন মূর্তি লাভ করেছে গানটিতে। কাল্পনিক শোক দুঃখ বিরহ, মিলন আনন্দ বেদনার সঙ্গে বাস্তব দুঃখ বেদনা আনন্দও স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে দুই-ই তুল্যমূল্য, কারণ দুই-ই বাস্তবোত্তীর্ণ অনির্বচনীয়তা ও চিরন্তনতার অধিকারী। সেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি বিশ্বগত হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে রাবীন্দ্রিক প্রেম পূজার সামিল। সেই কারণেই অনেক সময় 'পূজা' ও 'প্রেমে'র গানের পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। একই গান কখনও ধর্মসংগীত, কখনও প্রেমসংগীত বলে স্বীকৃত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি প্রথমে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের উৎসর্গে সংযোজিত ছিল, পরে তাকে অদলবদল করে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করেন এবং গানটি ব্রহ্মসংগীত হিসাবেই পরিচিত ছিল।[১] কিন্তু বর্তমানে গানটি গীতবিতানের 'প্রেম' পর্যায়ভুক্ত।

প্রেম ও পূজা দুটিই তাঁর কাছে—

"নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা॥"

এই প্রেমভাবনা হয়তো রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরাধিকার। বৈষ্ণব সাধক পার্থিব নরনারীর জবানিতে ভগবৎসাধনাই করেছেন। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে'ই বৈষ্ণবের গান নয়। জাগতিক নারীপ্রেম থেকেই বৈষ্ণব কবি রাধাপ্রেমের উপাদান আহরণ করেছেন, অথচ তাকে দৈহিক জগতের সীমা অতিক্রম করে দেবলোকে নিবেদন করেছেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে Devotion to God আর Human Love— দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। মানবিক প্রেমকে আধ্যাত্মিক রূপদান অথবা আধ্যাত্মিক প্রেমের মানবীকরণ— দুটিই বিশেষভাবে ভারতীয় চিন্তা বিশেষতঃ বৈষ্ণব চিন্তার ফল। এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

—'সোনার তরী', বৈষ্ণবকবিতা

তাই গানে লিখলেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে॥"

'বৈষ্ণব কবির গাথা প্রেম-উপহার' বৈকুণ্ঠের পথ থেকে যে সকল 'সৌন্দর্যের দস্যু'

১. দ্রষ্টব্য: 'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, ১৯৭০, 'আমেদাবাদে', পৃ ৮২

লুণ্ঠন করে নেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় লুণ্ঠনকারী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গতঃ অপর 'দস্যু' মাইকেল মধুসূদনের নামও স্মরণ করা যায়। পরবর্তী 'রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের আঙ্গিকবিচার' অংশে দেখা যাবে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম রবীন্দ্রনাথকে কতখানি প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে, রবীন্দ্রনাথ যতখানি আহরণ করেছেন, ফিরিয়ে দিয়েছেন তার বহুগুণ বেশি। বৈষ্ণবীয় প্রেমধারণার পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি বাঁধা ছকের বাইরে প্রেমের আরও অসংখ্য সূক্ষ্ম, গভীর এবং বহুবিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে। প্রেমের এত বৈচিত্র্য আর কোন কবির গানে আছে বলে মনে হয় না। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

"যখন ভাঙল মিলন-মেলা
ভেবেছিলেম ভুলব না আর চক্ষের জল ফেলা ॥···
দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল—
ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে, কান্না তখন থামে না যে—
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা ॥"

অপর একটি গান—

"তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো ॥
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে—
তবু মনে রেখো ॥
যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে—
তবু মনে রেখো ॥"

এইসব গানের ভাববিশ্লেষণের দুরূহ চেষ্টা দ্বারা রসভোগের ব্যাঘাত না ঘটানোই ভাল। এগুলি বিশেষভাবে উপলব্ধির বিষয়।

এই জাতীয় আর একটি গান—

"মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন তব চরণতলে,
শুভলগন গেল চলে,
প্রেমের অভিষেক কেন হল না তব নয়ন জলে ॥
রসের ধারা নামিল না, বিরহে তাপের দিনে ফুল গেল শুকায়ে—
মালা পরানো হল না তব গলে ॥"

কীর্তনাঙ্গের 'এসো এসো ফিরে এসো' গানটিতে দয়িতের বিচিত্ররূপ এবং প্রেমানুভূতির বৈচিত্র্যের পরিচয় আছে। বৈষ্ণব গীতসাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গানে অন্যান্য মহাজনদের অপেক্ষা বেশি বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাই এঁদের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে যে বিচিত্রতর হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ— তার কোন তুলনা নেই বৈষ্ণব সাহিত্যেও। প্রেমের দ্বন্দ্ব, আশা, নিরাশা, উৎকণ্ঠা, সংকোচ, ভয়, বিরহের মধ্যে মিলন, মিলনের মধ্যে বিরহ—আরও কত যে বিচিত্র অনুভূতি তাঁর গানে প্রকাশ পেয়েছে তা নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। অনেক অনুভূতিকে সংজ্ঞায়িত করাও অসম্ভব। বিশ্বের রসসাহিত্যের দরবারে কবি স্বয়ং বৈষ্ণব পদাবলীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন, আর তাঁর গান বৈষ্ণবপদকেও পশ্চাদ্‌বর্তী করেছে। বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় প্রেমসংগীতের যথার্থ বিকাশ পূর্বেও ঘটেনি—শীঘ্র ঘটবার সম্ভাবনাও কম বলে মনে হয়। প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রেমের বিচিত্র উপলব্ধি ও তার বিকাশ— দুইএ মিলে প্রেমসংগীতকার রবীন্দ্রনাথ বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সমাদৃত হবার যোগ্য। পূজার গানের মত তাঁর প্রেমের গানগুলিও ভারতীয় গীতসাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

## ২. প্রকৃতিপ্রেম

সাহিত্যে যথার্থ প্রকৃতিচেতনা অনাধুনিক নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি ছিল যেন 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। বৈষ্ণব কবির রচনায় প্রকৃতি মানবজীবন ও মানবচিন্তার পটভূমিমাত্র। গোবিন্দদাসের 'শরদ চন্দ পবন মন্দ' কিংবা বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' অথবা 'চল দেখনে যাই ঋতু বসন্ত' প্রভৃতি পদে বহিঃপ্রকৃতি মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতিবিম্বে পর্যবসিত।

রূপবর্ণনায়ও প্রকৃতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিছক প্রকৃতিপ্রেম ও প্রকৃতি-বর্ণনা প্রধানতঃ ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল আধুনিক যুগে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাতেও রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেম অবিদ্যমান। রোমান্টিক প্রকৃতিচেতনা প্রথম পেলাম বিহারীলালের রচনায়, তারই সার্থকতম রূপ রবীন্দ্রনাথে।

## ১

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রেমিক কবি, বিশ্বপ্রেমিক কবি। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম এক বিশেষ রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চিহ্নিত। পূর্বেই বলেছি ( রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের ভাবসম্পদ : মানবপ্রেম ), রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র হল বিশ্বসৃষ্টির মূলে কবির জীবনে এক অখণ্ড ঐক্যানুভূতির পরিচয়। এই ঐক্যের উপলব্ধি তাঁকে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতি সচেতন করে তুলেছিল, কারণ দুই-ই হচ্ছে এক অখণ্ড সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই অখণ্ড সত্তাই কবির বিশ্বদেবতা। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবন সেই বিশ্বদেবতার সঙ্গে একাত্ম বলে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ই কবিচক্ষে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই কারণেই রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহে কখনও মানবপ্রীতি তাকে অধিকতর আকর্ষণ করেছে, কখনও বা প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য তাঁকে সম্মোহিত করেছে, কখনও বিশ্বদেবতা বা অসীমের উপলব্ধিই তাঁর কাব্যের মূল সুর। বস্তুতঃ এর কোনটিই প্রক্ষিপ্ত নয়। উপরন্তু একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে প্রকৃতিচিন্তায় দেখি প্রকৃতির মানবীকরণ, মানবপ্রেমে প্রকৃতির প্রভাব এবং ভগবৎপ্রেমেও মানব-প্রেমের ছায়া। তাই, কোন কোন রবীন্দ্রসংগীতকে নিশ্চিতভাবে কোন বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করতে দ্বিধা হয়।

প্রকৃতির সজীব সত্তারূপকল্পনা এবং বিশ্বদেবতা, মানবজীবন ও প্রকৃতির মধ্যে অচ্ছিন্ন যোগসূত্রের সন্ধানলাভ, রবীন্দ্ররচনায় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার উত্তরাধিকার। জগতের জড় ও চেতনের মধ্যে যে বিশ্বপ্রাণ নিরন্তর স্পন্দিত, ওষধিতে বনস্পতিতে, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে যে পরম প্রাণের স্পর্শ, তাই ভারতবাসীর অধ্যাত্মজীবনের মূল আশ্রয়। প্রাচীন সাধক বলেছেন—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥"

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ২।১৭

আবাল্য উপনিষদের আবহাওয়ায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতীয় চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্যটুকু স্বভাবতঃই অধিকার বিস্তার করেছিল। প্রকৃতির মধ্যে তিনিও বিশ্বদেবতার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।[১]

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতির জড় ও চেতনের সঙ্গে মানবমনের নিবিড় আত্মীয়তার রূপটি পাওয়া যায়। প্রকৃতি কোন রূপকের সাহায্যে নয়, প্রকৃতি তার প্রকৃত রূপেই অনেক কাব্য বা নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের সমালোচনায় ( 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ) তাই বলেছেন—

> "এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।…বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া, পর করিয়া ভাবে—যেখানে মানুষ আপনার চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।"

শুধু অভিজ্ঞানশকুন্তল নয়, এই জাতীয় প্রকৃতিচেতনা বহু সংস্কৃত কাব্য-নাটকেই দেখা যায়। রামায়ণে, কালিদাসের মেঘদূত ও কুমারসম্ভব কাব্যে, ভবভূতির উত্তররামচরিতে—প্রকৃতি, মানবজীবনের আনন্দ-বেদনার সহচর। সেখানে প্রকৃতি স্ব-রূপেই কাব্য বা নাটকের অন্যতম প্রধান পাত্র।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ প্রকৃতপ্রেমিক কবি। শিশুকাল থেকেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার 'একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ' ছিল।

> "বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বারজালনার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত।…সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"
>
> —'জীবনস্মৃতি', ঘর ও বাহির

একদিকে এই যেমন বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি সহজাত প্রবল আকর্ষণ, তেমনই অন্যদিকে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে অল্পবয়স থেকেই তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যের ভাব ও রসগ্রহণে দীক্ষালাভ

---

১. দ্রষ্টব্য : অমিয়কুমার সেন. 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬১

করেছিলেন। প্রকৃতিচিন্তা ও প্রকৃতিপ্রেম এই উভয়বিধ সাহিত্যেরই প্রাণস্বরূপ এবং এদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর মনের মাটি কৈশোরেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

তবে, সংস্কৃত সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণনা বা উপাদান আহরণ করলেও, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম একান্তভাবেই তাঁর নিজের। এই স্বকীয়তা কোন আদর্শেই খণ্ডিত হবার নয়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতি ও মানুষ স্বরূপতঃ অভিন্ন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র সত্তারূপে উপভোগ করা হয়েছে। আর, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভেদকেও উপেক্ষা করেন নি, আবার তাদের অভিন্নতাও তাঁর কাব্যে স্বীকৃত।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় ও গভীর একাত্মতাবোধ। এই আত্মবিলীনতার বোধ ভারতীয় বা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, এ কবির একান্ত নিজস্ব।

"জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর-এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি, তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরেব মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে। তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি—

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব আমি অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

তখনি এ কথা বলিয়াছি—

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,

তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই—

তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু।"

—'আত্মপরিচয়', প্রথম প্রবন্ধ

পূর্বেই বলেছি তাঁর বিশ্বপ্রেম ভগবৎপ্রেমেরই অঙ্গ। এই জগতের প্রতি বিমুখ হয়ে তাঁর ভগবৎপূজা নয়। পূর্বোক্ত গ্রন্থেই বলেছেন—

"পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তি রসের আস্বাদন।—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। ... ...
... ... ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবার জন্য তাঁরই উক্তি উৎকলিত করা গেল, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও। বিশ্বপ্রকৃতি সেই অসীম সত্তার প্রকাশ বলেই এর মাঝে স্থান পেয়ে কবি বিস্মিত, আনন্দিত। এর প্রেমেই তাঁর পূজা।

'অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়' মুক্তিরস আস্বাদন করাই শুধু তার কাম্য নয়, এই ধরণীর সুখদুঃখ হাসিকান্নাভরা মাতৃরূপটিকে তিনি ভালবাসেন। 'ভালবেসেছিনু এই ধরণীরে' এটাই তাঁর কথা— তা কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে নয়।

"মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি — …
অয়ি দীনহীনা,
অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্যভূমি। আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।"

—'চিত্রা', স্বর্গ হইতে বিদায়

গানেও তিনি নিছক মর্ত্যপ্রেমের কথা বলেছেন। 'আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গনে'র নিমন্ত্রণ ত্যাগ করে তিনি 'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে' চলে এলেন মাটির পৃথিবীতেই। কারণ—

"হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন,
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন—
আমার লাগল রে মন লাগল রে,
তাই এইখানেতেই দিন কাটে এই খেলার ছলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে ॥"

—আজ তারায় তারায়

এই মর্ত্যপ্রীতির কথা ছিন্নপত্রাবলীতে পুনঃপুনঃ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমের পরিচয়সূচক আর একটি সংগীতাংশ উৎকলন করা গেল।

"আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান।"

শুধু পৃথিবীকে ভালবাসাই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড়, গভীর একাত্মকতা গানে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাছে প্রকৃতি কেবল আনন্দ-বেদনার প্রেরণা নন, তিনি কবিসত্তার অবিচ্ছেন্ত অংশ। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের প্রতিবেদন আসে কবির মনে।

"আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥"

কিংবা

"আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ॥"

সেইজন্যই—

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।…
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।"

'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তিনি প্রকৃতিকে মনোরম করে তোলেন।

"হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরত-মেঘে।"

কিংবা—

"শরত-আলোর কমলবনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে ॥"

প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটে কবির মনে।

"আমার বনে বনে ধরল মুকুল,
বহে মনে মনে দক্ষিণ হাওয়া
মৌমাছিদের ডানায় ডানায়
যেন উড়ে মোর উৎসুক চাওয়া ॥"

প্রকৃতির চিত্ররূপ বা দৃশ্যরূপের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ধ্বনিরূপও তাঁর মনকে আন্দোলিত করে। 'বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা' কিংবা 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই' প্রভৃতি পঙ্ক্তিতে তার পরিচয়।

পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর স্বকীয়তার দ্বারা বিশিষ্ট। তাঁব প্রেমানুভূতি ও ভগবৎভক্তি প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে জড়িত। কাব্যে তাঁর রোমান্টিক কবিমন যখন মানসী প্রিয়ার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যধারণার সঙ্গে মিলেই প্রেমবোধ নিবিড় হয়েছিল। আবার ভগবৎপ্রেমের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিচিত্র রূপানুবর্তনের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি সার্থক হয়েছে। তা ছাড়া কেবলমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য, ধ্বনি ও ছন্দের উপভোগেও তিনি মগ্ন হয়েছেন। এই বিশিষ্টতা সংগীতে সুপ্রকাশিত। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাপক ও গভীর প্রকৃতিপ্রেমের তুলনা আব কোন কবির রচনায় মেলে কিনা জানি না।

ববীন্দ্রচিন্তার ক্রমবিবর্তনে, 'নরদেবতা' যখন 'বিশ্বদেবতা'র স্থান গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর সংগীতধারায় ভগবৎপ্রেমের অপেক্ষা প্রকৃতিপ্রেমের স্রোতই প্রবলতর হয়ে উঠল। এই প্রকৃতিসংগীতগুলি বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

২

ঋতুবৈচিত্র্য প্রকৃতির রূপে বর্ষে বর্ষে যে পরিবর্তন বয়ে আনে, তা পৃথিবীর সকল কবিকেই মুগ্ধ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির গানে ছয়টি ঋতুর চিত্র ও বর্ণনা দিয়ে যে অনবদ্য ঋতুচক্র সৃষ্টি করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও তদনুরূপ কিছু আছে কি না বলা কঠিন। প্রকৃতিকে কত ভাবে, কত রূপে যে কবি দেখেছেন, অনুভব করেছেন এবং আমাদের অনুভব করতে পথ দেখিয়েছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ এক অপূর্ব 'ঋতু-সংহার'। ঋতুর গানে ঋতুগুলিই প্রধান, কিন্তু মানুষের আনন্দবেদনার মিশ্রণে সেগুলি এক বিশেষ ভাবরূপ লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, ঋতুগুলি মানবত্ব লাভ করেছে গানে। এই মানবতা কেবলমাত্র বাইরের রূপে নয়, অন্তরের মাধুর্যে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট পাঠকমনে ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতগুলির অবিচ্ছেদ্য যোগ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রসোপলব্ধিতে গানগুলির বিশিষ্টতা এখানেই। অতঃপর রবীন্দ্রসংগীতে ঋতুচক্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

গ্রীষ্ম : বৈশাখের রূপ সাধারণতঃ কবিচক্ষে তপঃকৃশ শুচিস্নিগ্ধ সন্ন্যাসীর রূপ। তার 'তাপসনিশ্বাসবায়ে' পুঞ্জীভূত গ্লানি ও আবর্জনা দূর হয়ে যায়।

"এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥"

কখনও বৈশাখকে কবি 'মৌনী তাপস' বলে সম্বোধন করেছেন। এই কারণেই হয়তো বৈশাখ অনেক সময় আভাসে মহাদেবের রূপলাভ করেছে।

"তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে।"

—হে তাপস, তব

বর্ষা : বর্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম ঋতু। বর্ষাকে তিনি বিভিন্ন রূপে কল্পনা করেছেন। কখনও সে 'নবযৌবনা ভুবনভরসা', কখনও 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়' তার 'গম্ভীর' রূপ। কখনও 'বাউলের' মত, কখনও 'সাওতালী ছেলে'র মত, কখনও 'পরবাসী' সাপুড়িয়ার মত সে আসে। ধরণীর উৎসবসভায় কখনও সে বীণাপাণি। আবার কোথাও 'বজ্রমাণিকের মালা' কণ্ঠে ধারণ করে তার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। শুধু রূপকল্পনা নয়, বর্ষার গানকে অবলম্বন করে কবির আনন্দবেদনাও বহুভাবে প্রকাশিত। কখনও—

'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে',

আবার কখনও,

"বনের ছায়ায় জল-ছলছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।"

—আমার দিন ফুরালো

বর্ষাঋতু কবিমনকে প্রাচীন ভারতে অভিসারে পাঠায়। সে অভিসার হয় কালিদাসের কালে, নয়তো বৈষ্ণব পদের রাজ্যে।

"বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে॥···
সে দিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামলশৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়ে ছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে॥"

কিংবা—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার ॥…
সুদূর কোন্ নদীর পারে গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার ॥"

উপরি-লিখিত গানদুটির প্রথমটিতে কালিদাসের যুগকে স্পষ্টতঃই স্মরণ করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে বৈষ্ণব নিশাভিসারের আভাস।

একটি গানে বর্ষাকাল স্নিগ্ধ নীপবন ও উন্মত্ত তরঙ্গলীলায় উচ্ছল তটিনীর পটভূমিতে নারীরূপ লাভ করেছে। সে গানের চিত্রময়তা তুলনারহিত।

"মধু -গন্ধে ভরা মৃদু -স্নিগ্ধছায়া নীপ -কুঞ্জতলে
শ্যাম -কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে ॥
ফিরে রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা -সিক্ত বায়ে,
মেঘ -মুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি -প্রান্তে জ্বলে ॥
পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয়মদিরা উন্ মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীরা,
কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গদোলে কল-মন্দ্ররোলে।
এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে।"

বর্ষাঋতুকে অবলম্বন করে দুটি 'নাট্যগীতি' কবি রচনা করেন— 'শেষবর্ষণ' এবং 'শ্রাবণগাথা'।

শরৎ : শরতের রূপ কবিচক্ষে নারীর রূপ।

"শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি ॥
মানিক-গাঁথা ওই-যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি ॥"

—শরৎ, তোমার অরুণ আলোর

শরৎ পূজার ঋতু, ছুটির ঋতু। রবীন্দ্রনাথ নিজে পূজা-উৎসব না মানলেও জাতীয় মনের এই অনুভূতিকে কখনই অস্বীকার করেন নি।

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।"

তাঁর গানে, কবিতায় পূজার কথা বহুবার বলেছেন—

"যে দিকে তাকাই—সোনার আলোয়
দেখি-যে ছুটির ছবি,
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি।"

—'সহজ পাঠ', ১ম ভাগ, 'এসেচে শরৎ'

সেইজন্যই শরতের নারীমূর্তি কোথাও কোথাও দুর্গার মূর্তি। এ প্রসঙ্গে 'তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে' গানটি স্মরণ করা যায়। সেখানে শরতের মূর্তি দুর্গার অসুরদলনী সংহারমূর্তি, এবং সেখানেও পূজার কথা আছে।

"তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ওই চরণমূলে॥
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে॥···
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল অশ্রু-সাগর-কূলে॥

শরৎকে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যে, পূর্ণতায়, স্নিগ্ধতায় মনোরম করে গড়েছেন। তাঁর রোমান্টিক মনের আকৃতি এই কালে যেন উদ্বেল হয়ে উঠত।

'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।'

তাই তার প্রতি কবির অনুনয়—

'তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না।'

শুধু মানবরূপ নয়, শরতের বাণীরূপও কবিচিত্তে ধরা পড়েছে।

"তোমার নাম জানি নে, সুর জানি।
তুমি শরৎ-প্রাতের আলোর বাণী।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যের নাম 'বনবাণী'। আবার দেখি 'শারদোৎসব' নাটকে শরৎকে কবি নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর রূপ দান করেছেন। সেখানে শরতের সৌন্দর্য ঋণশোধের কঠিন সাধনার সঙ্গে যুক্ত।

হেমন্ত: হেমন্তকে কবি বলেছেন 'হেমন্তলক্ষ্মী'। হেমন্তের মধ্যে দানরিক্ত গোপনতার আনন্দ ও সৌন্দর্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

"ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা ॥"

—হায় হেমন্তলক্ষ্মী

'ভূষণবিহীন' হেমন্তের আপাতরিক্ত পরিপূর্ণতা ও প্রসন্নতা কবিকে মুগ্ধ করে, শ্রদ্ধান্বিত করে।

"নমো, নমো, নমো।
তুমি ক্ষুধার্তজনশরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগধন্য করো অন্তর মম ॥"

অনেকক্ষেত্রে শরৎ ও হেমন্ত এক হয়ে গেছে। বিশেষতঃ শরৎ-প্রকৃতির বর্ণনায় অনেক সময় হেমন্ত-প্রকৃতির রূপই পরিস্ফুট।

শীত : হেমন্তের রিক্ততা পূর্ণতর হয় শীতের শুষ্ক, কঠিন, নিঃস্ব রূপের মধ্যে। তাই কখনও কখনও শীতকেও রবীন্দ্রনাথ 'সন্ন্যাসী' বলেছেন, এবং সেই কারণেই 'রুদ্র'ও বলেছেন।

"হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য।...
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি।
রুদ্র, এবারে বরবেশে তারে করো গো ধন্য—হও প্রসন্ন ॥"

কিংবা,

"উত্তরবায় জানায় শাসন, পাতল তপের শুষ্ক আসন,
সাজ-খসাবার এই লীলা কার অট্টরোলে ॥"

—শীতের বনে

শীতের আনন্দ 'সব খোয়াবার' আনন্দ। সাধারণতঃ শীতের শূন্যতা, রিক্ততাকেই কবি চিত্রিত করেছেন।

"শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই ফুরোল শীতের বনে
এলে যে—
আমার শীতের বনে এলে যে সেই শূন্যক্ষণে ॥"

কিন্তু তার মধ্যেও আছে 'শূন্য করে ভরে দেওয়া' যার খেলা, তার জন্য প্রতীক্ষা। একটি গানে শীতের মধ্যে পূর্ণতার ছবিও কবি দেখেছেন। শীতের

ফসল কাটার পালা, তার 'আলোর হাসি', 'হাওয়ার নেশা' কবির মনে মাতন জাগায়।

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়॥...
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে—
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে, মরি হায় হায় হায়॥"

গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীতকে অবলম্বন করে কোন পৃথক নাটক বা নাট্যগীতি রচিত হয় নি। তবে 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নামক গীতিনাট্যে সব ঋতুরই পৃথক পৃথক ভূমিকা আছে।

বসন্ত : রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিসংগীতে বর্ষার পরেই বসন্তের প্রাধান্য। বসন্ত ঋতুরাজ, সে চিরযৌবনের সহচর। তাকে দেখে—

"ভাঙল হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাতল কেন পূর্ণিমার ওই চাঁদ॥"

অথবা

"কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে॥"

—আন্ গো তোরা

বসন্তকালের সঙ্গে মানবিক প্রেমের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কবি তাঁর প্রিয়ামূর্তিকে 'ফাল্গুনের আলোতে' বসিয়েই নিরীক্ষণ করেছেন। তাই মনে হয়—'ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে'। বসন্তকালেই অনুভব করেন,

"অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে কে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে॥"

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির 'একাত্মকতা'বোধ বসন্তের একটি গানে আভাসিত।

"এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে॥

অশোকবনে আমার হিয়া নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন যৌবনেরই কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥"

যৌবনের প্রগল্‌ভতায়, ফুল ফোটানোর ক্ষ্যাপামিতে, বেহিসাবী সৃষ্টি এবং খরচের আনন্দে বসন্ত নবীন যৌবন, নূতন প্রাণেরই চর। কবির 'নবীন প্রাণের বসন্ত' ক্ষয়হীন চিরযৌবনের গানে মুখর। বসন্তের গানে মিলনের আনন্দ, পূর্ণতার আনন্দ। কিন্তু এখানেই তার শেষ পরিচয় নয়। কবি মানবমনের আনন্দের সঙ্গে বেদনার ছায়াও আরোপ করলেন বসন্তঋতুতে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানুষের মনে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া বা মানুষের অনুভূতির আলোতে প্রকৃতির রূপদর্শন। সেই কারণে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের ব্যর্থ প্রেমিকা চিত্রাঙ্গদার হৃদয়বেদনায় নিষিক্ত গান—

"রোদনভরা এ বসন্ত, সখী কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে ॥
কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা কার পথ চেয়ে জাগে ॥"

এই বিরহবেদনার পথ বেয়েই আর একটি গান মনে পড়ে—

"বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে ॥
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা ॥"

বসন্ত কবির মনে উজ্জীবনের ঋতু। শীতে যে রিক্ততা, দারিদ্র্য, বৈরাগ্য—বসন্তে তার মধ্যে ঘটে জীবনের সঞ্চার, তাই বসন্তের মধ্যে আছে প্রাণচাঞ্চল্য। 'বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনই নিছক আনন্দ, সৌন্দর্য বা সুখের পক্ষপাতী নন। তিনি সর্বত্রই দেখেছেন পূর্ণতার মধ্যে রিক্ততা, আনন্দের মধ্যে বেদনা, সুখের মধ্যে দুঃখ। বসন্তঋতুও তাঁর কাছে কেবল পূর্ণতা, আনন্দ বা সম্ভোগের ঋতু নয়। মানবমনে যেমন বসন্তকালে প্রেমমিলনের আনন্দের সঙ্গে বিরহবেদনাও দেখা দেয়, তেমনই বসন্তের পরিপূর্ণ ঋতুপ্রকৃতির মধ্যেও কবি শূন্যতার বেদনাকে অনুভব করেছেন।

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুকনো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥

যে ঢেউ উঠে তারি সুরে বাজে কি গান সাগর জুড়ে।
যে ঢেউ পড়ে তাহারও সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।"

দখিন হাওয়ায় 'নূতন-পাতার-পুলক-ছাওয়া পরশখানি' যেমন পেতে চান, তেমনই 'ফাগুনের শুরু হতেই' যে শুকনো পাতারা ঝরে পড়ে, তাদের প্রতি সমবেদনায় তাঁর মন ভরে ওঠে। কখনও বসন্ত আসে—'শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে।' আবার কোথাও তার বৈরাগী রূপ—

"শুক্‌নো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে॥
ঘর-ছাড়া ওই কে বৈরাগী জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে॥"

তাই বলেন 'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে'। 'ফাল্গুনী' নাটকের ভাববিশ্লেষণ করে কবি লিখেছেন—

"বসন্তের কাঁচ পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুব মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে।···পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে— যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না···।"

—আত্মপরিচয়, তৃতীয় প্রবন্ধ

গানেও এই অনুভূতিরই পুনঃপ্রকাশ।

"ছদ্মবেশে কেন খেলো, জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো—
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে॥"

—শুক্‌নো পাতা

বসন্তঋতু অবলম্বনে 'বসন্ত' ও 'নবীন'—এই দুটি নাট্যগীতি ও সংগীতবহুল 'ফাল্গুনী' নাটকটি রচিত।

রবীন্দ্রসংগীতের ঋতুচক্র-পরিক্রমায় দেখা যায়, প্রকৃতি কত বিচিত্র রূপে কবির কাছে ধরা দিয়েছে এবং কবিরও কত বিভিন্ন চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে প্রকৃতির পটে। তদুপরি প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির মনে অসংখ্য বিচিত্র ভাবনার উদ্রেকও করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ষার কয়েকটি গান স্মরণ করা যায়। বর্ষায় সাধারণতঃ কবিদের মনে বিরহবেদনার স্মৃতি ঘনিয়ে আসে, বোধহয় তা বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব

পদাবলীর প্রভাব। কিন্তু বিরহের মধ্যেও যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি আছে তা ধরা পড়েছে কেবলমাত্র রবীন্দ্রসংগীতে। 'আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি' গানটিতে যে 'দেখার বাহিরে' চলে গেছে তারই উদ্দেশে মনের সমস্ত ব্যাকুল বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। তার 'কেশরাশি'র আভাস আছে পুব-হাওয়াতে, তার 'বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া' মিশে গেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে, বেদনা জড়িয়ে গেছে তৃণের কম্পনে। বিরহের এ এক অপূর্ব অনুভূতি। 'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঝে' গানে 'দূরের মানুষ' কাছে এলেও তার 'অজানা জনের সাজে' মিলন সম্পূর্ণ হয় না। 'বিরহব্যথা' ও 'গোপনমিলনে'র অমৃত যে কেমন করে মিশে যায় তা ব্যাখ্যাগম্য নয়। আবার, 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে' গানটিতে স্বপ্নের মধ্যে যে মিলন সাধিত হল, তাকে কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

এই জাতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির যে কত অতুল্য প্রকাশ আছে গানে— তা বলে নিঃশেষ করা যায় না। রবীন্দ্রসংগীতসম্ভারে অনুভূতি-বৈচিত্র্যের দিক্-নির্দেশ করবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল মাত্র। অতিরিক্ত রসবিশ্লেষণে সহৃদয় পাঠকের রসোপলব্ধিরই ব্যাঘাত ঘটে, তাই অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকাই সমীচীন। গানগুলিতে কথা ও সুরের অনুরণনে আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতেও 'একটুকুতেই কাঁপন ধরে'— তা ব্যাখ্যার বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয়। রসসাগরের গভীরে তার স্থান।

প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ঋতুবর্ণনায় কবি অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো বাস্তবাতিশায়ী উক্তি করেছেন। গ্রীষ্মের মধ্যে কেবল শুষ্ক কঠোর রূপই দেখেছেন, গ্রীষ্মকালের পুষ্পসম্ভার তাঁর গানে রূপলাভ করে নি। শীতের সন্ন্যাসী ও বৈরাগী ভাবই তাঁর কাছে প্রকট। অথচ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতের রূপ খুবই মনোরম। শীতের পুষ্পসমারোহ, ঝক্‌ঝকে সোনালী রোদ গানে যোগ্য সমাদরলাভে বঞ্চিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, শরতের রূপবর্ণনায় কবি অনেক সময় অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত। শরতের সঙ্গে হেমন্তকে কখনও মিলিয়ে দিয়েছেন, এক জায়গায় শরতে কোকিলের গান শুনেছেন ('ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল, তোমার কাননসভাতে')। অর্থাৎ কবির প্রকৃতিবর্ণনা সর্বদা বাস্তবানুগ নয়।

বস্তুতঃ কাব্য বাস্তবের প্রতিবিম্ব নয়; বাস্তবের সঙ্গে কবিচিত্তের মাধুর্য মিশেই কাব্যের সৃষ্টি—'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। কাব্য যদি কেবলমাত্র

বাস্তবেরই অনুসরণ হত, তাহলে তাকে কাব্য আখ্যা দেওয়া যেত না। সেই কারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনা দেন নি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিমনে যে ভাবরূপ সৃষ্টি করে, তারই ধ্যাননিঃসৃত বাণীমূর্তি প্রকাশ পেয়েছে গানে। তা ছাড়া প্রকৃতিসংগীতে শুধু বর্ণনা নয়, প্রাকৃতিক পটভূমিতে মানবমনের অনুভূতিকেও বিধৃত করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতি বাস্তবের অনুসৃতি নয়, প্রকৃতি রবীন্দ্রায়িত। আর, গানগুলি বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্ররূপ এবং বিচিত্রতর রবীন্দ্রচিন্তার সংমিশ্রণে যে নিত্যনব তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে, তা যথার্থই অভাবিতপূর্ব। এগুলির কাব্যমূল্যও অসাধারণ।

প্রকৃতপক্ষে, এই গানগুলি আমাদের উপরি-পাওনা। রবীন্দ্রনাথ রূপে, সৌন্দর্যে, ভূষণে প্রকৃতিকে যেভাবে সাজিয়েছেন, বাহ্যপ্রকৃতির যে রূপ-শব্দ-গন্ধময়ী সত্তাকে আমাদের কাছে সজীব করে তুলেছেন, তা আমাদের পক্ষে ছিল দুর্লভ। তাঁর প্রকৃতি কবিহৃদয়-রসে রঞ্জিত, তার সঙ্গে বাস্তবের হুবহু মিল না থাকতে পারে কিন্তু সংগীতরসিক পাঠকের পক্ষে এই লাভ অভাবনীয়। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় প্রকৃতিচেতনা, প্রকৃতিপ্রেম ও প্রকৃতিবর্ণনা পূর্বে তো ছিলই না, ভবিষ্যতেও দেখা দেবার আশু সম্ভাবনা কম। আর, অনুভূতির গাঢ়তা ও সংখ্যার অজস্রতায়ও এই প্রকৃতিসংগীতগুলির কোন তুলনা আছে কি না জানি না।

## ৩. স্বদেশপ্রেম

স্বদেশপ্রেম, অর্থাৎ স্বদেশের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগেই দেখা দিয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে তো নয়ই, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও স্বদেশপ্রেম ছিল না। প্রধানতঃ আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবেই, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম দেখা দেয় এবং সেই দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটেছিল রবীন্দ্র-পূর্ব যুগেই।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ স্বদেশপ্রেমের প্রথম প্রকাশ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায়। স্বদেশ এবং মাতৃভাষার কথা তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে।

"জান নাকি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে ॥···

প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥"

—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী,' স্বদেশ

'মাতৃসম মাতৃভাষা', 'শিবধাম স্বদেশ তোমার', 'তোমার জননী ক্ষিতি, জনকের জননী তোমার' ইত্যাদি বহু উক্তি তাঁর বিশুদ্ধ ও গভীর দেশপ্রীতির পরিচায়ক। ঈশ্বরগুপ্তের পরে, দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। আর, মধুসূদনের প্রথম রচনা 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র (১৮৫৯) সূচনাতেই আছে স্বদেশচিন্তার প্রকাশ।

"শুন গো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর
হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।"

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অনেক কবিতাতেই মধুসূদনের দেশপ্রেম অকুণ্ঠরূপে ব্যক্ত হয়েছে। মাতৃভাষাকে তিনি বলেছেন 'মাতৃভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে'। তাঁর শেষ কবিতাও দেশপ্রীতি-সূচক।

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।"

—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', সমাপ্তে

সে যুগে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতসঙ্গীত', 'ভারতবিলাপ' প্রভৃতি বহু দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছিলেন। 'ভারতসঙ্গীত' এক সময় মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

"এখন(ও) জাগিয়া ওঠ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকর সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে॥

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা ॥"

দেশসেবায় অস্ত্রধারণের কথাও তিনি বলেছেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যেও ( ১৮৭৫ ) দেখি দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রকাশ।

এই ভাবে, রবীন্দ্র-পূর্ব যুগেই বাংলা দেশে স্বদেশপ্রেমের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। সংগীতেও স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ দেখা দেয় এই যুগেই। হিন্দুমেলায় গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' সম্ভবতঃ প্রথম স্বদেশী সংগীত। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত মনোমোহন বসু প্রমুখ হিন্দুমেলার অন্যান্য সদস্যরাও স্বদেশী গান রচনা করতেন। হিন্দুমেলার বাইরেও স্বদেশী গান রচনার প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, স্বদেশী গানগুলিকে সংকলিত করে 'জাতীয় সংগীত' নাম দিয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। এর থেকেই তৎকালে স্বদেশী সংগীত-রচনার বহুল প্রচলন এবং সেগুলির জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে দেশের স্বাদেশিক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশপ্রেম-উদ্‌বোধনের আনুকূল্য করেছিল। 'জাতীয় সংগীত' দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের চারটি স্বদেশী গান সংকলিত হয়।[১] অর্থাৎ ১৮৭৮ সালেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সংগীতকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেবার পূর্বে রবীন্দ্রজীবনের স্বাদেশিক পটভূমি, রবীন্দ্রমানসে তার প্রতিফলন এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

## ১

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

"I was born in 1861 : that is not an important date of history, but it belongs to a great epoch in Bengal, when the currents of three movements had met in the life of our country. One of these, the religious, was introduced by a very great-hearted man of gigantic intelligence, Raja

১. দ্রষ্টব্য : অবতারণা, রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিবর্তন ও পর্ববিভাগ

**Rammohan Roy. ...There was a sceond movement equally important. Bankim Chandra Chatterjee was...the first pioneer in the literary revolution which happened in Bengal about that time. ...There was yet another movement started about this time called the National.**

—'The Religion of an Artist'

এই তিন বিপ্লবধারাকে ঠাকুরবাড়ি সাদরে বরণ করেছিলেন। 'বাড়ির আবহাওয়া' ( 'জীবনস্মৃতি' ) বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।"

শুধু পরিবারের মধ্যেই জাতীয়তার আদর্শ জেগে ওঠে নি, সেই আদর্শকে সমস্ত বাঙালির মনে জাগিয়ে তোলাব জন্যও ঠাকুরবাড়ি সচেষ্ট ছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তেই ( 'স্বাদেশিকতা' ) আছে—

"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। ...এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"

হিন্দুমেলার ( ১৮৬৭ ) প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ঐক্যসাধন এবং স্বাবলম্বন বৃত্তির দ্বারা আত্মশক্তির উদ্‌বোধন। এই দুটি ছাড়া সামগ্রিক স্বদেশবোধের উন্মেষ অসম্ভব। ঠাকুরপরিবার ব্যতীত রাজনারায়ণ বসু, শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন বসু প্রমুখ তৎকালীন মনস্বী ব্যক্তিরা এই মেলার সদস্য ছিলেন। এঁরা বিশ্বাস করতেন দেশকে গড়ে তুলতে হলে দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে। কারণ—

"দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।"

—'আত্মপরিচয়', পঞ্চম প্রবন্ধ

সেই জন্যই দেশের মানুষকে সংগঠিত করবার ব্রত ছিল হিন্দুমেলার। রবীন্দ্র-নাথের মনে হিন্দুমেলার প্রভাব চিরস্থায়ী হয়েছিল, তাই পরবর্তী কালে তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক মেলাকেও স্বাদেশিক রূপ দিতে

চেষ্টিত হয়েছিলেন। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে ('আত্মশক্তি ও সমূহ') মেলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।··· প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ···তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।"

হিন্দুমেলা ছাড়াও—

"জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা।···সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল।···দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে···।"

—'জীবনস্মৃতি', স্বাদেশিকতা

এই 'সঞ্জীবনী সভা' সম্ভবতঃ ১৮৭৪/৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই সভার সভ্য ছিলেন এবং তাঁর মনে এই সভাব প্রভাবও ছিল সুদূরপ্রসারী। চোদ্দবছর বয়সে, হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে (১৮৭৫) তিনি 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতা আবৃত্তি[১] করেন।

এই কবিতায় শ্রীহীন মৃতকল্প ভারতের জন্য কবির গভীর আক্ষেপ ব্যক্ত হয়েছে।—

"ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন,
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি।"

সঞ্জীবনী সভায় মড়ার খুলির কোটরে মোমবাতি জ্বালিয়ে 'মৃতভারতে প্রাণসঞ্চার' ও তার 'জ্ঞানচক্ষু' উন্মীলনের যে সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল উপরি-উদ্ধৃত

---

১. সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে কবিতাটি পাঠ করেন। কিন্তু ১৮৭৫ সালের ১৫ই ফেব্রুআরি তারিখের Indian Daily News লিখেছেন—'Baboo Rabindranth Tagore...had composed a Bengali poem on Bharut (India), which he delivered from memory.' দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়

কবিতাংশতে হয়তো তারই আভাস। 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ' গানটিতে কবি লিখেছেন—

"যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল তোমারি কার্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে॥
যদিও, হে দেবী, শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না
তবু, ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে—
নিভাতে তোমার যাতনা।"

সঞ্জীবনী সভার অনুষ্ঠানে মড়ার মাথার খুলির সঙ্গে, ঋক্‌বেদের পুঁথি এবং খোলা তলোয়ার থাকত। এইসব প্রতীক সামনে নিয়ে সভ্যরা 'ভারত উদ্ধারের দীক্ষা' লাভ করতেন। উদ্‌ধৃত গীতাংশে সম্ভবতঃ সঞ্জীবনী সভার শপথগ্রহণ ও দীক্ষাগ্রহণের আভাসই পাওয়া যায় এবং হয়তো এই সংগীতটিই সঞ্জীবনী সভার দীক্ষাসংগীত ছিল।[১] এই গানটির কথা পরেও রবীন্দ্রনাথের মনে এসেছে।

"স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে,
'এই লহ, মাতঃ, এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারি তরে'।"

—'মানসী', পরিত্যক্ত

এই সংকল্প রবীন্দ্রনাথ আজীবন রক্ষা করেছিলেন।

সঞ্জীবনী সভা থেকেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ দেশোদ্ধারে ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ক্ষাত্রশক্তির পিছনে ব্রাহ্মণ্যশক্তি, দেহবলের পিছনে চরিত্রবল না থাকলে, তা পশুশক্তি—ফলে তার ব্যর্থতা অনিবার্য। এ কথা সঞ্জীবনী সভার সভ্যরা জানতেন। সেই কারণেই বেদের পুঁথি ও খোলা তলোয়ার থাকত পাশাপাশি। আর, তারই প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য রচনায় ক্ষাত্রশক্তি ও চারিত্রশক্তির একত্র চর্চার কথা বলেছেন বারংবার।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বালককালের অনেক প্রভাব প্রত্যক্ষতঃ না হলেও পরোক্ষভাবে জীবনপথের সঙ্গী হয়ে থাকে। সঞ্জীবনী সভাও যে তাঁর মনে বহুব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার একটি পরিচয় দেওয়া যাক্।

দেশসেবায় প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম এবং অহিংস অসহযোগ সংগ্রাম অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তি এবং ব্রাহ্মণ্যশক্তি — দুটিই সমান প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ এ কথা

১. দ্রষ্টব্য : প্রবোধচন্দ্র সেন. 'রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতবর্ষ', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৪

কবি অনুভব করতেন। ১৩১২ সালের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় 'এখন আর দেরি নয়' গানটি প্রকাশিত হয় 'পূজার লগ্ন' নামে। সেখানে তিনটি পঙ্‌ক্তি ছিল—

"আন্ আপনার থালা ভরে
আন্ আরতির প্রদীপ জ্বেলে
আন্‌রে বলির খড়্গ।"

অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) অস্ত্রসংগ্রামের কথা তাঁর মনে এসেছিল। এরই অনুষঙ্গে 'আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে' ইত্যাদি কথা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই গানটি তখন কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। দীর্ঘকাল পরে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের (১৩৩৯ শ্রাবণ) পরিশিষ্টে গানটি সংযুক্ত হয়। কিন্তু তখন পূর্বোক্ত তিনটি পঙ্‌ক্তিকে পরিবতন করবার প্রয়োজন কবি অনুভব করেন এবং সেই স্থলে লেখেন—

"এখন যার যা কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো॥"

এরই সঙ্গে কাবচিত্তে পৃথক চিন্তাধারাও ছিল জাগরূক। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (১৯০৯) কবি সেই চিন্তাকে রূপ দিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে। ধনঞ্জয় রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন; সে বিদ্রোহ অহিংস। রবীন্দ্রনাথের মনে জননায়ক বাউলের যে কল্পনা ছিল, ধনঞ্জয় তারই মূর্তি।

> "ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁহার অহিংসনীতির প্রতীক। কবি বহুদিন হইতে বলিতেছিলেন যে ভারতের যিনি নায়ক হইবেন, তিনি হইবেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ফকির। সেই আদর্শায়িত নেতার মূর্তি হইতেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধী সেই নীতিকে কেবল বাক্যে নহে, জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছেন।"[১]

—'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খণ্ড, ১৯৭৭, 'প্রায়শ্চিত্ত নাটক', পৃ ২৭৩

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—

"বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে···
বিনা অস্ত্র বিনা সহায় লড়তে হবে॥"

—'গীতালি', ৩ 'বাধা দিলে', ১৩২১, ৪ঠা ভাদ্র

---

১. অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য মনে করেন 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র চরিত্র পরিকল্পনায় লোকমান্য টিলকের সংগ্রাম-আদর্শের ছায়া পড়েছে, মহাত্মা গান্ধীর নয়। দ্রষ্টব্য: 'রবীন্দ্র-চর্চা', ১৯৭৩, 'মাধবপুরের ধনঞ্জয় ও মহারাষ্ট্রের টিলক'

রবীন্দ্রনাথ যেন ধ্যানে ভবিষ্যৎ-দর্শন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, গান্ধীর মৃত্যুর বহু পূর্বে তিনি সেই মৃত্যুকেও হয়তো প্রত্যক্ষ করেছিলেন 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শিশুতীর্থ' কবিতায় ( ১৩৩৮ শ্রাবণ ), জননায়কেব মৃত্যুর মধ্যে।

জীবন-সায়াহ্নে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

"লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে॥
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্বর্বণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।"

—'পত্রপুট', 'পনেরো', 'ওবা অন্ত্যজ', ১৩৪৩, বৈশাখ

যিনি প্রেমের তীর্থে যাত্রা করেছিলেন অহিংসাব বাণী নিয়ে, তাঁকেও বলেছেন 'মৃত্যুঞ্জয়' ( 'পুনশ্চ', শিশুতীর্থ ), আবার যে মহাপুরুষেরা ইতিহাসের মহাযুগে আবির্ভূত হয়েছেন বাণী নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, জ্ঞানালোক নিয়ে — তাঁদেরও বললেন 'মৃত্যুঞ্জয়'। ব্রাহ্মণ্যতেজ ও ক্ষাত্রতেজ উভয়ের দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করা যায়, এ কথা ১৯৩৬ সালেও কবি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন। জ্ঞানের পাশেই অস্ত্রকে স্থান দিলেন সেই সঞ্জীবনী সভার মতই, যার অনুষ্ঠানে বেদের পুঁথি ও খোলা তলোয়ার একত্র স্থান পেত।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ আব একটি কবিতা পাঠ করেন। লর্ড লিটনের আমলে 'দিল্লী দরবাব' উপলক্ষে কবিতাটি রচিত। এটি, পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের ( ১৮৮২ ) অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে কেবল 'বৃটিশ' শব্দের জায়গায় 'মোগল' শব্দ বসানো হয়েছে, আর কোন পরিবর্তন করা হয় নি। এই কবিতারও বিষয়বস্তু পরাধীন ভারতের চিন্তা। 'বন্ধনশৃঙ্খল'কে পূজা করবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের একত্রিত হওয়া কবিকে গভীর বেদনা দিয়েছিল। তিনি তাকে সমর্থনও করেন নি।

"মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।"

বন্ধনশৃঙ্খলের পূজার পরিবর্তে বন্ধনমোচনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার কথা তাঁর মনে এসেছিল।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করেন এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর তৎকালীন মনোভাব ও চিন্তাধারার পরিচয় আছে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' ( ১৮৮১ )। দেশে ফিরবার পর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় পরিবর্তন ঘটে। ইতিপূর্বে ভারতের চিন্তা তাঁর মনে জাগ্রত ছিল, এখন তিনি বুঝলেন ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ করতে হলে প্রথমে বাংলা দেশকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সাহায্যে বাংলা দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেই পথের পথিক হলেন।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যে ( আহ্বানগীত ) বিশ্বের সভায় বাঙালির আসন নেই দেখে কবির আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে।

"পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কই রে বাঙালি কই।"

'মানসী'তে ( দেশের উন্নতি ) নিশ্চেষ্ট বাঙালিকে কবি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন, বঙ্গবাসীকে স্তন্যপায়ী জীব বলেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললেন—

"দূর হউক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনা-ভরা প্রাণ।· ·
সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে
মরণভয় চরণতলে
দলিত হয়ে রবে।"

নিজেও কর্মসাধনার দ্বারা দেশসেবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে — ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী··· ।
এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা— এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা··· ।"

—'চিত্রা', এবার ফিরাও মোরে

'সোনার তরী'র ভূমিকায় কবি বলেছেন সাহিত্যের পথ ও কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হয়েছিল তাঁর জীবনে।

সাহিত্যের দ্বারা, কর্মের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশকে উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছিলেন — সে উদ্‌বোধন ভারতীয় আদর্শের বহির্ভূত নয়। মহান্ ভারতের আদর্শেই বাংলার নবজাগরণ তাঁর উদ্দীষ্ট ছিল, তাই 'কথা ও কাহিনী', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্যে প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথা কীর্তিত। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানবল ও বাহুবল, উভয়েরই চর্চা ছিল।

"হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা
হোথা শান্ত মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।"

—'চৈতালি', প্রাচীন ভারত

সেই প্রাচীন ভারতের আদর্শেই নব্যবঙ্গ তথা নব্যভারত গঠনের সংকল্প ছিল তাঁর মনে। 'কথা ও কাহিনী'তে একদিকে বৌদ্ধ মৈত্রী, করুণা ও ত্যাগের আদর্শ এবং অন্যদিকে শিখগরিমা, রাজপুতগরিমার বাণী প্রচার করে বাঙালির আত্মশক্তিকে কবি উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এই আত্মশক্তির বলেই স্বাধিকার লাভ করা যায়, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি নিশ্চেষ্ট, নির্জীব বাঙালিকে মৃত্যুভয় থেকে উত্তীর্ণ করবার বাণীমন্ত্র। 'পঞ্চনদীর তীরে' যা ঘটেছে গঙ্গানদীর তীরে তা ঘটে নি বলে কবির আক্ষেপের সীমা ছিল না। বীরের মত মরতে না শিখলে যথার্থরূপে বাঁচাও যায় না — এ কথা কবি জানতেন।

"পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালো মন্দ কোনো-একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন। তাঁহারা যদি মরিতেন তবে উত্তরাধিকার-

সূত্রে আমরা নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা…মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই। এত বড়ো দুর্ভাগ্য, এত বড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে।”

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', মা ভৈঃ

বেঁচেও মরে থাকার যে দৈন্য ও লজ্জা, অপমান-অবজ্ঞার মধ্যে যে প্রত্যহমৃত্যু, কবি তার থেকে মুক্তি চান। 'বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই'। তাই গাইলেন —

“হও মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ,
যাক, যাক ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ।

—চলো যাই চলো যাই

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ একদিকে রচনার সাহায্যে বাংলা দেশকে উজ্জীবিত করতে প্রয়াসী, হলেন, অন্যদিকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, শ্রীনিকেতনের কর্ম-প্রতিষ্ঠান স্থাপনা পতিসরে কৃষিব্যাঙ্কের চলন, সমবায় সমিতি, সমান্তরাল সরকার-ব্যবস্থা এবং স্বকীয় শাসনকার্যের পরিকল্পনা প্রভৃতি দ্বারা দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন করবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

এইরূপে যখন রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের বাণীতে ও কর্মে বাংলা দেশের মনোভূমি প্রস্তুত—তখন লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯০৫ সালের ১৬ই অকটোবর বাংলা দেশ দ্বিধাবিভক্ত হল। এর প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা দেশ জেগে উঠল। সেই জাগরণে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দেশজাগরণের আবেগে উচ্ছ্বসিত কবিহৃদয় বিশেষভাবে দেশ-মাতৃকার পূজা ও বন্দনায় নিরত হল। অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা হতে থাকল। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের উৎসমুখ খুলে গিং অনর্গল-ধারায় প্রবাহিত হয়ে গানগুলি বাংলা দেশকে প্লাবিত করে দিল।

## ২

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের আরম্ভেই সংগীতরচনাও শুরু করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর সংগীতজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল দেশাত্মবোধক সংগীতরচনার দ্বারা—সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।[১] ১৮৭৮ সালের মধ্যে তিনি অন্ততঃ চারটি জাতীয় সংগীত রচনা করেছিলেন। এরপর ১৮৮৬ সালে কলকাং য় কংগ্রেসের প্রথম অধি-

১. দ্রষ্টব্য: অবতারণা, রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিবর্তন ও পর্ববিভাগ

বেশনের উদ্‌বোধন-সংগীত রচনা করেন —'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'।[১] 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই' এবং 'তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ' গান দুটি কলকাতা কলেজের ছাত্র মিলনসভার জন্য রচিত ( ভারতী, বৈশাখ ১২৯৪ )। 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে' এবং 'আমায় বোলো না গাহিতে' এরই কাছাকাছি সময়ে রচিত। 'সে আমার জননী রে' ও 'এবার চলিনু তবে' গান দুটি 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত। হেমচন্দ্র বসুমল্লিকের অনুরোধে দেশমাতৃকার স্তবগীত 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী' রচিত হয়।[২] এইভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তরূপে তিনি স্বদেশী গান রচনা করে চলেছিলেন বঙ্গব্যবচ্ছেদের পূর্বেই।

কিন্তু বঙ্গবিভাগের সময় রবীন্দ্রনাথ এক তীব্র আবেগের প্রেরণায় ধারাবাহিক ভাবে সংগীতরচনা শুরু করলেন। এক সঙ্গে এত গান এর পূর্বে রচিত হয় নি।

> "রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেও স্বদেশী সংগীত মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তাগিদে লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এবারকার রচনার প্রেরণা যেন অন্তরের মধ্যেই পাইয়াছেন। আকস্মিক বন্যার ন্যায় কয়েকদিনের জন্য কূল ছাপাইয়া গীতধারা উৎসারিত হইল।"
>
> —রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, ১৯৭৭, 'স্বদেশী সংগীত বাউল' পৃ ১৬৪

এই সময়কার স্বদেশী গানগুলি 'বাউল' নামক পুস্তিকায় সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার সূচীপত্রে প্রত্যেকটি গানের পৃথক পৃথক নাম দেওয়া আছে এবং গ্রন্থের ভিতরে গানটির সঙ্গে নাম ও সুর-তালের উল্লেখ করা আছে। সূচীপত্রের একাদশ সংখ্যায় 'বাউল' নামাঙ্কিত ছ'টি গানের একটি গুচ্ছ আছে এবং পঞ্চদশ সংখ্যক গানটিকে পৃথকভাবে 'বাউল' নাম দেওয়া হয়েছে। মোট কুড়িটি গানের মধ্যে চোদ্দটিতেই বাউলের সুর বসানো। একটিতে সারিগানের সুর এবং বাকী পাঁচটির সুর রাগরাগিণী-আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশী আন্দোলনের নেতারূপে জননায়ক বাউলের যে পরিকল্পনা ও আদর্শ ছিল, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র চরিত্রে তারই রূপায়ণ —সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু ধনঞ্জয়ের পূর্বে দেশবিভাগের আন্দোলনে তিনি নিজেই সেই জননেতা বাউলের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, স্বদেশী সংগীত-সংকলনের 'বাউল' নামকরণের মধ্যে তারই পরিচয়। সেই কারণেই অধিকাংশ গানে বাউলের সুর দিয়েছেন। বাউল সুর, সারিগানের সুর—লোকগীতির সুর। সাধারণ

---

১. অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের মতে গানটি মূলতঃ ব্রহ্মসংগীত। দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রচর্চা', ১৯৭৩. 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার'

২. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রজীবনী', ১৯৭৭, ২য় খণ্ড, 'স্বদেশী সংগীত : বাউল'

মানুষের প্রাণের কাছে পৌছে দেবার জন্য কবি গানগুলিতে লোকপ্রচলিত সুর এবং সহজ, সরল, হৃদয়স্পর্শী কথা ব্যবহার করেছেন। এই গানগুলির সাহায্যে বাঙালি যথার্থই নূতন শক্তি, নূতন বল ও নূতন প্রাণ লাভ করেছিল।

'বাউল' গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এবং হয়তো সেই কারণেই বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু বাংলা দেশের এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এই গ্রন্থে প্রকাশিত গানগুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল।

## বাউল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

কলিকাতা, ২০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে পি, রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

| গানের নাম | সুর-তাল | গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি |
|---|---|---|
| ১। সার্থক জন্ম | ভৈরবী | সার্থক জনম আমার |
| ২। পথের গান | রামকেলী-একতালা | আমরা পথে পথে যাব সারে সারে |
| ৩। সোনার বাংলা | বাউলের সুর | আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি |
| ৪। দেশের মাটি | বাউলের সুর | ও আমার দেশের মাটি |
| ৫। দ্বিধা | বেহাগ-একতালা | বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি |
| ৬। অভয় | ভূপালি-একতালা | আমি ভয় করব না ভয় করব না |
| ৭। হবেই হবে | বাউলের সুর | নিশিদিন ভরসা রাখিস |
| ৮। বান | সারিগানের সুব | এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে |
| ৯। একা | বাউলের সুর | যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে |
| ১০। মাতৃমূর্তি | বিভাস-একতালা | আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে |
| ১১। 'বাউল' | বাউল | ১। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক |
| " | " | ২। যে তোরে পাগল বলে |
| " | " | ৩। ওরে তোরা নেই বা কথা বল্লি |
| " | " | ৪। যদি তোর ভাবনা থাকে |
| " | " | ৫। আপনি অবশ হলি তবে |
| " | " | ৬। জোনাকি, কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ |

| | | |
|---|---|---|
| ১২। মাতৃগৃহ | বাউলের সুর | মা কি তুই পরের দ্বারে |
| ১৩। প্রয়াস | বাউল | তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে |
| ১৪। বিলাপী | বাউলের সুর | ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি |
| ১৫। 'বাউল' | বাউল | ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে ওরে ভাই |

এই গানগুলির অধিকাংশই সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩১২ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় — 'বান', 'একা', 'মাতৃমূর্তি', 'মাতৃগৃহ', 'প্রয়াস', 'বিলাপী', 'বাউল' ( এর অন্তর্গত ছ'টি গান )— এই গানগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। বাউল গ্রন্থের বহির্ভূত তৎকালীন অপর তিনটি বিখ্যাত রাখী-সংগীতও ( 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' এবং 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' ) ঐ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ১৩১২ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'—'সোনার বাংলা' ও 'দেশের মাটি' এবং ঐ বৎসরের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'—'হবেই হবে', 'দ্বিধা' ও 'অভয়' প্রকাশিত হয়। 'সার্থক জন্ম' এবং 'পথের গান' কোন পত্রিকায় বেরিয়েছিল কি না জানা যায় না। সম্ভবতঃ গান দুটি বাউল গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

এই স্বদেশী গানগুলিতে কবির বিভিন্ন ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। কোন কোন গানে আছে নিছক দেশপ্রেম, দেশের প্রতি ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা।

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥…
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি ॥"

এই ভালবাসাই পরিণত আত্মতৃপ্তিতে—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালবেসে ॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কিনা রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥"

কখনও ভক্তিপ্রকাশ—

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।'

চিত্র ৫

[illegible]

112 সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে -
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধনরতন
আছে কিনা রাণীর মতন
(শুধু) জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে —
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদ্‌ব নয়ন শেষে।

পাণ্ডুলিপি : 'সার্থক জনম আমার'(১১০)। প্রথম সংকলিত 'বাউল' গ্রন্থে(১৯০৫)

রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ

বাংলা দেশের জাগরণের জন্য কবি এতকাল সচেষ্ট ছিলেন। সেই মুমূর্ষু বাংলার দেহে যখন প্রাণবন্যার জোয়ার এল, কবি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গাইলেন—

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' বলে ভাসা তরী ॥···
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি।"

বঙ্গব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে বাংলা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধন' উৎসব করেন। সেই উৎসবের ঐক্যমন্ত্র—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥···
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥"

বিদেশী শাসকের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে গাইলেন—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান!
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদেব এমনি অভিমান।"

তাদের অত্যাচারকে তুচ্ছ করলেন—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।···
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে ॥"

সংকল্প গ্রহণ করেছেন—

'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না, মা!'

তাঁর এই সংকল্প আজীবন অটুট ছিল।

বাঙালিকে উৎসাহ দিয়েছেন—

"তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে,
তা' বলে ভাবনা করা চলবে না।"

এবং

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।'

দেশবাসীকে সাহস ও অভয় দিয়েছেন—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।"

কিংবা,

"আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥···
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥"

এইভাবে দেশের জনসাধারণকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অভয় দান করে, দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে, বাংলার জাগরণকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা দেশের সংকোচে বিহ্বল, সংকটে ম্রিয়মাণ, দীনহীনা, লজ্জিতা, শঙ্কিতা মূর্তি দেখে একদিন কবিকে বলতে হয়েছিল 'নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল।' আর ১৯০৫ সালে সেই জননীর গৌরবে উজ্জ্বল মূর্তি দেখে হর্ষোৎফুল্ল কবি গাইলেন—

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!···
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী।···
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি।
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি।··
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলার এই অ-পূর্ব জনজাগরণের সঙ্গে পরবর্তী আর কোন আন্দোলনের তুলনা হয় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

"বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের ভাবালুতার সহিত একমাত্র তুলনা হইতে পারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের যুগের সহিত। সেদিনও ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যায় যে সাহিত্যের জন্ম হয়, তাহা আজ পূর্ণ বিকশিত হইয়া···শোভা পাইতেছে। স্বদেশী-আন্দোলনের আবেগজোয়ারে যে বিরাট সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্ট হইল, তাহার প্রভাব আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। বাঙালির কাছে সেদিন দেশ সত্যই মাতৃরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল···।"

—'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খণ্ড, ১৯৭৭, 'স্বদেশী আন্দোলন', প ১৭০

স্বদেশী সংগীত সম্পর্কে লেখক বিশেষভাবে বলেছেন—

"গানের ঐতিহাসিক পটভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও উহাদের রসধর্ম কখনো নষ্ট হয় না; কারণ, বিশেষকে ছাপাইয়া উহার ভাবরাজি স্থানকাল-নির্বিশেষে চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে।"

তাই ১৯০৫ সালের ঐতিহাসিক পটভূমি বহুপূর্বে অন্তর্হিত হলেও গানগুলির ভাবমূল্য আজও পর্যন্ত অম্লান। সেই কারণেই ১৯৭২ সালেও 'বাংলাদেশে'র স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গানগুলি নতুন করে প্রেরণা এনেছিল বাঙালির মনে।

নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ পরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সরে এলেন ('কাজের পথে আমি তো আর নাই')। কিন্তু তাঁর চিন্তায় ও কর্মে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশচিন্তার ধারা চলল নিরন্তর। তিনি অনুভব করলেন স্বদেশকে গড়ে তুলতে হলে তাকে ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকেও গঠন করা প্রয়োজন, কারণ দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবার প্রধান অন্তরায় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার। এই নূতনতর চিন্তার ফলে তিনি এবারে যথার্থ ভারতীয় পথে দেশকে সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টিত হলেন।

যুগে যুগে বহু বিচিত্র মানুষ এসেছে ভারতের পথে। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধন করে, এক সমাজ ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষের সাধনা। এই ঐক্যের সন্ধান করতে গিয়েই ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বাত্মাকে। তাঁকে সর্বজীবে, সর্বকালে ও সর্বদেশে অনুভব করা ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনপথ—একেই বলা যায় ভারতপথ।

"রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

—ভারতপথিক রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনেরই অনুবর্তী ভারতপথের মহাপথিক। ভারতপথের এই বিশেষত্বটুকু উপলব্ধি করেই গোরা বলেছিল, ('গোরা', ১৯১০)—

"আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

এই বাণীর প্রতিধ্বনি 'মাতৃ-অভিষেক' বা 'ভারততীর্থ' কবিতা ( 'গীতাঞ্জলি', ১০৬, ১৯১০, জুলাই ২ )।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন —
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।···
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।"

এই কবিতাটিব প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ স্তবক সুরসংযুক্ত হয়ে গীতবিতানের 'স্বদেশ' পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। 'মাতৃ-অভিষেক' এবং 'ভারততীর্থ'—দুটি নামকরণের দ্বারাই কবিতাটির অর্থ সুস্পষ্ট হয়। 'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি' দেবার এবং 'মহামানবের সাগরতীরে' 'সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে' দেশমাতৃকার অভিষেকের কথাই রচনাটির মর্মবাণী।

এই কবিতাব প্রায় সমকালে রচিত 'জনগণমন-অধিনায়ক' ইত্যাদি জাতীয় সংগীতটিতেও ( ১৯১১, ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতা কংগ্রেসের ২য় অধিবেশনে প্রথম গীত হয় ), অখণ্ড ভারতের মহামিলন-মন্ত্র উদ্‌গীত হয়েছে—

"অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!"

বস্তুতঃ গোরা যাঁকে 'ভারতবর্ষের দেবতা' বলেছে, 'ভারততীর্থ' কবিতায় 'উদার ছন্দে পরমানন্দে' সেই দেবতারই বন্দনা করা হয়েছে এবং তিনিই হচ্ছেন 'জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক' 'ভারতভাগ্যবিধাতা'।

শুধু সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনই নয়, রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদও দূর করতে চেয়েছিলেন।—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।···
শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।···
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,

আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

—'গীতাঞ্জলি', ১০৮, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ভারতদর্শন। এই ভারতরূপ ভারতের ভৌগোলিক রূপ নয়, তার আধ্যাত্মিক রূপ। এই আধ্যাত্মিক রূপের দর্শন ও সাধনার ফলে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম স্বদেশের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে নি, তা এক বিশেষ ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করে এক সময় ভগবৎপ্রেমের সঙ্গে মিলে গেছে।

এই প্রসঙ্গে 'জনগণ' ইত্যাদি গানটির কথা পুনর্বার স্মরণ করি। কংগ্রেসে গীত হবার পরের মাসেই ( মাঘ, ১৩১৮ ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেখানে গানের নাম দেওয়া হয় 'ভারতবিধাতা' এবং তার নীচে গানের পরিচয় লেখা হয় 'ব্রহ্মসংগীত'। সেই মাঘ মাসেই কলকাতায় মহর্ষিভবনে মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে এই গানটি গাওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের নবযুগ' নামক যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাব শেষাংশে আছে—

"আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া ভূমাব পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগ দিতে পাবি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানবভাগ্যবিধাতা।"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৮ ফাল্গুন এবং ভারতী পত্রিকা, ১৩১৮ ফাল্গুন

শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত এক পত্র (২০।১১।৩৭) এবং শ্রীসুধারাণী দেবীকে লিখিত অপর একটি পত্রে (২৯।৩।৩৯) ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে যথাক্রমে 'যুগযুগান্তরের মানব-ভাগ্যরথচালক' এবং 'শাশ্বত মানব-ইতিহাসের চিরসারথি' বলে অভিহিত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মানবধর্মের পূজারী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মানব-ভাগ্যনিয়ন্তাকে ভারতবিধাতা বলে অভিহিত করা অপ্রত্যাশিত নয়; সেই মানব-বিধাতাই বিশ্বেশ্বর। তাই এই গানের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল 'ব্রহ্মসংগীত' এবং গানটি গ্রন্থভুক্ত হয় 'ধর্মসংগীত' পুস্তকে (১৯১৪)।

অথচ গানটির ভাবদ্যোতনা হল দেশভক্তি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল না। সেই কারণেই গানটি একাধারে কংগ্রেসে ও মাঘোৎসবে গাওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ—

"এটি যুগপৎ জাতীয় সংগীত ও ভগবৎসংগীত। এ গানের মূল প্রেরণা দেশাত্মবোধ অথচ এর লক্ষ্য বিশ্ববিধাতা বা ঈশ্বর।...বস্তুতঃ... জনগণমন-

অধিনায়ক গানে(ও) ধর্মের প্রেরণাকেই দেশপ্রীতির প্রেরণায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।…একাধারে দেশভক্তি ও ভগবদ্‌ভক্তির গান বলেই এটি…প্রথমে 'ধর্মসংগীত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এটিকে 'গীতবিতান' গ্রন্থে 'স্বদেশ' পর্যায়ভুক্ত করেন এবং 'হে মোর চিত্ত' ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এই দুটি গানেরও পুরোভাগে স্থাপন করেন।"

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত', ১৩৫৬, পৃ ১৯-২০

এই ভক্তিমিশ্রিত স্বদেশপ্রেমের পরিচয় অন্যত্রও আছে ( 'উৎসর্গ', ১৬ )।

'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।…
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা,
মোর সনাতন স্বদেশে।"

এই সর্বসাম্প্রদায়িক ভক্তিমিশ্র ভারতচিন্তার ভাবটি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের হৃদয় অধিকার করে ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত রচনার উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় তিনি এক সঙ্গে অসংখ্য গান রচনা করেন। ক্রমশঃ সেই ধারা মন্দীভূত হয়ে এল। এর পরে যে গানগুলি তিনি রচনা করেন, সেগুলি স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী যুগের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কোন বিশেষ উপলক্ষে অথবা উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত। 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল' গানটি রচিত হয়। ১৯১৭ সালে নানা কারণে রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় রচিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি। এই গান ১৯১৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেস-অধিবেশনে গাওয়া হয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে দেখিয়েছেন এই গানের সঙ্গে 'জনগণ' গানের ভাবগত সাদৃশ্য কত নিকট ও গভীর। অর্থাৎ তখনও কবির মনে ভারতচিন্তা ও ভারতদর্শন সদাজাগ্রত ছিল।

দেখা গেল রবীন্দ্রসংগীতের অন্যান্য ভাবধারার মত স্বদেশচিন্তাও বিবর্তিত ও সুপরিণত হয়েছে। ভগবৎপ্রেম, মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেমের মত রবীন্দ্রনাথের

স্বদেশপ্রেমও কোন খণ্ড, ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত চিন্তা নয়, তা এক অখণ্ড বিশ্ববোধ-জাত। স্বদেশের ভূমিতে তিনি বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, দেশমাতা ও বিশ্বমাতা তাঁর চিন্তায় একসঙ্গে মিলিত।

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥"

সেইজন্যই তাঁর স্বদেশী সংগীতগুলিও চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য লাভ করেছে। গানগুলি উদ্দেশ্য-প্রসূত রচনা হলেও, এগুলির মূল্য তাৎক্ষণিক নয়। কারণ এগুলির সঙ্গে কবির নিবিড়, গভীর বিশ্ববোধ এবং ধর্মবোধ যুক্ত রয়েছে। তাই সত্তর বৎসরেরও অধিক পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের যুগের রচনা হয়েও গানগুলি আজও পর্যন্ত পাঠকহৃদয়ে এক নিবিড় গভীর চেতনার সঞ্চার করে, দেশপ্রেমের আবেগে মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলির বিশিষ্টতা ও মূল্যবত্তা এখানেই।

## *বিবিধ*

গীতবিতানে 'পূজা', 'স্বদেশ' ( ও 'জাতীয় সংগীত' ), 'প্রেম' ও 'প্রকৃতি' ছাড়া আর একটি বৃহৎ গীতগুচ্ছ আছে, তার নাম 'বিচিত্র'। বিচিত্র পর্যায়ের গানগুলিকে একত্রিত ভাবে কোন নির্দিষ্ট ভাবধাবার অন্তর্গত করা যায় না, সেগুলি কবির বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন চিন্তার প্রকাশ। কিন্তু তা বলে গানগুলির মূল্য কোন অংশে কম নয়; বরং অনেক গান কবির গভীর ও বিশিষ্ট চিন্তার অভিব্যক্তি হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া গীতবিতানে 'আনুষ্ঠানিক' নামে একটি ক্ষুদ্র গীতগুচ্ছ আছে। 'বিচিত্র' ও 'আনুষ্ঠানিক'—এই দুই পর্যায়ের সংগীতগুলিকে একত্র করে 'বিবিধ' নাম দিয়ে, বর্তমান পরিচ্ছেদে এগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

এই আলোচনায় 'হাসির গান' ও 'আনুষ্ঠানিক গান' এই দুটি প্রধান উপবিভাগ আছে। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার প্রকাশ অনুযায়ী ছোট ছোট গীতগুচ্ছে গানগুলি সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে আলোচনার সুবিধার জন্য। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা ভাল। গীতবিতানে সংকলিত রবীন্দ্রসংগীতের সবগুলির মূল রচনাগত উৎস নির্দেশ করা নেই। ঘটনাত্মক উৎসনির্দেশের ফলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু মূল রচনার নির্দেশ থাকলে প্রাসঙ্গিকতার সাহায্যে ভাবোপলব্ধি সহজ হয়। এর অভাবে অনেক সময় ভুল হবার সম্ভাবনাও দেখা

দেয়। তাই যথাসম্ভব অর্থ-সংগতি ও প্রসঙ্গ-সংগতি রক্ষা করে এগুলির ভাব-সম্পদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**হাসির গান :** হাসি বা হাস্যরস মানুষের বিশিষ্ট ভাবানুভূতির প্রকাশ। সেই কারণে অলংকার শাস্ত্রোক্ত নয়টি রসের মধ্যে হাস্যরস অন্যতম প্রধান রস হিসেবে গণ্য। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, এমন কি বঙ্কিম-পূর্ব আধুনিক যুগেও—

> "হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত।'
>
> —'আধুনিক সাহিত্য', 'বঙ্কিমচন্দ্র

বস্তুতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও যথার্থ হাস্যরসাত্মক রচনার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনা ব্যতীত সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় উচ্চস্তরের হাস্যরসের বিশেষ কোন নিদর্শন মেলে না। রবীন্দ্রনাথের মতে এব কারণ আমরা 'স্বভাববৃদ্ধ'। তাই সবকিছুব মধ্যেই তত্ত্বের নগদ বিদায় খুঁজি, বিশুদ্ধ আনন্দ বা হাস্যের প্রতি কোন পক্ষপাত নেই আমাদের। নির্মল হাস্যজ্যোতির অভাবে আমাদের জীবন ও সাহিত্য যে পঙ্গু ও অপূর্ণ থেকে যায়, সে কথাও আমরা স্মরণ করি না।

> "এই পঞ্চবিংশতি কোটি সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোনো দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস ও বাল্য-চাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া একমুহূর্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন, তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতবকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ, 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯ [১]

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস-রচনা প্রসঙ্গে প্রকৃত হাস্যরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ( 'আধুনিক সাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ) —

> "তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে ; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল-বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথমে দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার

---

১. ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে (১৩৫৪) সংকলিত।

সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' কাব্যের রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনাও ( 'আধুনিক সাহিত্য', আষাঢ়ে ) স্মরণ করি।

"সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে 'আষাঢ়ে'-রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন, এমন আশ্বাস দিয়াছেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সম্পর্কে এই উক্তি অধিকতর প্রযোজ্য। সাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে যে উচ্চমানের আদর্শ জাগ্রত ছিল, তারই প্রকাশ উপরি-উদ্ধৃত অংশে। তাঁর নিজের রচনাতেও এ বিষয়ে তাঁর সদা-সতর্কতার পরিচয় মেলে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নির্মল, শুভ্র এবং সুপরিণত হাস্যরসের প্রবর্তনা করলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রকাশ দেখা দেয়। ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় হাস্যরসসৃষ্টির প্রচেষ্টা উপেক্ষণীয় নয়। মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও আধুনিক ও প্রকৃষ্ট রুচিসম্মত হাস্যরসের নিদর্শন আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রচেষ্টাগুলিকে পূর্ণ পরিণতি দান করলেন, আর রবীন্দ্রনাথের হাতে হাস্যরস আরও মার্জিত, তীক্ষ্ণ ও বিচিত্র হয়ে উঠল।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ হাসির গানের স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকে অনেকগুলি হাসির গান আছে। ঈশ্বরগুপ্ত আবিষ্কার করেছিলেন 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা'। তাঁর রচনায় তাই রঙ্গের এত ছড়াছড়ি। এই রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতাগুলির সঙ্গে বহু হাস্যরসাত্মক গানও তিনি রচনা করেছেন এবং বাংলা হাস্যরসাত্মক গীতসাহিত্যের ইতিহাসে এই গানগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরগুপ্তের আপাতরঙ্গময় দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রেই গভীর অন্তর্বেদনার পরিচয় আছে—যেখানে হাস্যরস যথার্থ অশ্রুসজল 'হিউমার'-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

ঠাকুরবাড়িতে শিক্ষা, সংগীত, ধর্ম ও স্বাদেশিকতা-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসেরও চর্চা চলত। 'জীবনস্মৃতি'তে বাড়ির আবহাওয়া প্রসঙ্গে সেই হাস্যরস-পরিমণ্ডলের বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ 'ও কথা আর বোলো না আর বোলো না' ইত্যাদি একটি হাসির গানের উল্লেখও করেছেন। গানটি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরগুপ্তের রচনা, যদিও রচয়িতা হিসেবে তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' প্রহসনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অলীকবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই পারিবারিক হাস্যরস-পরিমণ্ডলের প্রভাবে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে হাস্যরস স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রধান স্থান লাভ করেছে।

তবে, অন্যান্য রচনার তুলনায়, রবীন্দ্রনাথের গানে হাস্যরসসৃষ্টির অবকাশ কম। সম্ভবতঃ 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র জন্য তিনি প্রথম হাস্যরসাত্মক গান রচনা করেন। ডাকাতদের সংলাপে, প্রথম দস্যুর আচরণ ও কথাবার্তায় প্রভূত হাস্যরসের খোরাক আছে। 'কালমৃগয়া' প্রধানতঃ করুণ রসের নাটক হলেও, বিদূষকের মুখে কবি একাধিক হাসির গান বসিয়েছেন। অবশ্য সেই গানগুলি বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম দস্যুর কয়েকটি গানেরই পরিবর্তিত রূপ। এ ছাড়া সাময়িক কোনো প্রয়োজনে অথবা বিশেষ কোনো সংঘের জন্য তিনি হাসির গান রচনা করেছেন। 'সুসীম চা-চক্রে'র 'চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতক দলে'র পরিচয় দিয়েছেন, 'হায় হায় হায় দিন চলি যায়' গানটিতে। 'হৈ হৈ সংঘে'র ( 'হৈহয় সংঘ' ) সভ্যদের আত্মপরিচয়-সূচক গান—'কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী', 'পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,' 'ও ভাই কানাই কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ', 'না-গান-গাওয়ার দল রে আমরা' প্রভৃতি।

বিভিন্ন নাটকে বহু হাসির গান সন্নিবিষ্ট আছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র (১৮৮৪) 'প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে' ইত্যাদি গানটি কৌতুকাশ্রিত। 'ব্যঙ্গকৌতুক' নাটকেও ( ১৯০৭) একটি হাসির গান আছে—'বিনি পয়সার ভোজ'। 'চিরকুমার সভা'র ( গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১৯২৬ ) অক্ষয়ের মুখে কয়েকটি কৌতুকাশ্রিত গান বসানো হয়েছে—'অভয় দাও তো বলি আমার wish কী', 'কতকাল র'বে বল ভারত রে শুধু ডাল ভাত জল পথ্য ক'রে', 'পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে', 'মনোমন্দির সুন্দরী' প্রভৃতি। 'মুক্তির উপায়' নাটকে ( গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১৯৪৮ ) আছে 'গুরুপদে মন করো অর্পণ' গানটি।

'শেষরক্ষা' নাটকের ( ১৯২৮ ) শেষে একটি গান আছে—

"ওগো, তোমরা সবাই ভালো—
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভালো—...
কেউ বা অতি জ্বলো-জ্বলো, কেউ বা ম্লান' ছলো-ছলো',
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো॥" ইত্যাদি

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী বিশেষ স্থান লাভ করেছে। চিরন্তন নারীর দুই রূপ কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন—শ্রেয়সী ও প্রেয়সী। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই দুই রূপের মহিমা ও গরিমা বিশেষভাবে কীর্তিত। নারীমহিমার কাছে কবি চিরকাল মাথা নীচু করেছেন। উপরোক্ত গানটিতে নারীর বিচিত্র মূর্তি, বিভিন্ন ভাব নির্মল হাস্যরসের সাহায্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও নারীর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা অস্পষ্ট থাকে নি।

"আমরা তৃষ্ণা, তোমরা সুধা— তোমরা তৃপ্তি, আমরা ক্ষুধা
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।"

'ক্ষণিকা' কাব্যের 'কল্যাণী' কবিতায় আছে—'সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে'। 'তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো' পঙ্‌ক্তিটির সঙ্গে উপরিলিখিত পঙ্‌ক্তির অর্থসাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই গানটির প্রসঙ্গে 'মহুয়া'র 'নাম্নী'-শীর্ষক কবিতাগুলির কথাও স্মরণ হয়। নারীমহিমার প্রতি কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি গানটিকে নিছক হাসির পর্যায় থেকে উন্নীত করে অতলস্পর্শী গভীরতা দান করেছে। এখানে যেন কবির বক্তব্য—

"গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাই পাই।
মনে মনে হাসবি কি না
বুঝব কেমন করে?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
ঠাট্টা করে ওড়াই সখী,
নিজের কথাটাই।

হালকা তুমি কর পাছে
হালকা করি ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

—'ক্ষণিকা', ভীরুতা

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের নাটক 'তাসের দেশ' ( ১৯৩৩ ) কৌতুকাশ্রিত নাটক। সামাজিক বিধিনিষেধ এবং আইনকানুনের অচলায়তনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ ও তিরস্কার ধ্বনিত হয়েছে এই নাটকে, হাস্যরসের আচ্ছাদনে। বস্তুতঃ তাসের দেশে 'অচলায়তন' নাটক এবং 'গোরা' উপন্যাসের মূল বক্তব্য কৌতুক ও রূপকের সাহায্যে প্রকাশিত। এরই সঙ্গে, সামাজিক বন্ধনমোচনে নারীর অগ্রাধিকার এবং নারীপ্রগতির বাণীও ধ্বনিত। সে ক্ষেত্রে 'পলাতকা' কাব্যের সঙ্গেও এর ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাসের দেশে হাস্যরসাশ্রিত গানগুলি কৌতুকের সঙ্গে কবির গভীর অন্তর্বেদনার পরিচায়ক। এগুলি যেন 'বিদ্রূপের ভান'। কেবল হালকা হাসির মধ্যেই এগুলির তাৎপর্য নিহিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলির মধ্যে যে স্বদেশভাবনা খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ পেয়েছে, তারই সামগ্রিক রূপ তাসের দেশ নাটক। 'হাসির ছলে' 'লাজদান' করবার জন্য, আঘাত করে চেতনা জাগাবার জন্য এর সৃষ্টি। সেইজন্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'চিরকুমার সভা'র হাসির গানগুলির চেয়ে এগুলি অনেক গভীর, ব্যাপক ও সম্পূর্ণাঙ্গ। জীবনের শেষ প্রান্তে চিন্তার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে হাসির গানও পরিণত রূপ লাভ করেছে। এবং রবীন্দ্রনাথ হাস্যরসের প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর হাসির গানগুলিও সাহিত্যের আসরে চিরন্তন মূল্য লাভ করেছে।

আনুষ্ঠানিক গান : রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের উপযোগী সংগীত রচনা শুরু করেন। পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিভিন্ন উৎসবের জন্যও গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা এবং রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে, যে কোন বিষয়ই নবরূপে রূপায়িত ও নবমূল্যে মূল্যায়িত হয়েছে। অনুষ্ঠান-সংগীতগুলিও যে তার ব্যতিক্রম নয় — দৃষ্টান্ত দ্বারা সে কথা সপ্রমাণ করা যাবে।

আমাদের দেশে সাধারণত জন্ম, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি উৎসবের মধ্যে গতানুগতিক অনুষ্ঠানপালন ব্যতীত আর কোন সারবত্তা আছে বলে মনে হয় না; এগুলি নিতান্তই আমোদ-উল্লাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই

উৎসবগুলির জন্য রচিত গানে এদের উচ্চতর জীবনাদর্শে আদর্শায়িত করেছেন। 'এসো হে গৃহদেবতা', 'আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো হে' প্রভৃতি গানে গৃহপ্রবেশ উৎসব যেন পূজার স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই পূজা দেবার্চনা নয়; জীবনে একটি মহৎ মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা, একটি বৃহৎ আদর্শের অনুসরণে জীবনগঠন— এ এক বিশেষ সাধনা। গৃহপ্রবেশের গান সেই অর্থেই প্রায় আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত। তাই এই অনুষ্ঠানের প্রার্থনা—'শিখাও করিতে ক্ষমা', 'দেহো ধৈর্য হৃদয়ে' এবং

"সবে করো প্রেমদান, পূরিয়া প্রাণ
ভুলায়ে রাখো সখা, আত্মাভিমান।"

—এসো হে গৃহদেবতা

বিবাহ-উৎসব রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কেবলমাত্র নরনারীর মিলন নয়, বিবাহের একটি মহত্তর আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে। রাবীন্দ্রিক আদর্শানুগ প্রেম শুধু দৈহিক সংরাগ বা সুখ নয়, প্রেম হল চিরন্তন আনন্দরূপ। প্রেম সম্পর্কে এই উচ্চতর এবং মহত্তর আদর্শবো, বিবাহের গানেও ব্যক্ত।

"যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন না হয়, প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।…
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃতসদনে
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক-দুজনে।"

—শুভদিনে এসেছে দোঁহে

সেই কারণেই নববধূর উদ্দেশে বেদমন্ত্রের আশীর্বাদকে সংগীতরূপ দিয়েছেন।—

"সুমঙ্গলী বধূ, সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু। আহা!
সত্য রহো তুমি প্রেমে, ধ্রুব রহো ক্ষেমে
দুঃখে সুখে শান্ত রহো হাস্যমুখে।"

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, মৃত্যুর গানগুলিও শোকসংগীত নয়। মৃত্যুশোকে কবি কখনও মূহ্যমান হয়ে পড়েন নি। কারণ—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥"

চিরন্তন আনন্দপ্রবাহে তথা কালপ্রবাহে মৃত্যু একটি তরঙ্গমাত্র। সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপকে যিনি উপলব্ধি করেন, মৃত্যু তাঁর কাছে ভয়ংকর বা শোকাবহ নয়।

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥"

মৃত্যু জীবনেরই নামান্তর। দুঃখের মত মৃত্যুও তাঁর দৃষ্টিতে আনন্দস্বরূপ। সেই জন্যই মৃত্যুবিষয়ক গানগুলি 'পূজা' পর্যায়ের অন্তর্গত।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'হলকর্ষণ', 'বৃক্ষরোপণ', 'বসন্তোৎসব' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন রবীন্দ্রনাথ। এই অনুষ্ঠানগুলির উপযোগী গানও তিনি রচনা করেছেন। 'হলকর্ষণ' নামক উৎসব প্রবর্তনার পিছনে রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। মাটির সঙ্গে জীবমাত্রেরই প্রাণের যোগ আছে। বিশ্বপ্রকৃতি এবং জননী বসুন্ধরার প্রতি কবির আকর্ষণ নানা স্থানে ব্যক্ত হয়েছে। সেই জন্য চাষ করা, মাটি কাটা, ফসল তোলা প্রভৃতি চিরন্তন কৃষি-কর্মগুলির উপরে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছেন, তাদের মঙ্গল-সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি-উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন কর্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেখানেই এখন পর্যন্ত হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

"ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে॥"

কৃষিকর্ম 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের' জন্য নয়। কৃষিকর্মের মধ্যে নবীন সৃষ্টির আনন্দ আছে।

"আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।...
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।"

উপরোক্ত গানটি হলকর্ষণের সময় গাওয়া হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি 'অচলায়তন' নাটকের গান (সেই কারণে 'বিচিত্র' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত) এবং কেবলমাত্র চাষ করার আনন্দের থেকে কিছু বেশি কথা সেখানে বোঝানো হয়েছে। মাটির বুকের কঠিন লোহাকে ঘুম থেকে জাগানোর ('কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল

অচেতন') মত পৃথিবীকে দোহন করে তার থেকে রস আহরণ করার কথা, অচলায়তনে রূপকের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে বলা হয়েছে। ফলে নাটকে গানটি গভীর অর্থদ্যোতক হয়ে উঠেছে। ফসল কাটাও অনুরূপভাবে আনন্দের উৎসব।

"আয় রে মোরা ফসল কাটি।

মাঠ আমাদের মিতা ওরে, আজ তারি সওগাতে

মোদের ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে ॥"

'বৃক্ষরোপণ' উৎসব উপলক্ষে বৃক্ষ ও মানবের চিরন্তন প্রেমসম্পর্কের কথাই কবির মনে আসে। বৃক্ষ 'পথিকবন্ধু', সে 'মরুবিজয়' করে, করুণার পুণ্য দান করে ধূলিকে ধন্য করে। তাকে কবি 'প্রবল প্রাণ' বলে সম্বোধন ক'রে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন। গৃহাশ্রমজাত বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের সুগভীর স্নেহের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ যে কত নিবিড় ও গভীর হতে পারে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' সম্পর্কে সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন। গানে লিখলেন,

"আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—

মানবের স্নেহসঙ্গ নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্ ॥"

আবার বৃক্ষের সংস্পর্শে মানবমনেও আনন্দ সঞ্চারিত হয়।

"শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে চঞ্চল কলসংগীতে

দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায় প্রাণ-আনন্দ-কোলাহল ॥"

—আয় আমাদের

বসন্তোৎসবে যোগ দেবার জন্য গৃহবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন—

"ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।

স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।

দ্বার খোল্, দ্বার খোল্ ॥"

এই গানটিতে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা আছে এবং গানটি 'প্রকৃতি' পর্যায়ের অন্তর্গত, কিন্তু গানটি বসন্তোৎসবেই বিশেষ ভাবে গাওয়া হয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে বসন্তের বর্ণসমারোহ দেখে কবির মনে হয়েছিল—

'কে রঙ লাগালে বনে বনে'।

যিনি বনে বনে রঙ লাগালেন, তারই উদ্দেশে কবির অনুরোধ—

"রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে···

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে,

সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥"

পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক সংগীতগুলির সার্থকতা ওই বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেই নিহিত হয়ে নেই। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কবি এদের গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছেন। তাঁর জীবনতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্বের প্রতিফলনে আনুষ্ঠানিক গীতরচনাগুলিও চিরন্তন মূল্যে অভিষিক্ত হয়েছে।

অতঃপর বিচিত্র পর্যায়ের কিছু সংগীতকে ভাবধারা অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছে সাজিয়ে নিয়ে, সেগুলির ভাবসৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

১। 'বিচিত্র' বিভাগের অনেক গানে কবির বিশিষ্ট জীবনদর্শন ব্যক্ত। 'জোনাকি, কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ' গানটি সেই পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বিশ্বাস করতেন, এই পৃথিবীতে যে ছোটো, সে তুচ্ছ নয়। জগতের প্রতিটি সত্তারই নিজস্ব ভূমিকা ও সার্থকতা আছে। 'মিথ্যায় ঘেরে ছোটো কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে'।

এই ভাবনা তাঁর গানেও স্থানলাভ করেছে। সূর্য চন্দ্র যে প্রেরণায় আলো দেয়, জোনাকির অন্তরেও সেই একই প্রেরণা। সেই আলো তার 'আপন জীবন পূর্ণ' করা আলো। তার আন্তরশক্তির নিঃশেষ প্রকাশ সেই আলোয়।

"তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তাই ব'লেই কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো জ্বেলেছ ॥…
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ।"

নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ কর্তব্য নিঃশেষে পালন করাতেই জীবনের সার্থকতা, পূর্ণতা ও আনন্দ; বৃহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের একাত্মতাও সেইখানে। জোনাকির প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও প্রশংসা এইজন্যই উচ্ছ্বসিত।

"তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো সবায় আপন ক'রে ফেলেছ ॥"[১]

'সন্ধ্যাদীপের শিখা'রও সেই একই সার্থকতা। তার 'নির্জন উৎসবে' কোন কলরব নেই, পাখির আনন্দগান নেই। রবির আলোয় যখন নিখিল ভুবন জেগে ওঠে, তখন সে মিলিয়ে যায়। কিন্তু তবুও তার জীবনের একটা অর্থ আছে। অন্ধকারের ললাটে সে প্রেমের 'রাজটিকা' পরিয়েছে, আঁধারের সঙ্গে তার গভীর ও নীরব প্রেমের সম্পর্ক। তার জীবনের পূর্ণতাও সেখানেই। দিনের আলোয় সে ম্লান

---

১. স্বদেশের সেবায় ছোটোর দানও কম নয়, সে কথা বোঝাবার জন্য এই গানটিকে 'বাউল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্রষ্টব্য : 'স্বদেশপ্রেম' পরিচ্ছেদ

হতে পারে, কিন্তু রাতের অন্ধকারের বুকে তার আলোর স্পর্শ হর্ষ জাগায়— এই তো তার তৃপ্তি, তার আনন্দ।

জগতের ছোটো বড়ো সকলেরই যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা ও পূর্ণতা আছে, এই চিন্তা অন্যান্য গানেও প্রকাশিত। 'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা' গানে দেখি নদী চিরচঞ্চল, চিরমুখর; আর চাঁপাতরু অচঞ্চল, স্তব্ধ। কিন্তু চাঁপাগাছেরও একটা চলা আছে, প্রাণশক্তির গতি আছে। নদী চলেছে পথে পথে, আপন-হারা বেগে। আর চাঁপার চলা 'নবীন পাতায়', 'ফুলের ধারা'য়। প্রাণের প্রবল বেগে সে চলেছে, সে চলাকে বলে বোঝানো যায় না। বাইরের অচঞ্চল রূপ তার 'গভীর চলা'কে গোপন রাখে।

আমার চলা যায় না বলা— আলোর পানে প্রাণের চলা—
আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা॥"

পাখি যখন চাঁপাফুলকে বলে, 'কেন তুমি হেন নীরবে রও', ( পাখি বলে, চাঁপা ) তখন চাঁপা ফুল বলে তারও গান আছে, তারও ওড়া আছে। সেগুলি অলক্ষ্য, তাদের 'যায় না বলা'। গান গাওয়াতে যেমন পাখির সার্থকতা, পাখির আনন্দ — ফুলেরও সার্থকতা ও আনন্দ তার সৌরভে, তার সৌন্দর্যে। সেগুলিই ফুলের গান। পাখি অবাধ আকাশে উড়ে বেড়ায়, আর ফুল যে 'গন্ধ দিলে, হাসি দিলে,···ভালবাসা দিয়ে গেল', তাতেই তার মুক্তি, তার জীবনের সার্থকতা। সেই কারণেই ফুল বলতে পারে 'ধন্য আমি মাটির পরে'। এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব।

২। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে বন্ধন-মোচনের চিন্তা। তিনি বাঁধন-ভাঙার কবি। এই বাঁধন সামাজিক বিধিনিষেধ, আচার-আচরণ এবং স্নেহগ্রাসের বাঁধন। বাঙালি সমাজের অতি লালন, অতি স্নেহ এবং নিশ্চেষ্ট নির্জীবতার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ অনেক ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী'কে 'স্তন্যপায়ী জীব' বলেছেন এবং তার নির্জীব, নির্বীর্য, শ্রীহীন পশুজীবন অপেক্ষা 'আরব বেদুইনে'র দুরন্ত, নির্ভীক জীবনযাত্রা প্রণালীই অধিকতর কাম্য মনে করেছেন। প্রাণশক্তির আবেগে সামাজিক বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে হবে, বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—তবেই তো যথার্থ জীবন লাভ। তাই 'বঙ্গমাতা'র ( 'চৈতালি' ) প্রতি তাঁর আবেদন—

"শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।"

নিজেকেও তিনি 'লক্ষ্মীছাড়ার দলে'রই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

"আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করছি টলোমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো ফলাফল।"

এই লক্ষ্মীছাড়াদের পথে 'আপদ আছে, জানি আঘাত আছে', কিন্তু 'তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে'। যারা 'জীবন মৃত্যু'কে 'পায়ের ভৃত্য' ক'রে ভাবনাহীন চিত্তে এই পথে চলেছে, তাদেরই গৌরবগাথা কীর্তন করে কবি নিষ্প্রাণ বাঙালির 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' ও লজ্জা দূর করতে চেয়েছিলেন।—

"হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জানো ছলাকলা।...
ধরার যারা সেরা সেরা মানুষ তারা তোমার ঘরে—
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে।"

এবং

"রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তাবা ক্রীতদাস।"

তাই কবির প্রার্থনা—

"যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষ্মীছাড়াব সিংহাসনে।"

—'কল্পনা', হতভাগ্যেব গান

এই 'হতভাগ্য'রাই পারে বাঁধন ছিঁড়তে, কারণ এরা 'যৌবনেব দূত'। 'অচলায়তন' বা 'তাসের দেশ' ভেঙে ফেলতে এদেরই প্রয়োজন।

"আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—আমরা বিদ্যুৎ॥
আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত॥"

'তাসের দেশ' নাটক এই যৌবনের জয়গান। এরা লক্ষ্মীর বরপুত্র নয়, সব বাধা-বিপদ তুচ্ছ করে এরা এগিয়ে যায়। বলে,

"যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি, অলক্ষ্মীরে পাবই।...
যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু—
ভিটার কোণে হতাশমনে রইব না আর কভু॥"

এই নবীন যুবকেরা রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র, তাঁর অভিষ্ট বঙ্গসন্তান। 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' এদের 'বিচারের স্রোতঃপথ' গ্রাস করে ফেলে নি। 'দেশে দেশে দিশে দিশে' যে কর্মধারা সহস্রবিধ চরিতার্থতা লাভ করেছে, এরাই সেই কর্মধারার ধারক হতে পাবে।

"সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধা বাঁধন নেই গো নেই॥...
পাবি নাই-বা পাবি, নাহয় জিতি কিম্বা হারি—
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।"

'অচলায়তনে'র গান এটি। অচলায়তন ও তাসের দেশ নাটকের 'বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে'র এরা অগ্রদূত। এদের কাজ, খেলারই নামান্তর। 'ফাল্গুনী' নাটকে তাই ছেলের দল বলছে—

"মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই॥
খেলা মোদের লড়াই করা, খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই॥"

'যিনি সকল কাজের কাজী' এরা তাঁরই সঙ্গী। 'ফাল্গুনী'র একাধিক গানে জীবন ও যৌবনের জয়গান করা হয়েছে, হালকা হাসির ভঙ্গিতে। 'আমাদের পাকবে না চুল', 'আমাদের ভয় কাহারে' প্রভৃতি গানে 'হাসির ছলে' নির্ভীক যৌবনের গৌরব কীর্তিত। ভালমানুষী রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত নয়, দুর্দান্তের মধ্যেই আছে জীবনের লক্ষণ। 'ফাল্গুনী'র একটি গানে সে কথাই বলেছেন—

"ভালো মানুষ নইরে মোরা ভালো মানুষ নই—
গুণের মধ্যে ওই আমাদের, গুণের মধ্যে ওই॥
দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে—
পুঁথির কথা কই নে মোরা, উলটো কথা কই॥"

এই গানগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে হাসির গান বলে মনে হলেও বস্তুতঃ এগুলিতে কবিমনের 'গভীর কথা' ব্যক্ত। তাই এই গানগুলিকে পৃথক পর্যায়ভুক্ত করাই সমীচীন মনে হয়েছে।

৩। 'বিচিত্র' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি আত্মচিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণমূলক গান আছে। বিভিন্ন সময়ে কবিমনে বিভিন্ন আত্মচিন্তার যে স্ফূরণ ঘটেছিল এগুলি তারই প্রকাশ। কোথাও বলেছেন—

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।...
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি॥"

তাঁর উন্মুক্ত মন ও উন্মুক্ত চিত্ত কোন বাঁধনেই ধরা দিতে চায় না, কারণ তিনি 'চঞ্চল'। তাই বলেন—

'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।'

'সন্ধ্যা-আকাশ', 'বন্ধহারা নদী', 'যে কুসুম আপনি ফোটে, আপনি ঝরে'— তাদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা।

কখনও তিনি গানের মধ্যেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন।

"এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক না।
মন উড়েছে উড়ুক-না রে মেলে দিয়ে গানের পাখ্‌না॥"

রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রীতি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা গেছে। 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ', 'এই তো ভালো লেগেছিল', 'কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে' প্রভৃতি 'বিচিত্র' গানেও সেই মর্ত্যপ্রেম দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বের একটি প্রধান অঙ্গ, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবন সম্পর্কে অচ্ছিন্নতা ও চিরন্তনতার ধারণা। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় তিনি অনুভব করেছেন, পৃথিবীর জন্মের বহু পূর্বে তিনি সমুদ্রের অঙ্গে মিশেছিলেন, 'অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে'। আর, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটিতে বললেন এই বিশ্বপ্রকৃতি থেকে আপাততঃ বিদায়গ্রহণ করলেও—

"তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।"

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই নিরচ্ছিন্নতার চেতনাই তাঁকে অনন্ত আনন্দের

সন্ধান দেয়। কখনও মনে হয় 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর', আবার কখনও মনে হয়—

"শিশিরশিহর শরতপ্রাতে শিউলিফুলের গন্ধসাথে
গান রেখে যাস্ আকুল হাওয়ায়, নাই যদি রোস নাই র'বি ॥"

কারণ—

"এমন উষা আসবে আবার সোনায় রঙিন দিগন্তে,
কুন্দের দুল সীমন্তে।
কপোতকূজনকরুণ ছায়ায় শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়
তোমার গানের নূপুরমুখর
জাগবে আবার এই ছবি ॥"

—সকালবেলার আলোর বাজে

এই আনস্তিক চেতনা, অসীম অস্তিতির উপলব্ধিই কবির পরম চৈতন্য। কোথাও আক্ষেপ বা দুঃখ নেই।

এই ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্নতা বিশ্বপ্রকৃতিতেও বিদ্যমান। 'ফাল্গুনী' নাটকে কবি বলেছিলেন, যিনি নূতন তিনিই পুরাতন। সেই একই লোক নূতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি খেলছেন। তাঁর গায়ের চাদরখানার এক পিঠে শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; অন্য পিঠে সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী। বিশ্ব-প্রকৃতি ও নিজের জীবনকে মিলিয়ে নিয়ে, তাই কবি গাইলেন—

"আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥
তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন-বায়ে।"

সেইজন্যই 'দূর ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের বাঁশিতে'। যে মহাকাল দিন ফুরোলে কুসুম ঝরায়, সেই আবার তরুণের ভালে ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। যে কাল চলে গেছে, তাকেও আবার ফিরে পাওয়া যায়।

'নবীন চোখের চপল আলোয় সে কাল ফিরে পেয়েছি।'

একটি গানে কবি তাঁর দুই সত্তার পরিচয় দিয়েছেন।—

"যে আমি যায় কেঁদে হেসে তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠতেছি গান গেয়ে।
ও যে সচল ছবির মতো, আমি নীরব কবির মতো—
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।

এই-যে আমি ওই আমি নই, আপন-মাঝে আপনি যে রই,
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি, দৃপ্ত আমি,
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে ॥”

—যে আমি ওই ভেসে চলে

এর সঙ্গে মনে পড়ে ‘উৎসর্গ’ কাব্যের ২১ সংখ্যক কবিতা।

“যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদ ধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে।”

এখানে যে কবি-সত্তার কথা বলেছেন, তাঁর সঙ্গেই কবির একটি কর্মী-সত্তা ছিল। কিন্তু সেই কর্মী-সত্তা মাঝে মাঝে অবসর গ্রহণ করতেন।

“বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।”

—‘খেয়া’, বিদায়

‘তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে’ গানটিতে পাই অনুরূপ ভাবনার ইঙ্গিত। সেখানে, কর্মবিরতি গ্রহণ করে আপন সৃষ্টির মধ্যে মনোনিবেশ করতে চান কবি ‘তার আপন সুরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে।’ এই গানেও কবির দুই সত্তার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

এইভাবে দেখা যায়, কবির বিভিন্ন বিচিত্র চিন্তা গানে রূপায়িত হয়েছে। আত্মভাবনামূলক আরও অনেক গান আছে। সবগুলির পরিচয় দিয়ে রচনা অযথা ভারাক্রান্ত ও নীরস করা বোধহয় অনুচিত হবে। প্রজাপতি, নীরদবাহন জল, আকাশ, আলো, বিদ্যুৎ, নারী ও পুরুষের রূপগত ও চরিত্রগত পার্থক্য ও বিশেষত্বের বর্ণনা ( ‘তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও’ ) মেঘ ও চাঁদ প্রভৃতি কত বিভিন্ন বিষয় যে রবীন্দ্রসংগীতে স্থান পেয়েছে, তার পরিচয় আছে ‘বিচিত্র’ বিভাগের গীতরচনাগুলিতে। রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের মূল ভাবনাগুলির সঙ্গে এই

বহুবিচিত্র চিন্তাধারার সংযোগে, গীতবিতান সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। 'গান' সম্পর্কে যে সংগীতগুলি রচনা করেছেন কবি, সেগুলি 'পূজা' বা 'প্রেম' অংশের অন্তর্গত। সেগুলিকেও 'বিচিত্র' পর্যায়ভুক্ত করা যেত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, 'পূজা' পর্যায়ে আরও এমন কিছু গান আছে, যাদের 'পূজা' না ব'লে, 'বিচিত্র' পর্যায়ের গান বলতে ইচ্ছা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী', 'ওরে আগুন আমার ভাই', 'পাতার ভেলা ভাসাই নীরে' প্রভৃতি গান মনে পড়ে।

সর্বশেষে এ কথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে গীতবিতানের অন্যান্য শাখার তুলনায়, 'বিচিত্র'-শাখার গানগুলি সংখ্যায় ও ভাবসম্পদে ন্যূন তো নয়ই বরং এগুলির মূল্যবত্তাই হয়তো বেশি। কারণ এগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-ভাবকল্পনার ব্যাপকতা, উচ্চতা, বিচিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠতা বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত।

রবীন্দ্রসংগীত-সাগরে ডুব দিয়ে কত যে 'অরূপরতন' পাওয়া যায়, তার অন্ত নেই। ভাবনার এত বিভিন্ন ও বিচিত্র রসপ্রকাশ, মানবমনের এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির রূপায়ণ, আর কোথাও সম্ভব হয়েছে বলে জানি না। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের ভাববৈচিত্র্যের কথা রবীন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ স্মরণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-পদসাহিত্যের সঙ্গে সে বৈচিত্র্যের কোন তুলনা হয় না। মানবমনে তথা মানব-জীবনে এমন কোন ভাব বা উপলব্ধি নেই, যা রবীন্দ্র-গীতরচনায় প্রকাশ পায় নি। পরন্তু, তিনিই আমাদের নতুন করে ভাবতে, শিখতে, বলতে, বুঝতে শিখিয়েছেন। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ গান দিয়েই আমাদের চোখে দৃষ্টি দিয়েছেন, কানে শ্রুতি দিয়েছেন, মুখে ভাষা দিয়েছেন, মনে ভাব দিয়েছেন। তাঁর ধর্মচিন্তায়, প্রেমানু-ভূতিতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যোপলব্ধিতে, স্বদেশের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায়, এবং আরও বিভিন্ন ভাবচিত্র ও ভাবকল্পনায় আমাদের সমস্ত 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার' যেন খুলে গেছে এবং চিন্তাগুলিও এক নূতন অর্থে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, গানে এক অতীন্দ্রিয় রূপজগৎ যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কবিতায় ভাবপ্রকাশ এত গভীর ও ব্যাপক হওয়া সম্ভব নয়। আজকে যে কোন অনুভূতিকে প্রকাশ করতে হলেই রবীন্দ্রসংগীতের শরণ নিতে হয়। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের আর কোন কবি বা গীতকার আমাদের চিন্তা, ভাবনা ও উপলব্ধিকে এমন করে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভাবসমৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের গীতরচনাগুলি যথার্থই অতুলনীয়।

## তৃতীয় অধ্যায়

# রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের আঙ্গিকবিচার

সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই বিভিন্ন form বা রূপ থাকে, এবং ঐ বিশেষ রূপের মধ্য দিয়ে ঐ সাহিত্যের বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়। সেই কারণেই রচয়িতা বিভিন্ন জাতীয় মনোভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রূপের আশ্রয় নেন। এই রূপ কেবল বহিরঙ্গ রূপ নয়, সাহিত্যের অন্তরঙ্গ রূপেরও প্রকাশক। একটি দৃষ্টান্ত দিই।

সনেট, সাহিত্যের তথা কাব্যের একটি বিশেষ রূপ। সনেটে চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির সীমিত পরিসরের মধ্যে একটি মাত্র ভাব সংহত আকারে প্রকাশিত, এবং এই প্রকাশেরও কতকগুলি নিয়ন্ত্রণপ্রণালী আছে। সনেট সেইজন্য ঘনসংবদ্ধ কঠিন ইস্পাতখণ্ডের মতো। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় ( চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পত্র ১৫, ২২ এপ্রিল, ১৯১৩ )।

> "এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই—এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি···। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।"

বলা বাহুল্য, 'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট রচনাভঙ্গিতে যতটা তীক্ষ্ণধার হয়েছে, অন্যের হাতে হয়তো ততটা হত না। কিন্তু সাধারণ ভাবেই সনেটের একটা কাঠিন্য এবং সংহতি-স্বচ্ছতা থাকে। অন্যত্র, ( 'আধুনিক সাহিত্য', বিহারীলাল ) বিহারীলালের কবিপ্রতিভা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "সর্বদাই হু হু করে মন,
> বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
> চারি দিকে ঝালাফালা,
> উঃ কী জ্বলন্ত জ্বালা,
> অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন।
>
> আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে—কিন্তু তাহা বিরল—এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত

পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।"

অর্থাৎ গীতিকবিতার 'আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস' ব্যক্ত করবার জন্য বিস্তার প্রয়োজন ; তাকে সংক্ষিপ্ত করলে ভাবপ্রকাশ ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর কবিতার আঙ্গিক হিসাবে সনেটের সংক্ষিপ্ততা বেছে নেন নি।

গীতরচনায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটি ভিন্নতর আঙ্গিক গ্রহণ করলেন। গীতবিতানের গানগুলি সংক্ষিপ্ত, সংহত ; অথচ তার মধ্যে কবির বিভিন্ন অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা এমন সার্থকভাবে পরিস্ফুট, যা হয়তো বহুবিস্তারেও সম্ভব হত না। পক্ষান্তরে, আকারে ছোট হলেও গানগুলিতে সনেটের কঠিন সংহতি নেই। কিন্তু কবির হৃদয়াবেগ নিঃশেষে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গীতসাহিত্যে। এ সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র কলাকৌশলের সহায়তায়। কবি এমন ব্যঞ্জনাময় অলংকার-প্রয়োগ করেছেন, এমন ভাবসমৃদ্ধ শব্দচয়ন করেছেন, এমন তরঙ্গায়িত ছন্দোগঠন করেছেন যে, গানগুলি সুরের সাহায্য ব্যতীত কেবল বাণী অংশের সাহায্যেই অনির্বচনীয় ভাবলোকে উত্তীর্ণ হয়। গীতরচনাকে আর 'পাখাছেঁড়া প্রজাপতি'র মতো অ-পূর্ণ মনে হয় না।

রবীন্দ্রসংগীতের দুই দিক — ভাববস্তু ও শিল্পকলা। সকল কাব্যেরই এই দুই দিক। শিল্পকলাই কাব্যের প্রাণ। শিল্প বাদ দিলে যা থাকে, সে কেবল বক্তব্য, নিষ্প্রাণ গদ্য; তাকে জড়বস্তু বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের গানে এই শিল্পকলার প্রকাশ, সাধারণ কবিতার চেয়ে অনেক বেশি। শব্দনির্বাচন করা হয় ভাবমূর্তি ও ধ্বনিমূর্তি গঠনের জন্য। ছবিতে যেমন রেখা ও রঙ, কাব্যে তেমনই ভাব ও ধ্বনি — এরা অবিচ্ছেদ্য। রেখা ও রঙে যেভাবে ছবির প্রাণ ও সজীবতা ফুটে ওঠে, কাব্যে বিশেষতঃ গীতরচনায়, শব্দ ও তার ধ্বনি সেই ভাবেই রচনাকে সজীব ও গতিময় করে তোলে। শব্দের দ্বারা তৈরী হয় নানা ভাবচিত্র ( imagery ), তার বিভিন্ন ভঙ্গিকে বলা যায় অলংকার, ইংরেজিতে যাকে বলে figure of speech, অর্থাৎ বাঙ্‌মূর্তি। এই বাঙ্‌মূর্তির বহু বিচিত্র প্রকাশ সম্ভব। ছন্দেরও একই প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন—

"মানুষের সত্তার মধ্যে···অনুভূতিলোকই হচ্ছে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠছে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্ছে। এইজন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভরতি হয়

তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।"

—'ছন্দ', ছন্দের অর্থ, প্রথম পর্যায়

এই গতিই ছন্দ। কথাকে ছন্দে বাঁধলেই, কথা তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তিলাভ করে। গানের সুর যেমন গানের কথাকে চিরন্তনতার রাজ্যে মুক্তি দেয়, কবিতার ছন্দও তেমনি চিত্তের আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং বিচিত্র আকারে মুক্তি দেয়। সেখানেই ছন্দের ও সুরের সার্থকতা। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ ছন্দের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"কাব্যসাহিত্য কেবল রসসাহিত্য নয়, তা রূপসাহিত্য। সাধারণত ভাষায় শব্দগুলি অর্থবহন করে, কিন্তু ছন্দে তারা রূপগ্রহণ করে।"

—'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি

মানুষের দেহে, মানুষের ভাষায় তথা বিশ্বের ভাষায় রূপদান করাই ছন্দের কাজ। ছন্দ যেন বিশ্বের রূপকার।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য'। ছন্দ সম্পর্কে এ কথা বললেও, শব্দপ্রয়োগ ও অলংকার সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। বস্তুতঃ শব্দ, ছন্দ এবং অলংকার প্রয়োগেই সাহিত্য প্রাণ পায়, শিল্পকলার সাহায্যেই ভাববস্তু রূপলাভ করে; নতুবা সে হত নিছক 'সংবাদ'।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষতঃ রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যে, এই শিল্পকলার বিশেষ মূল্য আছে। কারণ রবীন্দ্রসাহিত্যের আর কোন শাখায় শিল্পকলা এতখানি উৎকর্ষ লাভ করে নি। সেই কথা মনে রেখে বর্তমান অধ্যায়টিকে ভাষা ও ভাবানুষঙ্গ, ছন্দ এবং অলংকার—শিল্পকলার এই তিনটি মূল ধারা অনুসারে বিভক্ত করে আলোচনা করা গেল।

## ভাষা ও ভাবানুষঙ্গ

পূর্বেই বলা হয়েছে, ভাষা ও শব্দসম্পদ শিল্পকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য কবি তির্যক শব্দ ব্যবহার করেন। আবার অন্য জাতীয় তির্যক শব্দও ব্যবহার করা হয়, যার দ্বারা অন্য কোন বিষয়ের ভাবানুষঙ্গ ( allusion ) সূচিত হয়। সেই জাতীয় ইঙ্গিতময় শব্দ ব্যবহারের দ্বারাও কবির বহু কথা বলবার প্রয়োজন কমে যায়। গানে এই জাতীয় ভাবানুষঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মনোভূমি রচনায় তাঁর পারিপার্শ্বিক, বিশেষ করে তাঁর বাড়ির সাহিত্যিক আবহাওয়ার দান অপরিসীম। সেই কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন ( 'জীবনস্মৃতি', অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ) —

"বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.।···অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না।·· সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।"

এইভাবেই তাঁর ইংরেজি এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষতঃ কালিদাস ও জয়দেবের সাহিত্যরসও তিনি অপর্যাপ্ত রূপে পান করেছিলেন। অল্পবয়সের এই সাহিত্যচর্চা তাঁর সাহিত্যজীবনে বিফল হয় নি। রবীন্দ্রনাথ এই দেশী ও বিদেশী সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে প্রভূত পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেছেন। সেই ঋণ রূপগত এবং ভাবগত। সেই ঋণের স্বরূপই বর্তমান আলোচনার বিষয়।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন ভাবানুষঙ্গের আলোচনায় অনেক সময় মূল ভাবসম্পদ ও ভাবানুষঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সে ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের পাশা-পাশি মূল ভাবসম্পদকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## রামায়ণ, মহাভারত

ভারতবর্ষের দুটি প্রধান মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

"রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে,···রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।···ইহার সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।"

—'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ

রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে কবির এই মনোজ্ঞ বিচার প্রবন্ধের বিষয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি রামায়ণ, মহাভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাদের নিত্য-নূতন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের উপর নব নব আলোকরশ্মিপাত করে

তাদের নবরূপ দান করেছেন। এই দুই মহাকাব্য থেকে প্রত্যক্ষতঃ উপকরণ সংগ্রহ করে, তিনি 'অহল্যার প্রতি' ('মানসী'), 'পতিতা' ('কাহিনী'), 'বিদায়-অভিশাপ', 'কচ ও দেবযানী', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' প্রভৃতি কবিতা ও কাহিনীকাব্য রচনা করেন। রামায়ণ, মহাভারতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব তাঁর বহু রচনাতেই আছে।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া—এই দুটি গীতিনাট্য রচনা করেন। এই দুটি গীতিনাট্যে যথাক্রমে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ' এবং 'পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাংপ্রতম্' ইত্যাদি রামায়ণের দুটি শ্লোকও উৎকলিত আছে। তবে বাল্মীকিপ্রতিভার কাহিনী রামায়ণ থেকে নেওয়া হলেও, তার প্রেরণা পান কবি অন্যত্র।

> "বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা-নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম।···সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন-কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।"
>
> —'আধুনিক সাহিত্য', বিহারীলাল

সেই কারণেই এই গীতিনাট্যে রামায়ণ কাহিনী কিছুটা পরিবর্তিত।

মহাভারতের কাহিনী গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য রচনা করেন (১২৯৯), এবং পরে একে নৃত্যনাট্যের রূপ দেন। সেখানে মহাভারতের মূল কাহিনার সঙ্গে কবি স্বকীয় কল্পনা ও প্রেমাদর্শ মিলিয়ে, তাকে এক নবতর দীপ্তি দান করেছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের মতে চিত্রাঙ্গদা নাটকের প্রেমাদর্শে কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।[১]

এ ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রামায়ণ, মহাভারতের উল্লেখ, ভাবানুষঙ্গ বা ঐ দুই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিনামের ব্যবহার পাওয়া যায়। কবির কল্পনায় স্বর্ণমৃগ বা মায়ামৃগ কল্পনার ছায়াপাত ঘটেছিল।

"তোরা যে যা বলিস ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।
ও সেই মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই॥"

কিংবা

"এবার, সখী, সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা, আয় সবে আয় ত্বরা॥"

১. দ্রষ্টব্য: ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'এরী', ১৩৬৪, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬২, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস

অন্যত্র আছে ( নূপুর বেজে যায় )—

"পারুল শুধাইল, কে তুমি গো,
অজানা কাননের মায়ামৃগ।"

'হাসির মায়ামৃগী' প্রভৃতি টুক্‌রো উল্লেখও বহু আছে।

অপর একটি গানেও পাই রামায়ণের ভাবানুষঙ্গ—

"ফিরে ফিরে আমায় মিছে ডাকো স্বামী,—
সময় হল বিদায় নেব আমি ॥
অপমানে যার সাজায় চিতা
সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা।...
তুমি থাকো সোনার সীতার অনুগামী।"

জাতীয় সংগীতে প্রাচীন ভারতের মহিমা বর্ণনা করে, দেশের বর্তমান দুর্গতির জন্য কবি আক্ষেপ করেছেন। সেখানেও রামায়ণ, মহাভারতের কথা তাঁর স্মরণে এসেছে।—

"আয় বিষাদিনী বীণা, আয় সখী, গা লো, সেই-সব পুরানো গান—
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দে-না লো আঁধার প্রাণ ॥...
আমি অর্জুনেরে—আমি যুধিষ্ঠিরে করিয়াছি স্তনদান।
এই কোলে বসি বাল্মীকি করেছে পুণ্য রামায়ণ গান।"

## কালিদাস-জয়দেব

রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সেই কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ পাঠ করেছিলেন। গীতগোবিন্দ ও কুমারসম্ভবের ছন্দের দোলা তাঁর কিশোর মনকে নাড়া দিয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁদের পরিবারে কালিদাসের সাহিত্য-চর্চার প্রচলন ছিল খুব বেশি। ক্রমশঃ কালিদাসের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড়তর হয়।

প্রবন্ধে, পত্রে, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস ও কালিদাসের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা, বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের নবভাষ্য ও নবরূপ দান করেছেন। বারবার তিনি ফিরে গেছেন কালিদাসের কালে, বাস্তবে না হলেও 'স্বপ্নে'। 'কালিদাসের কালে' জন্ম নেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। গানে প্রত্যক্ষতঃ কালিদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ শব্দব্যবহারে, ভাবের অনুষঙ্গে কালিদাস এবং জয়দেবের রচনায় ছায়াপাত পুনঃপুনঃ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর কতকগুলি বহুব্যবহৃত প্রিয় শব্দ কালিদাস-জয়দেবের রচনা থেকেই পাওয়া। নীলাঞ্জনছায়া, নীপ, কদম্ব, তমাল, তাল, প্রভৃতি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, প্রধানতঃ বর্ষার গানে। কারণ বৈষ্ণব পদাবলীর মতই কালিদাসের 'মেঘদূত'ও বর্ষার কাব্য। তাই বর্ষার অনুষঙ্গে মেঘদূত ও বৈষ্ণব পদাবলী দুই-ই কবির মনে জেগে ওঠে।—

"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।
আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।···
চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কারা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরানে।
যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ,
সেদিনও এমনিতর অন্ধকার দিন।"

—'মানসী', একাল ও সেকাল

সেইজন্যই গানে বলেন—

"নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে,
ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব তাহার বারতা কি পেলে॥···
লুপ্ত তারার পথে চলে কাহার সুদূর স্মৃতি
নিশীথরাতের রাগিণী বহি।
নিদ্রাবিহীন ব্যথিত হৃদয়
ব্যর্থ শূন্যে তাকায়ে রহে॥"

মেঘের মধ্যে শুনতে পান 'বাজে কার কামনা'। বর্ষার বাতাস 'যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা' বয়ে আনে। এই সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত একটি গান পুনরায় স্মরণ করি।

"বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে॥"

শুধু বর্ষার অনুষঙ্গেই নয়, প্রেমের চিরন্তন বিরহবেদনার মধ্যেও কবি প্রিয়া-বিচ্ছেদকাতর যক্ষের হৃদয়ব্যথার সন্ধান পান।

"হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব,
নীরবে জাগ একাকা শূন্যমন্দিরে দীর্ঘ বিভাবরী—
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া॥
স্বপনরূপিনী অলোকসুন্দরী অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে।"

যক্ষ এখানে চিরন্তন 'বিরহী'র রূপ ধারণ করেছে, যক্ষপ্রিয়া 'স্বপনরূপিণী অলোক-সুন্দরী'র রূপ পরিগ্রহ করেছে। কালিদাসের কালে নারীদের প্রসাধন, অঙ্গাভরণ এবং তাদের অবসরবিনোদনের চিত্র ও বর্ণনা আছে 'ক্ষণিকা'র 'সেকাল' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের গানেও আছে অনুরূপ বর্ণনা।—

"কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী।
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে॥"

—ওই আসে ওই

সমগ্র গানটিই ('কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতা) বর্ষায় প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা এবং বর্ষার আহ্বান-উৎসবের বর্ণনা। মেঘদূতে বর্ণিত প্রাচীন ভারতের চিত্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। এমন-কি এর উপমা, চিত্রকল্প ও ভাবকল্পনার বহু ক্ষেত্রেই মেঘদূতের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপ-ভাবেই কবি 'জনপদবধূ'দের আহ্বান করেছেন অন্য গানে—

"এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে ॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজলনয়নে, যূথীমালা গলে ॥"

বর্ষার গানে বিশেষতঃ বর্ষার বর্ণনায়, প্রায় সর্বত্রই কদম্ববন, জম্বুপুঞ্জ, নীপকুঞ্জ, তমাল-অরণ্য, নীপবীথি, যূথীবন, কেতকী, মালতী, তালের বন, রেবানদী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার ফলে পাঠকমনে কালিদাস-জয়দেবের কালের বর্ষা-রূপের চিরন্তন সংস্কার জেগে ওঠে। একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে কালিদাস-ব্যবহৃত শব্দাবলী সাজিয়ে যেন মেঘদূতের বর্ষার রূপটিই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন।—

"নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ ॥
মন্থর নব নীলনীরদ- পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহ কান্তারে ॥"

মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, কুরুবক, করবী, লোধ্র, অশোক প্রভৃতি ফুলের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। রবীন্দ্রসাহিত্যে এবং রবীন্দ্রসংগীতেও এগুলি বহুব্যবহৃত। কবির ভাষাতেই বলা যায়, তাঁর গানে যেন—

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা।"

—ওই আসে ওই

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য অথবা নৃত্যনাট্যের প্রেমাদর্শে কুমারসম্ভবের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শুধু প্রেমাদর্শ নয়, ঘটনা ও দৃশ্য-পরিকল্পনাতেও কুমারসম্ভবের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য-মহিমা ও তপোবনের আদর্শের প্রতি কবির সশ্রদ্ধ মনোভাব ও বিশেষ আকর্ষণ, প্রধানতঃ কালিদাসের কাব্যপাঠের ফল। শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের প্রভাবে কবির কিশোর মনেই তপোবনের স্বপ্নময় চিত্র অঙ্কিত হয়ে যায়। তাই তিনি বলেছিলেন—

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।

পরিণত বয়সে তপোবনের আদর্শেই তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতলক্ষ্মীর অসীম ঐশ্বর্যবর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'প্রথম সামরব তব তপোবনে'। তাঁর সংকল্প—

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব॥"

—হে ভারত আজি

কালিদাস তাঁর একাধিক কাব্যে ও নাটকে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের বর্ণনা দিয়েছেন; যার ফলে সকল কালিদাস-পাঠকই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ভারতের নবনবোন্মেষশালিনী ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপবর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষারকিরীটিনী।"

—অয়ি ভুবনমনোমোহিনী

একেও কালিদাসের রচনার পরোক্ষ প্রভাব বললে হয়তো অন্যায় হবে না। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাচীন ভারতবোধ ও ইতিহাসদৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা-উৎস ছিল কালিদাসের কাব্য।[১]

## পুরাণ

"বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের পৌরাণিক কাহিনী আর-কোনো কাজে লাগে না; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুরাতন হইল না। মানুষের নবীন বিশ্বানুভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়া আনাগোনা করিয়া ঐখানে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।"

—'পথের সঞ্চয়', কবি য়েট্‌স্‌

কালিদাস, ভবভূতি থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিরা কেউই এই প্রাচীন ঐতিহ্যভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণে বিরত থাকেন নি। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের দলবর্তী। তবে, তিনি শুধু পুরাণের নবরূপায়ণেই ক্ষান্ত হন নি, পুরাণ কখনও কখনও তাঁকে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। আবার, তিনি পুরাণের ভাববিবর্তনের প্রতিও সচেতন দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তাই পুরাণের

১. দ্রষ্টব্য: শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬২, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস

উদ্‌ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী তাঁর ভাবকল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। গানেও তার পরিচয় আছে। নিম্নে তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল।

শিব : শিবের ভাবাদর্শের প্রতি রবীন্দ্রচিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট ছিল। হয়তো সে ক্ষেত্রে তিনি কালিদাসেরই যথার্থ উত্তরসূরী, তথাপি এ কথাও বলতে হয় যে, রবীন্দ্রভাবনায় শিবের যত বিচিত্র রূপ ও প্রকাশ, তা হয়তো কালিদাসের কল্পনাতেও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, নাটকে ও প্রবন্ধে শিবের বিচিত্র রূপকল্পনা বাংলা সাহিত্যকে উদ্‌ভাসিত করেছে। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বভুবনই শিবের রুদ্রনৃত্যের সৃষ্টি বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর নাচের তালের সঙ্গে কবি নিজের জীবনের তালকেও মিলিয়ে নিতে চান।

> "পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়।···নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।"

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', পাগল

গানে বলেছেন—

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে॥···
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,···
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত-ভরুক চিত্ত মম॥"

—নৃত্যের তালে তালে

রবীন্দ্রনাথের শিবকল্পনার চরম পরিণতি তাঁর 'নটরাজ' নাট্যকাব্যটিতে। এই কাব্যের মর্মকথা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন—

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।"

—'নটরাজ', ভূমিকা

সেইজন্যই নটরাজ যখন 'আপন ভুলে' 'প্রলয়নাচন' নাচলেন, তখন—

"জাহ্নবী তাই মুক্ত ধারায় উন্মাদিনী দিশা হারায়"

এবং

"রবির আলো সাড়া দিল আকাশ-পারে,
শুনিয়ে দিল অভয় বাণী ঘর-ছাড়ারে।"

—প্রলয় নাচন নাচলে যখন

বহিরাকাশে রূপলোকের এই আবর্তনের সঙ্গে, অন্তরাকাশে রসের উন্মেষের কথাও গানে বললেন—

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে!
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণপবনপরশে সরস্বতীর মানসসবসে···
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমলকমলগন্ধ হে॥"

'মহাকালের বিরাট নৃত্যচ্ছন্দ'কে তিনি আপন অন্তরে গ্রহণ ও বরণ করতে চেয়েছেন।

'জাগো, মৃত্যুঞ্জয়, চিত্তে থৈ থৈ নর্তননৃত্যে'।

এই নৃত্যের দোলায় যে সংসারের সকল উত্থান পতনই ঘটছে—সে কথা অন্য গানেও বলেছেন—

"নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে··· ।"

—মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

শুধু শিবের নৃত্যরত রূপই নয়, তাঁর ভিন্নতর রূপও কবির কল্পনায় জেগেছিল।

"কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে,···
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ওই-যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে ॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।···
এই তালে তোর গান বেঁধে নে—কান্নাহাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে।"

শিবের নটরাজ-রূপের প্রতি ছিল কবির একান্ত পক্ষপাত ( 'যদি মাতে মহাকাল উদ্দাম জটাজাল' )। কিন্তু 'দেবাধিদেব মহাদেব', 'জয় ভৈরব জয় শংকর', 'মহাবিশ্বে মহাকাশে', 'হে মহাপ্রবল বলী' প্রভৃতি গানে শিবের অন্যান্য নামরূপেরও উল্লেখ আছে। রুদ্র, ভৈরব, শংকর, প্রলয়ংকর, মহাদেব, ডম্বরু, পিনাক প্রভৃতি শব্দে আছে শিবভাবনার পরোক্ষ উল্লেখ। এগুলি যেন কবির মনে শিব সম্পর্কে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি।'

উপমা ও অলংকার ব্যবহার করতে গিয়েও কবিমনে বারবারই শিবের চিত্রকল্প আসে। 'তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী', কিংবা 'গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা' প্রভৃতি। একটি গানে শিবের রুদ্ররূপের বর্ণনা আছে—

"পিনাকেতে লাগে টঙ্কার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার ॥
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার ॥"

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী : বিষ্ণুর কথা নানা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন বহু প্রবন্ধে। গানে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের কথা আছে — অলংকারের প্রয়োজনে। 'মেঘে অধীর আকাশ কেন ডানা-মেলা গরুড় যেন' অথবা 'গরুড়ের পাখা রক্তরবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে' প্রভৃতি অংশ তার দৃষ্টান্ত।

লক্ষ্মী রবীন্দ্রকল্পনায় নারীর কল্যাণী মূর্তি। নারীর যে চিরন্তন শাশ্বত মঙ্গলরূপ কবির মানসচক্ষে নিয়ত জাগরূক ছিল, এবং যার কথা বলতে 'কবির কথা' ফুরোয়, রবীন্দ্রচিন্তায় সেই নারীরই প্রতিশব্দ লক্ষ্মী।

"বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে

তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে। লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ।"

—'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

ধরণীর কল্যাণমূর্তিকেও কবি সেই লক্ষ্মীরূপের সঙ্গে 'এক করে দেখেছেন। তাই বলেছেন,, 'শারদলক্ষ্মী', 'হেমন্তলক্ষ্মী', 'নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা'। কল্যাণ, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতীক এই লক্ষ্মীকে নিজের মধ্যে ধারণ করবার আগ্রহ কবির ছিল।

"লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। ···তুমি এই জগতের শীর্ণ কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ।"

—'আলোচনা', লক্ষ্মী

তাই গানে বললেন,—

"লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই ?
দেখ্‌রে চেয়ে আপন-পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই॥"

'লক্ষ্মীরে হারাবই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই', 'লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনেপুত্রে উঠুন ফুলি', 'হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই' প্রভৃতি অংশে ভিন্নতর অর্থে লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। বাল্মীকিপ্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ একটি লক্ষ্মী চরিত্র অঙ্কন করেছেন, সে কিন্তু পূর্বোক্ত লক্ষ্মীর রূপ নয়। সেই লক্ষ্মী যথার্থ ই সম্পদের দেবী, তাই কবি তাকে কামনা করেন না।

শিবের মত দুর্গারও বিভিন্ন রূপ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে প্রত্যেক রূপ এবং রূপভেদে প্রকৃতিভেদ প্রদর্শিত হয়েছে। গানে তিনি স্বদেশজননীকে দেখেছেন দুর্গার মূর্তিতে।

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুন বরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!"

—আজি বাংলাদেশের

'প্রকৃতিপ্রেম' (রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের ভাবসম্পদ্‌) সম্পর্কে আলোচনায় দেখানো গেছে, 'তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে' গানটিতে শরৎপ্রকৃতি ও দুর্গার অসুরদলনী সংহারমূর্তি কবিকল্পনায় কি ভাবে মিলে গেছে।

দুর্গার কালীরূপও কবির কাছে অনাদৃত ছিল না। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন একটি প্রবন্ধে[১] দেখিয়েছেন রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালী "খনও কখনও শান্ত মাতৃমূর্তিতে

১. 'রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ', সম্মেলনী পত্রিকা, ১৩৭৪, আশ্বিন

আবির্ভূতা। তাঁর মতে 'সন্ধ্যা হল গো— ও মা, সন্ধ্যা হল বুকে ধরো' গানটিতে মাতৃরূপা কালীর কল্পনা অনতিপ্রচ্ছন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

"সন্ধ্যা হল গো— ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো ॥···
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনসাঁঝের রশ্মিরেখা।"

তিনি মন্তব্য করেছেন, এখানে 'কালো স্নেহ', 'তোমার রাত', 'তোমার আঁধার' প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে স্নেহরূপা কালীর কথাই ব্যক্ত। এখানে কালী মাতৃরূপা এবং মৃত্যুরূপা। তবে এই মৃত্যু শান্তিময়ী, করালী নয়। তার কোলে গিয়ে জীবনের জ্বালা জুড়োয়।

কোথাও আবার আভাসে কালীর প্রলয়কারিণী রূপের কথাও কবির স্মরণে এসেছে।

"আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, অতি গম্ভীর নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ংকরী শঙ্করী নাচে।"

—বিশ্ববীণারবে

রবীন্দ্রকল্পনায় বীণাপাণি সরস্বতীর একটি বিশেষ স্থান আছে।

"মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমলবনমাঝে ॥
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি অমৃতমুরতিমতী বাণী
হিরণকিরণ ছবিখানি— পরানের কোথা সে বিরাজে ॥"

রবীন্দ্রকল্পনায় শরৎঋতু অনেক ক্ষেত্রে দেবী শারদার সঙ্গে একীভূত (অবতারণা: প্রাচীন বাংলা গীতসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার)। আবার অনেক জায়গাতেই 'শরতের অমল মহিমা', অর্থাৎ শরতের প্রাণরূপকে কবি সারদাদেবীর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। তাই শরতের বহু গানে 'বীণার তারে'র কথা আসে। শারদলক্ষ্মীর বর্ণনাও দেখি সরস্বতীমূর্তির মত।

"এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীলপথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বনগিরিপর্বতে—
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেতশতদল শীতল-শিশির-ঢালা ॥

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার সোনার বীণার তারে
মৃদুমধু ঝংকারে,
হাসি-ঢালা স্বর গলিয়া পড়িবে ক্ষণিক অশ্রুধারে।"

—আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ

সেইজন্যই বলেন—

"শরতবাণীর বীণা বাজে কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলিতলে।"

—আলোর অমল কমলখানি

শরৎঋতুর আগমনে ধরণীতে যে আনন্দধ্বনি জেগে ওঠে, সে দেবতার আগমনেরই বন্দনাগান।

"উদয়-অচলতল সাজিল নন্দন, গগনে গগনে বনে জাগিল বন্দন,
কনককিরণঘন শোভন স্যন্দন—নামিছে শারদসুন্দরী।"

—পোহালো পোহালো বিভাবরী

এই 'শারদসুন্দরী' দেবী দুর্গাও হতে পারেন, দেবী বীণাপাণিও হতে পারেন। বিহারীলালের শিষ্য হিসেবেই হক, বা কবির স্বভাবধর্মবশতঃই হক, সারদার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইষ্টদেবীকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করেছেন—'বিরহের বীণাপাণি', 'সরস্বতীর মানসসরসে' প্রভৃতি কাব্যাংশে তারই পরিচয়।

এ ছাড়া ইন্দ্র, বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার কথাও রবীন্দ্র-গীতরচনায় পাওয়া যায়। 'কোন্ বলরামের আমি চেলা', 'খড়্গ তোমার হে দেব বজ্রপাণি', 'স্বর্গে মর্তে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র', 'ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা', 'ইন্দ্রপুরীর কোন রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালো' প্রভৃতি বহু অংশ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে একটি মদনচরিত্র পরিকল্পনা করেছেন কবি।

## বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বুদ্ধদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব তাঁর উক্তি দিয়েই সপ্রমাণ করা যায়।

"আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।"

—'বুদ্ধদেব'

"এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,...
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।"

—'জন্মদিনে', ৬, কাল প্রাতে

বুদ্ধের ক্ষমা, শান্তি, ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শের সঙ্গে ছিল রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মের সাদৃশ্য ও সাযুজ্য। পৃথিবীতে যেদিন লালসা, ধ্বংস, দুরাচার ও ষড়যন্ত্রের ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসে, সেদিন কবি 'জনগণদুঃখত্রায়ক' হিসেবে বুদ্ধদেবকেই আহ্বান জানান—

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ॥
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।...
দেশ দেশ'পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণপাণি—
তব শুভসংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য॥"

বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ প্রেমমুখী, তার অহিংসা ও করুণার বাণী স্বভাবতঃই মানবধর্ম ও মৈত্রীধর্মের উপাসক রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল।

একসময় মহাঐক্য ও মহামৈত্রীর বাণীই ছিল মহান্ ভারতের বাণী। সেই ভারত আত্মবিস্মৃত হয়ে যখন পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত, তখন স্মরণ করতে হয় 'মহাজনশরণ্য' বুদ্ধকেই।

"চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।

খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।"

—'পরিশেষ', বুদ্ধদেবের প্রতি

তাই গাইলেন—

"সকলকলুষতামসহর, জয় হোক তব জয়—
অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিলভুবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম॥
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমিররাতি—
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর' ভয়॥
মোহমলিন অতি-দুর্দিন-শঙ্কিত-চিত পান্থ
জটিল-গহন-পথসংকট-সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
[illegible]ময়, মাগি শরণ— দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়।"

বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই মানবধর্মের পূজারী। উভয়েই মানুষের মনুষ্যত্বকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম সর্বমানবের সমতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ ওই ধর্মের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল। আর, বৌদ্ধ অহিংসানীতির সঙ্গেও যে তাঁর সহানুভূতি, তার প্রমাণ 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' গ্রন্থদুটি। পশুহিংসাকেও রবীন্দ্রনাথ সমান ঘৃণার চোখে দেখতেন। বৌদ্ধধর্মের সংঘ-সংহতির প্রতি সংহতি-শক্তির উপাসক রবীন্দ্রনাথ [illegible]ার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।[১]

বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'পরিশোধ', ( এই কবিতাটির বিষয় অবলম্বনেই 'পরিশোধ' নাট্য-গীতি এবং পরবর্তী কালে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য রচিত হয় ), 'মূল্যপ্রাপ্তি', 'মস্তকবিক্রয়', 'নগরলক্ষ্মী' প্রভৃতি কবিতা এবং 'মালিনী', 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা'—এই কাব্য এবং নাটিকাগুলি রচনা করেন। বুদ্ধদেব-সম্পর্কিত কবিতা 'বোরোবুদুর', 'সিয়াম' ( প্রথম দর্শনে ), 'বুদ্ধদেবের প্রতি' প্রভৃতি।

---

১. দ্রষ্টব্য: শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬২, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি'

'চণ্ডালিকা'র কাহিনীটি মূল বৌদ্ধসাহিত্য থেকে মোটামুটি অপরিবর্তিত রূপে গ্রহণ করলেও, উপসংহারে কবি চণ্ডাল-কন্যা 'প্রকৃতি'কে উন্নততর মহিমা দান করেছেন। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে বজ্রসেন শ্যামাকে আঘাত করে ফিরিয়ে দিলেও, তার হৃদয় অনুতাপে ভরে উঠেছে—

"ক্ষমিতে পারিলাম না যে ক্ষম হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।"

আর, 'নটীর পূজা'য় শ্রীমতীর আত্মদানেই নাটকের শেষ হয় নি, সে আত্মদান এক নিগূঢ় অর্থে ও তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে কবি ব্যাখ্যা করেছেন—

"বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।"

—'আত্মপরিচয়', ষষ্ঠ প্রবন্ধ

নটী তাই গেয়েছে—

"আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো, তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে।...
কানন হতে তুলি নি ফুল, মেলে নি মোরে ফল।
কলস মম শূন্যসম, ভরি নি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা হৃদয় ঢালে অধরা ধারা—
তোমার চরণে হোক তা সারা পূজার পুণ্য কাজে।
বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সংগীতে বিরাজে॥"

এ জাতীয় ভাবনার সাক্ষাৎ বৌদ্ধ কাহিনীতে পাওয়া সম্ভব নয়। বৌদ্ধ কাহিনী রবীন্দ্রসাহিত্যে নবতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে, নবমূল্যায়নে মূল্যায়িত হয়েছে।

রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যে বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে প্রতিফলনের পরিচয় পাই বস্তুতঃ তাকে 'আঙ্গিক' না বলে মূল ভাবসম্পদের অন্তর্গত বলাই ভাল। তবে, এর মধ্যে বৌদ্ধ সাহিত্যের উপাদান ও ঋণ গৃহীত হয়েছে বলে, একে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না করে তৃতীয় অধ্যায়-ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে ভাবানুষঙ্গ ও ভাবসম্পদ অচ্ছেদ্য।

## বৈষ্ণব গান

চৈতন্যদেবের প্রভাবে ও প্রেরণায় উদ্ভূত বৈষ্ণব পদাবলী এবং পদাবলীকীর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

"বাংলার সে এক গৌরবের দিন।…তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর…।"

—'চিঠিপত্র', পত্রসংখ্যা ৬

অন্যত্র আছে ( 'সংগীতচিন্তা', সুর ও সংগতি, ৬ জুলাই, ১৯৩৫ )—

"বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ।…বাঙালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্ ম্যুজিক ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে না।"

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্যের এক পরম শুভক্ষণে। সেই মহাসন্ধিক্ষণে বাংলায় যে পদসাহিত্যের উদ্ভব হয়, তা 'বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত'— ভাবে ও ভাষায় অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ সহজাত সহৃদয়তার বশে কৈশোরেই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হন। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে একটি পত্রে ( ১৩২৮, কার্তিক ১৪ ) তিনি লিখেছিলেন—

"বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরী করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।"[১]

উপনিষদের প্রতি আকর্ষণ পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হলেও, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ একেবারেই তাঁর নিজস্ব— তবে এর পশ্চাতে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব অবশ্যই কিছুটা আছে।

কৈশোরের এই আসক্তি যৌবনে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ছিন্নপত্রাবলীতে দেখি বৈষ্ণব পদসাহিত্য ব্যতিরেকে তাঁর পক্ষে দিনযাপনই ছিল প্রায় অসম্ভব। হয়তো তার বিশেষ কারণও আছে। ছিন্নপত্রাবলীর যুগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন

---

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮৮০ শকাব্দ, বৈশাখ-আষাঢ়

উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে, রবীন্দ্রকাব্যে তখন প্রকৃতিপ্রেমের জোয়ার। আর, প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই যে কবির মনে 'বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার' এনে দেয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিতরে কবি বৈষ্ণবের 'অনন্ত-বৃন্দাবন' দেখতে পান, সে কথাও ছিন্নপত্রাবলীতেই আছে। সেই যুগে প্রকৃতি ও বৈষ্ণব পদাবলী তাঁর মনে পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল।

বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ কবি আজীবন পোষণ করেছিলেন.। সে অনুরাগের রূপ বা কারণ হয়তো বদলেছে, কিন্তু অনুরাগের অকৃত্রিমতা বজায় থেকেছে। পদাবলীর রসাস্বাদনকে কবি নূতন সৃষ্টিতে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে বৈষ্ণব সাহিত্য নিত্যনব এবং অভিনব তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পদাবলীর ভাবসৌন্দর্য ও রূপসৌন্দর্যের নির্যাস আহরণ করে তিনি ভিন্নতর এবং নূতনতর কাব্যসৃষ্টি করেছেন। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রচিন্তায় ও রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বৈষ্ণব সাহিত্য চিরন্তন অমরতা লাভ করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত হয় 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১৮৮৪)। ব্রজবুলির প্রতি আকর্ষণ এবং দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার উৎসাহই তাঁকে এই কার্যে প্রণোদিত করে, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও হয়তো এ বিষয়ে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে, রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থকে যথার্থ কাব্যমূল্য দিতে রাজী হন নি। তাঁর মতে রূপানুসারে এগুলির সঙ্গে প্রাচীন পদগুলির সাদৃশ্য থাকলেও, ভাবের দিক থেকে এগুলি 'মেকি'।

"তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাংমাত্র।"

—'জীবনস্মৃতি', ভানুসিংহের কবিতা

ভানুসিংহের পদাবলী ভাষায়, ভাবে, বিষয়ে, গঠনে বৈষ্ণব পদের প্রত্যক্ষ অনুসরণ ও অনুকরণ। এর রচনাও 'কপিবুকের যুগে'ই। কিন্তু পরবর্তী কালে, বৈষ্ণব পদের ভাব ও রূপকে 'স্বী-কৃত' করে রবীন্দ্রনাথ যে অজস্র গান রচনা করেছিলেন, সেগুলি সর্বৈবরূপে রাবীন্দ্রিক বিশিষ্টতার অধিকারী।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বৈষ্ণব সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্ত-বৃন্দাবনের সন্ধান দেয়। অন্য দিকে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম বিশ্বপ্রেমিক কবির মনকে আন্দোলিত করে। অসীম সৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেমবোধের অনুষঙ্গেই বৈষ্ণব পদাবলী কবির মনে বিশেষ অর্থবহ। ধর্মতত্ত্ব বা সাধনা হিসেবে নয়, চিরন্তন প্রেমসাহিত্য রূপেই তাঁর কাছে পদাবলীর মূল্য। প্রেমধর্মের পূজারী

রবীন্দ্রনাথ, যিনি বলেন 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'— বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন—

"বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।"

—'পঞ্চভূত', মনুষ্য

ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই প্রীতিমধুর সম্পর্কই বৈষ্ণব ধর্মের মর্মবাণী।

"The *Vaishnava* Religion has boldly declared that God has bound himself to man, and in that consists the greatest glory of human existence."

—'Sadhana', Realisation in Love

এখানেই ভগবান ভক্তের প্রেমে বাঁধা পড়েছেন, সীমার জন্য অসীমের ব্যাকুলতার আর শেষ নেই।—

"তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥"

— তাই তোমার আনন্দ

ভক্তের জন্য ভগবানেরও আকুলতা।

'তুমি যে আমারে চাও সে তো আমি জানি'। কারণ 'সিংহাসনের আসন হতে' তিনি নেমে এসেছেন ভক্তরই 'বিজন ঘরের দ্বারে'।

"আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি।
আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি॥
তাপস তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব,...
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী॥"

অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও ভক্তপ্রাণের শেষ সম্পদটুকুর জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনিও 'ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে'।

"আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে—
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ওই রথে, নামবে ধুলাপথে—
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে॥"

—অসীম ধন তো আছে

এইভাবেই ভক্ত ও ভগবানের যুগলমূর্তি পূর্ণাঙ্গ হয়। 'আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে, আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান'।

প্রেমসাধনা ও সৌন্দর্যসাধনা কবিমানসে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে যেন একসূত্রে গাঁথা ছিল। বৈষ্ণব কবির গান সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি ('আলোচনা', বৈষ্ণব কবির গান) যে সৌন্দর্যচিন্তা ব্যক্ত করেছেন, তা সত্যিই অভাবিতপূর্ব।

"পৃথিবীর চারি দিকে দেয়াল, সৌন্দর্য তাহার বাতায়ন।…সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই।"

কিংবা,

"সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশী।…সৌন্দর্যই তাঁহার আহ্বান-গান। সৌন্দর্যই সেই দৈববাণী।…আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন —'তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস'!"

জ্ঞানদাসের পদের ('মুরলী করাও উপদেশ') এই যে ব্যাখ্যা, এ কবির একান্ত নিজস্ব। এ বৈষ্ণবতা রাবীন্দ্রিক।

"আবার এক-এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে।…

আজু কে গো মুরলী বাজায়!
এ ত কভু নহে শ্যামরায়!…

জগতের সৌন্দর্য অসীম সৌন্দর্যকে ডাকিতেছে।…জগতের সৌন্দর্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। আই আজ জগতের সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে অনন্ত সৌন্দর্যের

আকর দেখিতেছি।...অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্যের মালা লইয়া মালা-বদল করিয়াছে।"

সীমা ও অসীমের সৌন্দর্যবন্ধন-চিন্তা তাঁর গানেও প্রতিফলিত।

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর—
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥...
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দরবিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥"

এখানে বৈষ্ণবীয় ভাবনার আভাস পাওয়া গেলেও, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুরটিও অস্পষ্ট নয়। বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিদের মনে ঠিক এই ভাবনা ছিল না। রবীন্দ্রব্যাখ্যায় বৈষ্ণব পদাবলী নবতর তাৎপর্য লাভ করেছে। এই ভাবনায় রাবীন্দ্রিক বৈষ্ণবতাই প্রকট।

রবীন্দ্রসংগীতে নারীপ্রেমের মধ্যেও আছে বৈষ্ণব পদের ছায়া। কেননা, বৈষ্ণব গান চিরন্তন প্রেমের গান।

"রবীন্দ্রনাথ ... বিরাট পদ-সাগরের তীরে তীরে কেবল উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে, তিনি রসামৃতসাগরে অবগাহন করিয়া কাব্যরত্ন পাইয়াছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমবিরহাদির সংগীতের ভাষা ও রূপকল্পনা এমন আশ্চর্যরূপে বৈষ্ণবীয়।...কতকগুলি গান বৈষ্ণবীয় বিরহ-বেদনাকে নূতন ভাবে ও নূতন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে।

—'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, ১৯৭০, কড়ি ও কোমল পর্ব-৩, পৃ ২৪৩

রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষতঃ প্রেমের গানে বাঁশি, ফুল, মালা, কুঞ্জবন, তমাল, কদম্ব (তমাল, কদম্ব কালিদাস-জয়দেবের রচনাতেও পাই), যমুনা, সখী, সজনী, অভিসার ইত্যাদি শব্দের অজস্র ব্যবহার। নিজেকে নারীরূপে কল্পনা করে প্রেমসংগীত রচনার মধ্যেও মহাজন-পদাঙ্ক অনুসরণের পরোক্ষ চিহ্ন আছে বলে মনে হয়।

অনেক গানে, বৈষ্ণব পদাবলীর সংস্কৃতি বা association, রাধাকৃষ্ণ-লীলার পটভূমি স্পষ্ট, যদিও এগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদাবলী নয়। 'সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে', 'ওগো শোনো কে বাজায়', 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে', 'এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি', 'আর নাই রে

বেলা', 'আমার মন মানে না দিনরজনী', 'আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন', 'বুঝি বেলা বহে যায়', 'বনে এমন ফুল ফুটেছে', 'আজি যে রজনী যায়', 'বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে' ইত্যাদি গানকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এদের ভাবানুষঙ্গ একান্তই বৈষ্ণবীয়। এ প্রসঙ্গে 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ' এবং 'এসো এসো ফিরে এসো' গান দুটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

'বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই' এবং 'ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াষা' গান দুটিতে শুধু ভাবানুষঙ্গ নয়, 'রাধা', 'মথুরা', 'বৃন্দাবন' ইত্যাদি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 'বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে' এবং 'হ্যাদে গো নন্দরাণী' গানদুটিতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার প্রসঙ্গ মনে পড়ে। 'রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু, চরাব আজ বাজিয়ে বেণু' ( 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' ) পঙ্‌ক্তিটিও এই সঙ্গে স্মরণীয়। 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' গানটি ঝুলন পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণ-লীলার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঝুলনের উল্লেখ অন্যত্রও আছে। সজনী, সখী, সই ইত্যাদি সম্বোধন স্পষ্টতঃই বৈষ্ণব পদাবলী থেকে প্রাপ্ত। 'ললিতা'কেও সম্বোধন করেছেন 'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে' গানে। 'শিশু' কাব্যের 'তোমার কটি তটের ধটি' কবিতাটি বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রসের অনুষঙ্গে রচিত। এই কবিতাটিতে সুরসংযোগ করা হয়েছিল। একে বাৎসল্য রসের গান বলা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বৈষ্ণব পদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের প্রধান কারণ তার কাব্যরস। বচনের মধ্যেই অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা ক'রে, কথাকে অর্থের বন্ধন ছাড়িয়ে ভাবের স্বাধীনলোকে উত্তীর্ণ ক'রে, বাক্যকে রসাত্মক কাব্যে পরিণত করবার যে কৌশল আলংকারিকেরা নির্দেশ করেছেন, কবির মতে তার শ্রেষ্ঠ সাধক বৈষ্ণব পদকর্তারা। তাই, বৈষ্ণব কাব্যের প্রেম ও সৌন্দর্যসাধনার সঙ্গে, ভাষা, ছন্দ, অলংকার— অর্থাৎ তার আঙ্গিকও কবিকে মুগ্ধ করেছিল।

> "আমার বিশ্বাস আমাদের বৈষ্ণব কবিরা ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে খুব দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। প্রচলিত শব্দ ভেঙে চুরে বা একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে — যাতে তাঁদের সংগীত ধ্বনিত হয়, ভাবের স্রোত উদ্‌বেল হয়ে ওঠে, তেমনি শব্দ তাঁরা তৈরী করেছেন।"

—'সংগীতচিন্তা', অভিভাষণ ২, 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ',

বস্তুতঃ ব্রজবুলির ধ্বনিমোহই প্রথম তাঁকে পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করে। কত অধ্যবসায় সহকারে তিনি এই ভাষার দুর্বোধ্য রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করতেন, সে কথা 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। এই আকর্ষণের ফলেই 'ভানুসিংহের পদাবলী'

রচিত হয়। গীতিকবিতায় ব্যঞ্জনাত্মক শব্দের বিশেষ প্রয়োজন। বৈষ্ণব কবিদের পদে রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় শব্দ খুঁজে পেয়েছিলেন।

"সংস্কৃত ভাষায় অনুভব বলতে যা বুঝি তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ একদিন ছিল। এতবড়ো একটা চলতি ব্যবহারের কথা হারালো কোন্ ভাগ্যদোষে বলতে পারি নে। এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত লজ্জা অনুভব করা, ভয় অনুভব করা।"

—'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫

বৈষ্ণব পদে কবি এই 'বাস' শব্দের প্রয়োগ দেখেছিলেন—

'সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর ?'

রবীন্দ্রনাথ কবিতায় এই শব্দ ব্যবহার করেছেন ( 'ছবি ও গান', একাকিনী ); গানেও পাই এই শব্দ।

"অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে দিনের বিদায়ক্ষণে···
ঘন বকুলের ম্লানবীথিকায়
শীর্ণ যে ফুল ঝ'রে ঝ'রে যায়
তাই দিয়ে হার কেন গাঁথ হায়, লাজ বাসি তায় মনে।"

অলংকার প্রয়োগেও বৈষ্ণব কবিদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে অনেক সময় বৈষ্ণব পদে ব্যবহৃত অলংকার হুবহু প্রয়োগ করেছেন। সেগুলি যেন তাঁর সমস্ত মানসিকতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। 'রূপের পাথার', 'যৌবনের বন', 'আঁখি-পাখি', 'হাসি মিশা বাঁশি বায়' ইত্যাদি পদের ব্যঙ্গার্থ সম্পর্কে কবি ছিলেন সচেতন। তাঁর গানেও এরা অলক্ষিতে এসে গেছে। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি', 'মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি', 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে', 'অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি' প্রভৃতি দৃষ্টান্তে সে কথা স্পষ্ট হবে। বৈষ্ণব পদের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গি ( style of expression ) এবং অল্প কথায় অনেক কথা বলবার ক্ষমতা কবিকে মুগ্ধ করেছিল। এ বিষয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতে কাব্যশিল্পগত এই উৎকর্ষ সার্থকতার তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। কিন্তু তাকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বললে চলবে না, কেননা এ ক্ষমতা কবিদের সহজাত এবং এই ক্ষমতার অভাবে মহাকবি হওয়া সম্ভব নয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ও অলংকারের চেয়েও রবীন্দ্রনাথকে বেশি মুগ্ধ করেছিল, পদাবলীর ছন্দ। ছন্দসচেতন কবি লক্ষ করেছিলেন—

"বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে।"

—'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায়

বাংলা ছন্দের আলোচনায়, ছন্দোবৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসেবে পুনঃপুনঃ বৈষ্ণব পদাবলীকে কবি স্মরণ করেছেন। বৈষ্ণব পদে হৃদয়াবেগের সংঘাত ছন্দকে বিচিত্র করেছে, অন্যদিকে ছন্দস্পন্দ হৃদয়ের উত্থান-পতনকে তরঙ্গায়িত করেছে। বৈষ্ণব কবি ছন্দের এই সার্থকতা অনুধাবন করেছিলেন।

"'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।'…শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেইজন্যে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না …ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না।"

—পূর্ববৎ

'রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন' ইত্যাদি পদটি সম্পর্কেও এই জাতীয় কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে বাংলায় এক নতুন রীতির ছন্দ প্রবর্তন করলেন। পরবর্তী 'ছন্দ' পরিচ্ছেদে সে কথা বিশদাকারে বলা যাবে। বৈষ্ণব পদে ছন্দের যে দোলা কবি অনুভব করেছিলেন, তারই দোলায় দোলায়িত হয়েছে তাঁর সমগ্র সাহিত্য, তথা তৎ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য। বাংলা ছন্দের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর দান তাই অপরিসীম।

বৈষ্ণব পদাবলীর অপর যে বৈশিষ্ট্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল, তা হল কীর্তনের সুর। কীর্তনের সুরে করি বাঙালি-প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করেছিলেন।

"কীর্তনসংগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাব-প্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে; কীর্তনসংগীতে বাঙালীর সেই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।…কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু… রাগ রাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারি নে হিন্দুস্থানি গাইয়ে কীর্তন গাইছে, এখানে বাঙালীর কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে।"

—'সংগীতচিন্তা', বিবিধ প্রসঙ্গ, পত্র ৪, ২৯ জুলাই, ১৯৩৬

শুধু বাঙালির প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্য নয়, বাংলা সংগীতের বিশেষত্বটিও কীর্তনে প্রকাশিত।

> "বাংলার সংগীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।...কীর্তনে সুরে বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে।"
>
> —'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা, মার্চ ১৯২০

কীর্তনে বাণী ও বীণায় যে যুগলমূর্তি, সমগ্র বাংলা সংগীতেই তার প্রকাশ। কারণ—

> "বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমারব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী।"

রবীন্দ্রনাথও এই ধারারই সাধক। তবে, শুধু কীর্তনের বাঙালি স্বরূপটিই নয় তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না। তাই 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে ( 'সংগীতচিন্তা' ) বলেছেন—

> "বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যেই...বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোম্যান্টিক মুভ্‌মেণ্ট বলে।"

রবীন্দ্রনাথ পদাবলী সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে বৈপ্লবিক মনে করেছিলেন ( 'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা ৩ )। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ও পদসাহিত্যের জন্ম যেন অভাবিত ছিল।

> "কীর্তনের আরও একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রাসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।"

বৈষ্ণব পদাবলীকে রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে ভালবেসেছিলেন। সুরে ও কাব্যে মিলে কীর্তনের অর্ধনারীশ্বর রূপ এবং তার 'ভাবপ্রকাশের নিবিড় গভীর নাট্যশক্তি'র প্রতি আকর্ষণবশতঃ বহু গানে তিনি কীর্তনের সুর ব্যবহার করেছেন। নমুনাস্বরূপ 'আমার মন মানে না', 'ভালবেসে সখী', 'বড়ো বেদনার মত', 'ওহে জীবনবল্লভ', 'আমি সংসারে মন দিয়েছি' প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য। কীর্তনে ব্যবহৃত 'আখর' বা 'কথার তান'ও তিনি দিয়েছেন কিছু গানে। 'ওহে জীবনবল্লভ', 'আমি জেনে

শুনে তবু ভুলে আছি', 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে', 'তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো সখা', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' প্রভৃতি গান তার উদাহরণ। আবার কীর্তনের সুর ছাড়াও কোন কোন গানে 'কথার তান' ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"তোমার আনন্দ ওই গো।
তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো, ওগো পুরবাসী।
বুকের আঁচলখানি সুখের আঁচলখানি—
দুখের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো॥
সেচন কোরো — তার পথে পথে সেচন কোরো—
পা ফেলবে যেথায় সেচন কোরো গন্ধবারি··· ॥" ইত্যাদি

"ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া—
আষাঢ়ের খেয়ালের কোন্ খেয়া ॥···
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া—
আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া ॥"

প্রকৃতি-বিষয়ক গানেও রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের সুর আরোপ করেছেন। 'আমার মল্লিকাবনে', 'তোমরা যা বলো তাই বলো', 'হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে' প্রভৃতি গান তার দৃষ্টান্ত। কিছু কিছু গানে রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের সঙ্গে বাউল সুরের সংমিশ্রণ করেছেন। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই', 'এই তো ভালো লেগেছিল', 'তুমি কোন পথে যে এলে' প্রভৃতি গানের সুরে আছে এই সংমিশ্রণের পরিচয়।

কীর্তনের সুর গ্রহণ করলেও, রবীন্দ্রনাথ এই অনুস্মৃতিকে কোথাও অযথা ভারাক্রান্ত করেন নি। কীর্তনের সহজ প্রাণস্পর্শী ভাবটিকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ; কীর্তনে ব্যবহৃত সহজ তালগুলি গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ( 'রবীন্দ্রসংগীত', ১৩৭০, দেশী সংগীতের প্রভাব, পৃ ৯৯ )—

"আখর ইত্যাদি বর্জিত, বাউলের প্রভাবযুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের জীবনে যার সূত্রপাত, এরূপ কীর্তনাঙ্গের গানকেই আমি প্রকৃত রাবীন্দ্রিক কীর্তন বলি।"

কীর্তনকে তার চিরপরিচিত গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানেই রবীন্দ্রকীর্তনের সার্থকতা।

প্রকৃতপক্ষে, বৈষ্ণবীয় ভাব, ছন্দ, সুর সবই আত্মসাৎ করে, তাকে সাঙ্গীকৃত ও রূপান্তরিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এগুলি তাঁর রচনায় বিশেষভাবে রবীন্দ্রায়িত হয়েছে। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে' বৈষ্ণবের গান রচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথই তাকে দিলেন জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে। কিন্তু সে গান তখন তার প্রাক্তন রূপ ছেড়ে নবরূপ ও নব্যভাষ্য লাভ করল। তাই এই গানগুলিকে যথার্থই 'রাবীন্দ্রিক কীর্তন' বলা যায়।

## রামপ্রসাদী গান

রামপ্রসাদ সেন শাক্ত কবি। 'সুতীব্রকঠিন শক্তি' যখন প্রথম অবস্থার তীব্রতা পরিহার ক'রে 'উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র' হয়ে এল, চণ্ডীপূজা যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হয়ে স্বভাবতঃই 'গীতিকবিতার সম্পদ' রূপে পরিগণিত হয়ে 'খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত' হতে থাকল, তখনই বাংলা সাহিত্যজগতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের আবির্ভাব। রামপ্রসাদের গান রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল।

শাক্তসংগীতের মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়কে বিশেষরূপে আর্দ্র করেছিল। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে (১৮৮৩) রবীন্দ্ররচিত একটি আগমনীর গান আছে।—

> "সারা বরষ দেখি নে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
> নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা॥
> এলি কি পাষাণী ওরে দেখব তোরে আঁখি ভ'রে—
> কিছুতেই থামে না যে, মা, পোড়া এ নয়নের ধারা॥"

'আগমনী' শব্দটি রবীন্দ্রসংগীতে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। 'গল্পগুচ্ছে'র 'খাতা' গল্পে একটি আগমনীর গান উৎকলিত হয়েছে। বাল্মীকিপ্রতিভায় তিনি কালী-মূর্তির বন্দনাসংগীত রচনা করেছেন, অবশ্য সেগুলি একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক।

রামপ্রসাদ বিশ্বশক্তিকে মাতৃরূপে বর্ণনা ও বন্দনা করেছেন। উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে বিশ্ববিধাতাকে পিতারূপে কল্পনা করেছেন, পূজা করেছেন। তথাপি, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তিনি বিশ্বমাতারও উপাসক। স্বদেশমাতার সঙ্গে বিশ্বমাতৃকার অভেদ-কল্পনা ( 'ও আমার দেশের

মাটি') ব্যতীত ভগবানের পূজাতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে তাঁকে রামপ্রসাদের ভাবানুসারী বললে হয়তো অন্যায় হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যাক্।

১। "জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু, আজি এ অরুণকিরণরূপে॥
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে॥"

২। "তিমিরদুয়ার খোলো—এসো, এসো নীরবচরণে।
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণকিরণে॥"

৩। "তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার॥"

৪। "আঁখিজল মুছাইলে, জননী—
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা॥"

এগুলি সবই পূজার গান। বিশ্বশক্তিকে কবি এখানে 'জননী' বলেই সম্বোধন করেছেন।

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'পিতানোঽসি' মন্ত্রের উপাসক হয়েও বিশ্ববিধাতাকে 'অখিলমাতা' বলেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্র-ভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ হয়তো দেবেন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকার।[১] বস্তুতঃ বিশ্ব-দেবতাকে মাতৃরূপে বন্দনা করা বাঙালির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। অধুনাপূর্ব বাংলা সাহিত্যে শাক্ত সাধকদের দ্বারাই হয়তো এর সূচনা হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্ণধার কেশবচন্দ্র সেনও এই মাতৃভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাজেই, উনবিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য মনীষীদের মনে বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ যদি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, তবে তাকে কোন স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মনে করা হয়তো ঠিক হবে না। এই ভাবনা বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যগত।

শাক্ত ধর্মতত্ত্ব এবং শাক্তভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভর্ৎসনা তীব্র ভাষায় ধ্বনিত হলেও, ভগবানের মাতৃরূপ-কল্পনার মধ্যে যে হৃদয়গত সত্য নিহিত আছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন। কেননা, মাতৃস্নেহের মধ্যে বিশ্বসত্যের একটা চরম প্রকাশ ঘটেছে।—

১. দ্রষ্টব্য: ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রচর্যা', ১৯৭৩, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার

"এমন মায়ের প্রাণ
যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান,
সে কি মাতৃহীন ?"

—'মানসী', সিন্ধুতরঙ্গ'

এই কবিতায় বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মাতৃশক্তির উপলব্ধি নিঃশেষে প্রকাশ পেয়েছে ! এই মাতৃশক্তি স্নেহেরই শক্তি। বিশ্বশক্তির স্নেহময়ী মাতৃরূপটি কবির অন্তরে নিগূঢ় সত্যোপলব্ধি রূপেই ধরা দিয়েছিল। 'সন্ধ্যা হল গো — ও মা' গানটিতে মাতৃরূপা ও মৃত্যুরূপা কালীর স্নেহময়ী রূপটিই কবি দেখেছিলেন, সে কথা পুরাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। আবার, বিশ্বজননীর জীবনদায়িনী, উজ্জ্বল প্রসন্নরূপও কবির ধ্যানে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল, 'জননী, তোমার করুণ চরণখানি' গানটিতে। 'অরুণ কিরণ', 'মরণহরণ', 'জীবনকাজে' প্রভৃতি শব্দে মায়ের বুকে জীবনের জ্বালা জুড়োবার কথা নয়, বিশ্বজগৎকে সত্যরূপে উপলব্ধি করে ভক্তিনম্র হৃদয়ে জীবন-কার্যে ব্রতী হবার কথা। 'করুণ', 'ভক্তি', পূজার ধূপ' প্রভৃতি শব্দ শারদীয়া প্রকৃতির জননীমূর্তির কথা স্মরণ করায়। 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' গানটিতেও অনুরূপ ভাবে অরুণকিরণকে চরণরূপে কল্পনা করা হয়েছে, ( 'অরুণরাঙা চরণ ফেলে' ) এবং সেখানে 'আগমনী' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে।

দেশভক্তির গানেও মাতৃভাবনা আছে, সে কথা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। আমাদের জাতীয় সংগীতে আছে—

"দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।"

—জনগণমন-অধিনায়ক

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে ('রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ' ) দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মনে কালীপ্রতিমা ও কালীরূপ-কল্পনার বিশিষ্ট স্থান ছিল, দেবপ্রতিমার কল্পনা ও মানস উপলব্ধিকে তিনি বিশেষ মূল্য দিতেন। 'মোহানা' ( 'পরিশেষ' ) কবিতায় কালীর চিন্তা আছে, কবিতাটি কালীপূজার দিনেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সেই রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, অক্ষয় চৌধুরীর 'সাহিত্যের সঙ্গী' হিসেবে। প্রধানতঃ রামপ্রসাদের প্রভাবেই

কালীর কল্পনা, বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ-কল্পনার উদ্ভব ঘটেছিল তাঁর মনে, এ কথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না।

রামপ্রসাদ শাক্তকবি নামে পরিচিত হলেও, আসলে তাঁর গানে কোন সাম্প্রদায়িকতার ছাপ নেই। 'ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে', 'মন রে কৃষি-কাজ জানো না', 'আমি কি দুখেরে ডরাই' প্রভৃতি গান সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। 'তারা আমার নিরাকারা' কিংবা 'মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিও তাঁর অ-সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচায়ক। বস্তুতঃ এই অনুভূতির ফলেই তাঁর গানগুলি সর্বজন-হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথও রামপ্রসাদী গানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 'মা আমায় ঘুরাবি কত', 'মন রে কৃষি-কাজ জানো না', 'দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে বহুবার স্মরণ করেছেন।

রামপ্রসাদের গানে 'খেলা' শব্দের ব্যবহার আছে।

"মা, খেল্‌বি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মা গো,
আশা না পূরিলো॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়
যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো॥"

—'রামপ্রসাদের পদাবলী', কেবল আশার আশ

'ভবে এলেম কর্তে খেলা, করিলাম ধুলা খেলা' ইত্যাদি আরও বহু পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানে 'খেলা' বা 'লীলা'র কথা 'আনন্দ' পরিচ্ছেদে ( রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের ভাবসম্পদ ) আলোচিত হয়েছে। 'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে', 'খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোলো', 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি', 'কোন্ খেলা যে খেলব কখন্' প্রভৃতি অনেক রবীন্দ্রসংগীতেই খেলার কথা আছে, এখানেও দুই কবির মনোধর্মের সাযুজ্য লক্ষণীয়।

রামপ্রসাদী গানের একটি বৈশিষ্ট্য নিজের 'মন'কে সম্বোধন। রবীন্দ্রনাথের বহু গানে 'মন' সম্বোধন পাই। 'দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে', 'মন জাগো মঙ্গল-লোকে', 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন, মন রে আমার', 'ও আমার মন, যখন

জাগলি না রে', 'মন রে ওরে মন' ইত্যাদি বহু গানে 'মন'কে সম্বোধন বোধহয় রবীন্দ্রসংগীতে রামপ্রসাদী গানের উত্তরাধিকার।

রামপ্রসাদ তাঁর ইষ্টদেবীকে 'তুই' সম্বোধন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—

"দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস এ মোর অহংকার॥"

—তোমার সোনার থালায়

এখানে শুধু 'তুই' সম্বোধন নয়, গানের ভাষা ও ভঙ্গীও রামপ্রসাদী গানকেই স্মরণ করায়। 'প্রসাদ' শব্দটিও লক্ষ করবার মত। আর বিষয়বস্তুতে রামপ্রসাদের 'আমি কি দুখেরে ডরাই' গানের নিকট সাদৃশ্য।

রামপ্রসাদের রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকতা। তাঁর গানের ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার এবং সুর— সবই সহজ ও সরল, অথচ গভীর ও মর্মস্পর্শী। রামপ্রসাদী গানের এই বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি।—

"যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।"

—'ছন্দ', বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ

১২৯০ সালেই রবীন্দ্রনাথ 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই বাংলা ছন্দকে তার স্বাভাবিক পথে চালনা করেন।

"আমার শেষবয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি।…এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গি আছে।"

—'ছন্দ', বাংলা ছন্দ : প্রথম পর্যায়

রামপ্রসাদের ছন্দকে কবি যে কত শক্তিশালী, বেগবান ও বিচিত্র করেছিলেন, সে কথা পরবর্তী 'ছন্দ' পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাবে। রামপ্রসাদের ভাষা সম্পর্কেও তাঁর উক্তি স্মরণীয়।

"প্রাকৃত-বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে।…প্রাকৃত-বাংলার লক্ষ্মীর পেটরায় সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দসঞ্চয় হচ্ছে,…। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ, এই কথা মনে রাখতে হবে।"

—'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায়

রামপ্রসাদের গানে পারসি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত-বাংলা একত্রে স্থান পেয়েছে—'এমন মানব-জমিন্ রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা'। প্রাকৃত-বাংলার এই ঔদার্যকে রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গানে হাট, ছাড়চিঠি, চুলা, নেচেকুঁদে, সওগাত, ঢেলা, ঝুড়ি, ঢাকনা, হেঁট মাথা প্রভৃতি বহু মৌখিক শব্দের ব্যবহার আছে। কোন কোন পঙ্‌ক্তিও রামপ্রসাদী ঢঙে লেখা। 'দেখেছিলাম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি' কিংবা 'হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই' প্রভৃতি তার উদাহরণ।

রামপ্রসাদী সুরেও কবি গান রচনা করেছেন। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' ইত্যাদি জনপ্রিয় স্বদেশী গানটি রামপ্রসাদী সুরে বসানো। বাল্মীকি-প্রতিভার 'শ্যামা, এবার ফিরে চলেছি মা' গানেও রামপ্রসাদী সুর দিয়েছেন কবি।

রামপ্রসাদ-পদাবলী বাংলা গীতসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এক ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী আর কেউই তাঁর মর্যাদা রক্ষা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদ-পদাবলীর ভাবসম্পদ ও শিল্পসম্পদ— উভয়েরই যথার্থ মূল্য স্বীকার করেছেন। তার ভাবকেও গ্রহণ করেছেন, তার শিল্পকলাকেও আত্মসাৎ করে করে সাঙ্গীকৃত করেছেন। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, সুরে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে রামপ্রসাদের যথার্থ উত্তরসূরী।

## বাউল গান

> "বাউলের সুর ও বাণী কোন্-এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।…এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না— তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য-রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।"

—'সংগীতচিন্তা', পরিশিষ্ট ১ : বাউল-গান

বাউল গানের সঙ্গে কবির দীর্ঘদিনের পরিচয়। বাল্যে শান্তিনিকেতন পৌষ উৎসবের সময়, সম্ভবতঃ মেলায় আগত বাউলদের সঙ্গে তাঁর প্রথম সংযোগ হয়। শিলাইদহে বাসকালীন বাউলদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেও, সেই ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল অচ্ছিন্ন। রবীন্দ্রনাথের মনে উপনিষদীয় বাণীর পাশেই স্থান পেয়েছিল বাউল-সাধনার বাণী। প্রথম জীবনে বাউল গানের কাব্যশৈলী, ভক্তির রস তাঁকে হয়তো অধিকতর আকৃষ্ট করেছিল,

কিন্তু ক্রমশঃ চিন্তার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বাউলের বাণী এক গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে তাঁর মনে। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অভিমতের সমর্থন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'প্রায় নিরক্ষর' বাউলের গানে। তাই বাউলদের পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন ( 'The Religion of Man', Man's Universe ) —

> "…wandering village singers, belonging to a popular sect of Bengal, called Bauls, who have no images, temples, scriptures, or ceremonials, who declare in their songs the divinity of Man, and express for him an intense feeling of love. Coming from men who are unsophisticated, living a simple life in obscurity, it gives us a clue to the inner meaning of all religions. For it suggests that these religions are never about a God of cosmic force, but rather about the God of human personality."

বাউলের গানে তিনি শুধু তাঁর 'মানুষের ধর্মে'র সমর্থনই খুঁজে পাননি, সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বপ্রেমের তত্ত্বটিও তাঁর মনকে আলোড়িত করেছিল।

> "Universal love প্রভৃতি বড়ো বড়ো কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়োই ভালো শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন?"

—'সংগীতচিন্তা', পরিশিষ্ট ১ : বাউলের গান

সেই কারণেই ১৯২৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ( ১৩৩২ ) কলকাতায় The Indian Philosophical Congress-এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিরূপে কবি যে ভাষণ দেন 'Philosophy of our People'— তাতে তিনি বাংলার বাউলের দর্শনই ব্যাখ্যা করেছেন। তা ছাড়া, ১৯৩০ সালে তাঁর বিখ্যাত হিবার্ট লেকচার ( 'The Religion of Man' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ) এবং কমলা বক্তৃতায় ( ১৯৩৩, 'মানুষের ধর্ম' ) তিনি বিশ্ববাসীর সামনে বাউলের বাণীকেই তুলে ধরেছেন।

বাউলদর্শন ও রবীন্দ্রদর্শনের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্য ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শন-মহাসভায় বাউলের বাণী সম্পর্কে এত গভীর আলোচনা করেছেন। অন্যত্র, 'মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন ( অধ্যায় ১ ) —

> "আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। …সেই বাহিরে-বিক্ষিপ্ত আপন-হারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারীর মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

…সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে: আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।"

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের 'মানবব্রহ্ম' বা 'মহামানব' আর বাউলের 'মনের মানুষ' এক হয়ে গেছে। এই মনের মানুষ যেমন বাউলের কাছে, তেমনই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'খেলার সাথি', লীলাময়। মনের মানুষের কথা রবীন্দ্রসংগীতে আছে—'ও আমার মন, যখন জাগলি না রে তোর মনের মানুষ এল দ্বারে', 'সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় আমার মনে', 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' প্রভৃতি গানে।

শুধু মনের মানুষই নয়, আরও অন্যান্য বাউল ধারণার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের ঐক্য দেখা যায়, এবং অনেক সময় গানেও তা প্রতিফলিত। সংক্ষেপে, তার একটু উদাহরণ ও পরিচয় দেওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ভগবানের পূজায় মন্দির, দেউল এবং আয়োজন-উপকরণের কোন প্রয়োজন নেই; পরন্তু এদের ভিড়ে অনেক সময় পূজার পথই রুদ্ধ হয়। মদন বাউলের একটি গান আছে—

"তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই
চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।"

রবীন্দ্রসংগীতে তারই অনুরণন—

"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি
বুঝতে নারি কখন্ তুমি দাও-যে ফাঁকি।
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়ার
পিছন-হতে পাই নে সুযোগ চরণ-ছোঁওয়ার
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥"

বাউলের জীবনতত্ত্ব—

"হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি',
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি!"

—বিশা ভুঞিমালী

আর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।"

—'বলাকা', ৩৩, 'জানি আমার পায়ের শব্দ'

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, অনন্ত জীবনপ্রবাহ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় চিন্তা। এখানে লক্ষণীয় উপমাগত সাদৃশ্য। বিশা ভুঞিমালীর এই গানে 'তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই' পঙ্‌ক্তিটির প্রতিধ্বনি আছে 'গীতাঞ্জলি'তে (১১৯, 'ভজন-পূজন')।

"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।"

মানবজীবনকে বাঁশি বলে কল্পনা করেছেন একজন অজ্ঞাতনামা বাউল কবি—

"ধন্য আমি—বাঁশিতে তোর আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি নাই রে কোনো দুখ।"

আর, রবীন্দ্রসংগীতে পাই—

"বাজাও আমারে বাজাও
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও॥"

এবং

"আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে॥"

এই ভাবগত সাদৃশ্য গভীরতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে 'নটীর পূজা'য়। এই নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন কবি ('আত্মপরিচয়', ষষ্ঠ প্রবন্ধ)।—

"বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা

তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে।"

নটী গেয়েছে—

"আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো, তোমায় স্মরি হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে॥
আমার সকল দেহের আকুল রবে মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাইনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে।
বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সংগীতে বিরাজে॥"

প্রায়-নিরক্ষর বাউলের মুখে শোনা গেছে এই গভীর জীবনদর্শনের বাণী।

"যদি করিস মানা, ওগো বন্ধু, মানি এমন সাধ্য নাই···
কোনো ফুলের নামাজ রং বাহারে
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।"

—শেখ মদন

'নটীর পূজা'র মূল অভিপ্রায়টি এই গানে এত সুপরিস্ফুট, এমন যেন আর কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বাউলের সুর ও বাণী তাঁর মনে সহজ হয়ে মিশে গেছে। বাণীর কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হল; এবার সুরের কথাও কিছু বলা প্রয়োজন।

বাউলের জনপ্রিয় সহজ সুর যে জনসাধারণের মনে সর্বব্যাপী আহ্বানের বাণী বয়ে আনতে পারে, তা জেনেই রবীন্দ্রনাথ বহু স্বদেশী গানে বাউলের সুর ব্যবহার করেছেন। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনেব সময় রচিত গানগুলি তিনি 'বাউল' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তার মধ্যে আবার ছ'টি গানের একটি গুচ্ছের নাম দেন 'বাউল', তা ছাড়া এই গ্রন্থের অন্য একটি গানের নামও ছিল 'বাউল'। এই গ্রন্থের মোট কুড়িটি গানের চোদ্দটিতেই বাউলের সুর বসানো হয়েছে। স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

স্বদেশী গান ছাড়া, অন্যান্য বহু গানেও কবি বাউলের সুরকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', 'আমি কান পেতে রই', 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে', 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ', গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ'. 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়.' 'আমাদের খেপিয়ে

বেড়ায় যে', 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' প্রভৃতি অসংখ্য গান স্মরণ করা যায়। কীর্তন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে কীর্তন ও বাউলের সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আবার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন যে রাগরাগিণীর সঙ্গেও তিনি বাউল সুর মিশ্রিত করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'আমি তারেই জানি', 'এ বেলা ডাক পড়েছে', 'কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' প্রভৃতি গানের উল্লেখ করেছেন।[১]

সহজিয়া সাধনার উত্তরাধিকারবশতঃ বাউল গানে অনেক সময়ই হেঁয়ালি বা তাত্ত্বিক জটিলতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সে সমস্তকে বাদ দিয়ে সহজ ভাবের কবিত্বময় গানগুলি নির্বাচন ক'রে, তাদের জ্ঞানের তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, কাব্যরস আস্বাদন করেছেন এবং সংগীত ও সাহিত্যজগতে সেগুলিকে প্রচার করেছেন। বৈষ্ণব পদের কাব্যরস ও কাব্যরূপ কবিকে মুগ্ধ করেছিল, আর বাউলের সাধনা ও কাব্যরস দুটির প্রতিই ছিল কবির সমধিক আকর্ষণ। তাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পেলেও, বাউল গান অধিকতর সমাদর লাভ করেছিল তাঁর কাছে। তিনি দেখেছিলেন বাউলের সাধনা মুক্তিপথের সাধনা — কি ধর্মে কি সুর-ভাষা-ছন্দ-অলংকারে।

> "একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন।···অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না।···বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না— স্পষ্ট বোঝা যায় ঐ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।"
>
> —'সংগীতচিন্তা', সংগীতের মুক্তি

রবীন্দ্রসাহিত্য অনুধাবণ করলে এ কথা অবিদিত থাকে না যে, বাউল এবং তার গান ও সাধনা কবির মনে এক সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' ( ১৯০৯ ) ও তারই নবতর রূপ 'পরিত্রাণ' ( ১৯২৯ ) এবং 'মুক্তধারা' ( ১৯২২ ) নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর যে চরিত্রটি পাওয়া যায়, তা সহজ সরল বাউলের ভাবমথিত রূপ। 'ফাল্গুনী' ( ১৯১৬ ) নাটকেও এক অন্ধ বাউলের চরিত্র আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্ধ বাউল ও ধনঞ্জয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তবে, এঁরা

১. দ্রষ্টব্য: সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্রনাথের গান', সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৭৩

ঠিক সাধারণ বাউলের প্রতিরূপ নন, রবীন্দ্রচিন্তায় বাউলের যে ভাবরূপ ও ভাবমূর্তি, এঁরা তারই প্রতীক। এঁরা 'রবীন্দ্র-বাউলে'র আত্মীয়।

বর্ষাকালকেও রবীন্দ্রনাথ বাউল রূপে কল্পনা করেছেন—'বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা'। বস্তুতঃ আত্মভোলা, ঘরছাড়া, প্রেমিক বা পাগলের সংস্কৃতিতে বাউলের কথাই তাঁর মনে আসত। তাই এ জাতীয় ছবি আঁকতে হলেই তিনি বাউল, ক্ষ্যাপা, পাগল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই রূপকল্পটি কবির অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস ॥"

'মন-মাঝি', 'অচিন-পাখি' প্রভৃতি রূপকও বোধহয় কবি বাউল গান থেকেই পেয়েছেন। এ বিষয়ে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যে সমস্ত গানে রবীন্দ্রনাথ বাউলের সুর গ্রহণ করেছেন, সেখানে তিনি বাউল গানের মত লৌকিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর সাধারণতঃ সাধু ভাষায় লেখা গানের পক্ষে ছিল অভাবিত। অথচ শব্দটি সেই গানের সুরের পরিবেশে কখনই খাপছাড়া ঠেকে না। স্বদেশী গানে আছে সেই জাতীয় চল্‌তি কথার ব্যবহার। অন্যান্য গানেও আছে। যেমন—'যায় রে কোন্ চুলায় রে', 'কোন্ বলরামের আমি চেলা', 'তাবা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে' ইত্যাদি। রামপ্রসাদের প্রভাবেও তিনি চল্‌তি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

শব্দে, অলংকারে, সুরে, বাণীতে বাউল গান যে কবিকে কতখানি প্লাবিত করেছিল, ভাবতে বিস্ময় লাগে। অপর দিকে, কবিগুরুর মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যায় এবং সহৃদয় সংবেদনশীলতার সহায়তায় 'প্রায়-নিরক্ষর' বাউলের 'অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস' বাণী বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবি বাউলকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করেছেন, নিজেকে বাউলের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত ক'রে।

"ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে।…

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে···
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।···
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"

—'পত্রপুট', পনেরো, 'ওরা অন্ত্যজ'

## লোকগীতি

বাংলার লোকসাহিত্য, বিশেষতঃ বাংলার ছড়া এবং রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ( ১৯০৭ ) একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কিছু ছড়া তিনি সংগ্রহও করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলার লোকসাহিত্য এবং লোকগীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ছেলেবেলাতেই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাহচর্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গীতসাহিত্যের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে। পরবর্তী কালে, কর্মোপলক্ষে যখন রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার বুকে বাস করছিলেন, তখন লোকগীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। সংগীতের দুই ধারা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ( 'সংগীতচিন্তা', শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান )—

"জনসংগীতের প্রবাহ সেও ছিল বহু শাখান্বিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোটো-বড়ো নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালীর হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন

মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসংগীতের এত বৈচিত্র্য আর-
কোনো দেশে আছে কি না জানি নে।"

কীর্তন গান, রামপ্রসাদী গান ও বাউল গান প্রকৃতপক্ষে লোকগীতি ধারারই অন্তর্গত। তা ছাড়া, ভাটিয়ালি, সারিগান, কবির গান প্রভৃতি অন্যান্য লোক-গীতিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তার কারণ এগুলির মধ্যেও কবি ভাব-প্রবণ বাঙালি-হৃদয় ও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যটি দেখেছিলেন—সে হল সংগীতে কথা ও সুরের যুগলমিলনের ধারা। তবে, এই আপাত-নগণ্য লোকগীতিগুলি থেকে কবি কোনো বিশেষ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। সারিগানের সুরে তাঁর বিখ্যাত স্বদেশী গান 'এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে' রচিত। সারিগান শব্দটিও আছে তাঁর গানে—

"তারি সুদূর সারিগানে বিদায়স্মৃতি জাগায় প্রাণে
সেই-যে দুটি উতল আঁখি উছল করুণায় গো ॥"

—আজি সাঁঝের যমুনায় গো

"তাই তোমারি সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে,
আকাশ-ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি ॥"

—ওগো আমার শ্রাবণমেঘের

পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধটিতেই রবীন্দ্রনাথ লোকগীতির ভাবগত ঐশ্বর্য এবং সহজ, সরল, বাঙালি বিশেষত্বটুকুকে সুস্পষ্ট করবার জন্য 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে' এবং 'মনে রইল সই মনের বেদনা'—এই দুটি সংগীতের উদাহরণ দিয়েছেন। এই গান দুটি কবির প্রিয় ছিল এবং এগুলি তিনি বহুবার উদাহৃত করেছেন। সুবিপুল রবীন্দ্রসংগীত-সম্ভারে অনুরূপ ভাবনারও সাক্ষাৎ মেলে। 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো' কিংবা 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসর মত বাসিয়ো' এবং 'মনে রয়ে গেল মনের কথা, 'নিমেষের তরে সরমে বাধিল', 'হল না, হল না, সই, হায়'— প্রভৃতি গানগুলির দ্বারা সে কথা সপ্রমাণ হয়। 'মনে রইল, সই, মনের বেদনা' এবং 'মনে রয়ে গেল মনের কথা' গান দুটির ভাবগত সাজুয্যই শুধু নয়, ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

বাংলার জাতীয় গীতসাহিত্যের যে ধারাটি মধ্যযুগে স্রোতঃশীলা ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবাহে তা রুদ্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে পুনঃপ্রবাহিত্ত করেছেন ও বিস্তৃতিদান করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃতির জাতীয় উত্তরাধিকার বা জাতীয় ঋকৃথ যথার্থ মর্যাদা লাভ করে রবীন্দ্রনাথের

হাতেই। মধুসূদন বঙ্গভাণ্ডারের বিবিধ রত্ন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং উজান বেয়ে চলেছিলেন বৈষ্ণব পদাবলী পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ আরও উজিয়ে গিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার থেকেও রত্ন আহরণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব প্রাচীন বাংলা গীতসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে। তিনি বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল পদাবলী, এমন কি ছেলে-ভুলানো ছড়ারও নবমূল্যায়ন করেছেন। তদুপরি সেগুলিকে কেবল যাদুঘরে সাজিয়ে রাখেন নি, তাদের সঞ্জীবিত করেছেন, নবরূপায়িত করেছেন, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন জাতীয় জীবনে। শুধু বাউলের নয়, কীর্তন ও রামপ্রসাদী গানেরও বাণী এবং সুর তাঁর মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গিয়েছিল। জাতীয় সংস্কৃতির সাঙ্গীকৃত ধারা সম্প্রসারিত এবং যুগোচিত নবরূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর গানে। বস্তুতঃ আমাদের জাতীয় ঋকৃথ হল গীতসম্পদ, রবীন্দ্রনাথের গানেই বাংলার সেই প্রাচীন গীতসাহিত্যের ঐতিহ্য যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রপ্রতিভার 'সোনার কাঠি'র স্পর্শে বাংলার লুপ্ত ও মৃত গীতসম্পদে প্রাণসঞ্চার হয়। তাঁরই প্রদর্শিত পথে আজ সমস্ত বাঙালি প্রাচীন গীতসম্পদের রসাস্বাদনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ কথা সর্বদা স্মরণীয় যে, কীর্তন বা বাউলের যে রূপের সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত, সে হল এগুলির রবীন্দ্রায়িত রূপ। মহাকবি কালিদাস লিখেছেন, 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবি।' এ কথা কবি-রবি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর মনের আবহাওয়ায় বিভিন্ন পরিমণ্ডল থেকে যে রস গৃহীত হয়েছে, তার থেকে সহস্রগুণে বেশি রস তিনি বর্ষণ করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষাই ঈষৎ পরিবর্তিত করে তাঁকে উদ্দেশ করে বলা যায়— 'নিয়েছ যত দিয়েছ তার বেশি।'

## ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ছন্দের চিরন্তন মূল্য স্বীকার করেছেন—

> "ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।"
>
> —'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : দ্বিতীয় পর্যায়

সেইজন্যই আর্টে ছন্দের বিশেষ গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রসংগীতসাহিত্যে ছন্দের প্রয়োজন ও স্থান কোথায় এবং ছন্দোবৈচিত্র্য-সাধনের ফলে সংগীতের রূপগত ও প্রকাশগত উৎকর্ষ কতখানি সার্থক, বর্তমান পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে আলোচনা করা গেল।

## কাব্যে ছন্দের প্রয়োজন : ভাব ও ছন্দের সমন্বয়

গদ্য ভাষায় লেখা প্রবন্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য, তার আবেদন মানুষের চিন্তাবৃত্তির কাছে। আর ছন্দোময় পদ্যভাষার আবেদন মানুষের হৃদয়ে।

> "ভাষার তো হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়।…এই জন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সংগীত নিযুক্ত করিয়া দেন।…ছন্দ সংগীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পান্বিত এবং জীবন্ত করিয়া তোলে, বাহিরের ভাষাকেও হৃদয়ের ধন করিয়া দেয়।"
>
> —'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য

কবি ব্যাখ্যা করে বলেছেন ( 'ছন্দ,' গদ্যছন্দ ) —

> "কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে কেবলমাত্র আপন অর্থটুকু নিবেদন করে। যখন তাকে ছন্দের আঘাতে নাড়া দেওয়া যায় তখন তার কাছ থেকে অর্থের বেশি আরো কিছু বেরিয়ে পড়ে। সেটা জানার জিনিস নয়, বেদনার জিনিস। সেটাতে পদার্থের পরিচয় নয়, রসের সম্ভোগ।…
>
> বিংশতি কোটি মানবের বাস,
> এ ভারতভূমি যবনের দাস,
> রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
> আর্যাবর্তজয়ী মানব যাহারা
> সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা
> জন কত শুধু প্রহরী-পাহারা
> দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।
>
> দেখা যাচ্ছে ছন্দের বন্ধনে শব্দগুলোকে শৈথিল্য থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এলিয়ে পড়ছে না, তারা একটা বিশেষ রূপ নিয়ে চলেছে। বাঁধন ভেঙে দেওয়া যাক।—
>
> ভারতভূমিতে বিংশতি কোটি মানব বাস করিয়া থাকে, তথাপি এই দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা একদা আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিল, ইহারা কি সেই বংশ হইতে উদ্ভূত? কয়েকজন মাত্র প্রহরীর পরিক্রমণ দেখিয়াই ইহাদের চক্ষুতে কি দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়াছে?
>
> কথাগুলোর কোনো লোকসান হয় নি, বরঞ্চ হিসাব করে দেখলে কয়েক পারসেন্ট মুনাকাই দেখা যায়। কিন্তু কেবল ব্যাকরণের বাঁধনে কথাগুলোকে

অন্তরের দিকে সংঘবদ্ধ করে নি, তারি অভাবে সে শক্তি হারিয়েছে। উদাস মনের রুদ্ধ দ্বার ভাঙবার উদ্দেশে সবাই মিলে এক হয়ে ঘা দিতে পারছে না।"

ছন্দোবদ্ধ বাক্য যে কেন উদাস মনের রুদ্ধ দ্বারে ঘা দেয়, অন্যত্র রবীন্দ্রনাথই সে কথা সুস্পষ্ট করেছেন ( 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ১০৯, ১৩ অগাস্ট, ১৮৯৩ )।

> "দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না—অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয় ;··· ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার আবশ্যক হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়।··· বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে,···ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে।"

ছন্দ একটা সীমার মধ্যে ভাষাকে সংযত ক'রে, সংকীর্ণ ক'রে, তাকে গতি দেয় এবং তার বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটিত করে। আর, এই সংযমের বিশেষ প্রয়োজন আছে আটে। 'কারণ সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার।'

ছন্দ শুধুই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য বা আকারের সৌন্দর্য নয়। ছন্দের স্পন্দন কবিতার আন্তরশক্তিকে পরিস্ফুট করে, কবির হৃদয়াবেগের স্পন্দনে ছন্দ স্পন্দিত হয়। সেই কারণেই বলা যায় ছন্দও ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ। ছন্দের মধ্য দিয়ে মনের হর্ষ বিষাদ ব্যক্ত হয়, শুধুমাত্র কথায় তা সম্ভবপর নয় — 'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে'। গদ্য ভাষায় যে বাণী অব্যক্ত থেকে যায়, ছন্দের ব্যঞ্জনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই মনের বিভিন্ন আবেগ অনুযায়ী ছন্দকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই সচেতন ছিলেন।

> "পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে। তার একটা কারণ এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে।"
>
> —'ছন্দ', বাংলা প্রাকৃত ছন্দ : তৃতীয় পর্যায়, কার্তিক ১৩৪৫

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য, ছড়া, পাঁচালি রচিত হয়েছিল পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে। একটানা গল্প এগুলি, একটানা ছন্দে লেখা। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে যখন বিচিত্র হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের তাগিদ এল কবিদের মনে, তখন ছন্দকেও

বিচিত্র করবার প্রয়োজন দেখা দিল। এর থেকে এই কথাটিই স্পষ্ট হয় যে, ছন্দের স্পন্দন হৃৎস্পন্দনের তালেই তরঙ্গায়িত। এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে পূর্বেও ছিল ( 'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায়, চৈত্র ১৩২৪ )।

> "বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে।"

বৈষ্ণব কবিদের মতই রবীন্দ্রনাথও ছন্দের এই প্রাণরূপটি ধরতে পেরেছিলেন; তাই বলা যায়, বাংলাসাহিত্যে ছন্দের দ্বিতীয় ঢেউ ওঠে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বাংলায় দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা বজায় রেখে ছন্দোরচনা কৃত্রিম হয় বলে রবীন্দ্রনাথ রুদ্ধদলকে দুই মাত্রা ধরে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনা করলেন। 'মানসী' থেকেই এই ছন্দের যাত্রারম্ভ—সে কথা আছে 'মানসী'র ভূমিকায়। কিন্তু তার পূর্বেও যে তিনি বৈষ্ণব কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, তার প্রমাণ 'ভানুসিংহের পদাবলী'। পরবর্তী কালেও সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা বজায় রেখে তিনি গান রচনা করেছেন। সে কথা যথাস্থানে আলোচ্য। এখানে এইটুকুই বলা যায় যে, প্রাচীন যুগে বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস থেকে যে ছন্দোবৈচিত্র্য দেখা দেয়, আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীতে, মানসীতে এবং বিশেষতঃ বিভিন্ন গীতরচনায় তা ক্রমবিকশিত, পূর্ণপরিণত ও বিচিত্রতর হয়েছে।

গদ্যেও 'ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' আছে, কিন্তু তা পরিমেয় নয়। কিন্তু গীতধর্মী কাব্যে, যেখানে মানুষের হৃদয়ে আবেদন আনতে হয়, সেখানে ছন্দ, মিল, সুর ইত্যাদি অপরিহার্য। গদ্যকে যদি বলি স্থলচর, তা হলে কাব্যকে বলতে হয় জলচর; ভাবের কলকল্লোল ও ছন্দের তরঙ্গ এতে ধরা পড়ে।

আর কবিতা অপেক্ষা গানে অধিকতর ছন্দোবৈচিত্র্য প্রয়োজন, কারণ গানে অনুভূতির বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা বেশি। তদুপরি, কবিতায় বিস্তৃতির সহায়তায় বক্তব্যবিষয়কে পরিস্ফুট করা যায়, গানে তা সম্ভব নয়। গানের সীমিত পরিসরে কবিমনের অনুভূতি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করবার জন্য যে ব্যঞ্জনার প্রয়োজন, ছন্দ তার একটি প্রধান অঙ্গ। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই কারণেই ছন্দের বৈচিত্র্য এত বেশি। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দোবৈচিত্র্যের এই কারণটি যথাযথ রূপে হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর গীতি-পদাবলীর ছন্দকে বিচিত্রতর করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতে ভাবের যে বিপুল বৈচিত্র্য— এমন আর কোথাও আছে বলে জানি না। রবীন্দ্রকাব্যেও এত বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখা যায় না। যে

কোনো কালের, যে কোনো ভাবের, যে কোনো বিষয়ের গান গীতবিতানে খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙালি মানসের সবচেয়ে বড় সঙ্গী রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান। উপরন্তু গীতবিতান শুধু সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রচিন্তার নির্যাসস্বরূপই নয়, গীতবিতানে আছে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথেরও সামগ্রিক পরিচয়। দার্শনিক, ভাবুক, চিন্তানায়ক, ধার্মিক, স্বদেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পরিচয় আছে গীতবিতানে। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, এমন-কি কাব্যেও ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথকে এমন ভাবে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, গানেই রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব নিঃশেষে ধরা দিয়েছে। গান হয়েছে বহুবিচিত্র, সেই কারণে ছন্দও হয়েছে বহুবিচিত্র। গীতবিতান যথার্থই বিচিত্র ছন্দের স্বর্ণখনি।

রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের অনেক গান কবিতা হিসেবে পড়া যায় না, পড়তে গেলে প্রতি পদেই পড়ার তাল কেটে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা হিসেবে পড়বার অসুবিধা নেই। তার একমাত্র কারণ গীতরচনায় রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছন্দ-কুশলতা।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বছন্দকে নিজের গানের ছন্দে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন ('গীতাঞ্জলি', ৩৬)—

"পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে।
পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগনমাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে তপন-তারা-চন্দ্রে রে।"

বলেছেন ('সংগীতচিন্তা', সংগীতের মুক্তি)—

"আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।"

বিশ্বসংগীত-ঝর্ণা থেকে তিনি নিজের বীণায় সুরধারা টেনে নিতে চেয়েছেন ('সোনার তরী', পুরস্কার), আবার নটরাজের 'বিশ্বনাচের দোলায় দোলায়' নিজের জীবনবন্ধন ঘোচাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ বিশ্বছন্দ, বিশ্বসংগীত ও বিশ্ব-নৃত্যকে কবি এক করেই দেখেছেন ও নিজের গানে প্রতিফলিত করেছেন।

বিশ্বজগতের ছন্দের প্রতিরূপ আমাদের হৃৎস্পন্দনে। আমাদের দেহজীবন

চলে হৃৎস্পন্দনের তালে তালে, আর মনোজীবন চলে ভাবস্পন্দনের ছন্দে ছন্দে। এই ভাবছন্দেরই প্রতিফলন আমাদের মুখের কথার ছন্দে। ভাবছন্দ ও বাক্‌ছন্দের সৌষম্যের উপরেই নির্ভরই করে ভাষার সুষমা। এই সৌষম্য অপূর্ণ হলে ভাষা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর, সৌষম্য সুমিত, সুস্পষ্ট ও হৃদয়াবেগে কম্পিত হলে বাক্‌ছন্দের বিকাশ ঘটে পদ্যছন্দে। ঐ কম্পন যেখানে সুস্পষ্ট বা সুনিয়মিত নয়, সেখানে দেখা দেয় গদ্যছন্দ। গানেও ছন্দ আছে, তাকে বলে তাল। গানের ছন্দ যে বাক্‌ছন্দের অনুবর্তী হবেই, এমন বিধি নেই। বাক্‌ছন্দের ঘাটতি সেখানে সুরে পূরণ করা হয়। যে সময় কবিতা সুরে পঠিত বা গীত হত, সে সময় পদ্য-ছন্দও বাক্‌ছন্দের সদা-অনুবর্তী ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালে পদ্যছন্দ ও বাক্‌ছন্দ প্রায় 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'।

রবীন্দ্রনাথ গানের ছন্দকেও পদ্যছন্দ বা বাক্‌ছন্দের অনুবর্তী করে দেওয়ায়, তাঁর গীতরচনা এত সুখপাঠ্য। যেহেতু বাক্‌ছন্দ ভাবছন্দেরই প্রতিরূপ, সেই কারণে গানের ছন্দেও ভাবছন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়। এইভাবে, ভাব ও ছন্দের সমন্বয় ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ গীতসাহিত্য রচনায় যুগান্তর এনেছেন। বাংলা সংগীতে কথা ও সুরের যুগলমিলনের ধারা অব্যাহত থাকলেও ছন্দের ত্রুটিতে গীতরচনা ও কাব্যের যে দূরত্ব ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে অপসারিত করলেন। ভাব ও ছন্দের সুসমন্বয়ের ফলেই কবির গীতরচনাগুলি এমন সুন্দর ও সুসমঞ্জস হয়েছে। এই সামঞ্জস্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।—

> "বাক্য যদি ছন্দের বন্ধন ছাড়িয়ে অর্থের অহংকারে কড়াগলায় হাঁকডাক করে, কাব্যে সেটাও যেমন রূঢ়তা, তেমনি ছন্দের অতি প্রচুর ঝংকার অর্থ-সমেত বাক্যকে ধ্বনি চাপা দিয়ে মারলে সেটাও একটা পাপের মধ্যে।"
>
> —'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা ৩

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সদাজাগ্রত সামঞ্জস্যবোধ এবং সেই সঙ্গে অনুভূতির উপযোগী ছন্দোবৈচিত্র্য ও কারুকৌশলের ফলে রবীন্দ্রনাথের গীতরচনাগুলি ছন্দজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের চিরন্তন ঔৎসুক্যের বিষয়।

## ছন্দের রীতি-বৈচিত্র্য ও বন্ধ-বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দের যে বিপুল বৈচিত্র্যের সমাবেশ, রবীন্দ্রকাব্যে তার তুলনা নেই। এই বৈচিত্র্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ছন্দের রীতি-বৈচিত্র্য এবং ছন্দের বন্ধ-বৈচিত্র্য।

**রবীন্দ্র-গীতরচনার ছন্দোরীতি :** বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি রীতি—'দলবৃত্ত' ( syllabic style ), 'কলাবৃত্ত' ( moric style ) এবং 'মিশ্র কলাবৃত্ত' বা 'মিশ্রবৃত্ত' (composite style)। যে রীতির পর্বে সাধারণতঃ মুক্ত-রুদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেক দলকে এক মাত্রা বলে গণ্য করা হয়, তাকে বলা যায় দলবৃত্ত পর্ব। এই প্রকার পর্ব নিয়ে গঠিত ছন্দকে বলে দলবৃত্ত ছন্দ। ছান্দসিক শব্দটি (ছান্. দ. সিক্) এই রীতি অনুযায়ী তিন মাত্রা বলে গণ্য।

যে রীতির পর্বে রুদ্ধদলকে দুই কলামাত্রা ও মুক্তদলকে এক কলামাত্রা বলে গণ্য করা হয়, তাকে বলা যায় কলাবৃত্ত পর্ব। কলাবৃত্ত পর্ব-সমন্বিত ছন্দের নাম কলাবৃত্ত ছন্দ—পূর্বনাম মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। ছান্দসিক শব্দটি ( ছা-ন্. দ. সি-ক্ ) এই রীতিতে পাঁচ মাত্রা বলে গণ্য।

যে রীতির পর্বে শব্দের আদি ও মধ্যবর্তী রুদ্ধদল সাধারণতঃ সংকুচিত ও এক কলা-পরিমিত এবং শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধদল প্রসারিত ও দুই কলা-পরিমিত হয়, তাকে বলা যায় মিশ্র কলাবৃত্ত পর্ব ( যৌগিক, অর্ধকলাবৃত্ত ইত্যাদি পূর্বনাম )। এই রীতির পর্ব নিয়ে গঠিত ছন্দের নাম মিশ্র কলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দ মূলতঃ কলাবৃত্ত রীতি থেকেই উৎপন্ন। ছান্দসিক শব্দটি ( ছান্. দ. সি-ক্ ) এই রীতিতে চারমাত্রা বলে গণ্য।

রবীন্দ্রকাব্যে এই তিন রীতির ছন্দের বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপের প্রকাশ আছে। রবীন্দ্রসংগীতে সেই রূপ হয়েছে বিভিন্নতর ও বিচিত্রতর। উপরন্তু, এই তিন রীতির বাংলা ছন্দ ব্যতীত প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দেও তিনি গীতরচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে সংস্কৃত ছন্দের কোন নিদর্শন মেলে না।

বৈষ্ণব কবিরা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গান রচনা করেছিলেন, ব্রজবুলি ভাষায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ছন্দে গান রচনা করতে তাঁদের দ্বিধা ছিল। কেননা, সংস্কৃত উচ্চারণরীতি বাংলা ভাষার পক্ষে কৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন ব্রজবুলি ভাষায়। উপরন্তু, গানে 'বাংলা-বুলি'তেও এই ছন্দ ব্যবহার করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কারণ বাংলা ভাষার পক্ষে সংস্কৃত উচ্চারণরীতি কৃত্রিম হলেও, সংগীতে ভাষার কৃত্রিমতা অনেক পরিমাণে সয়। সেইজন্য এ রীতির ছন্দে রচিত রবীন্দ্র-গীতরচনাগুলি ব্যর্থ হয় নি; বরং বাংলা ছন্দের ইতিহাসে নূতনত্ব এনেছে।

সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে বাংলায় প্রয়োগ করেছেন। এই ছন্দের নাম দেওয়া যায় 'প্রত্ন কলাবৃত্ত রীতি' ( old moric style )।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও এই জাতীয় ছন্দে বাংলায় গান রচনা করেছেন। 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' ইত্যাদি গানটি তার দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে রামপ্রসাদের গানেও এই ছন্দ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ছন্দ ব্যবহৃত হলেও, সেখানে স্বরের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতা অনুসারে উচ্চারণের সংকোচন-প্রসারণ বিধি সর্বথা রক্ষিত হয় নি। বস্তুতঃ খুব কম সংখ্যক পদেই বিশুদ্ধ মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দ বজায় আছে। পদ কর্তারা এই ত্রুটি গানের সুরে পূরণ করতেন, তাই কাব্যছন্দের উচ্চারণরীতিকে উপেক্ষা করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলায় প্রত্ন কলাবৃত্ত রীতিতে বিভিন্ন আকারের পর্বসমন্বিত গান রচনা করেছেন। 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে', 'শুভ্র নব শঙ্খ তব', 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এবং 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন'— যথাক্রমে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্বে বিভক্ত। বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দোগত যে ত্রুটির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি সাধারণতঃ সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত। 'মাতৃমন্দির' এবং 'দেশ দেশ' গান দুটি ছন্দোরীতির বিচারে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। 'জনগণ' গানে 'গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ' অংশে 'হে' দলটির উচ্চারণ দীর্ঘ না হয়ে হ্রস্ব হয়েছে ছন্দের খাতিরে। তবে, এই ত্রুটিকে নগণ্য বলে মনে করা যায়। তেমনই, 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানে 'জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা' অংশে, '-বী' এই মুক্তদলটির দীর্ঘত্ব বজায় থাকে নি। অবশ্য, এই জাতীয় ব্যতিক্রম অন্য গানে আরও ঘন ঘন দেখা গেছে। 'পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে' গানটির মূল অবলম্বন ছয় মাত্রার প্রত্ন কলাবৃত্ত পর্ব। কিন্তু 'পাদপ্রান্তে', 'হৃদয়ানন্দ', 'যাচে তৃষিত', 'প্রেম-নেত্রে' প্রভৃতি স্থানে সাত মাত্রা হয়ে যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণরীতি অনুসারে। পাঠের সময়ে এই সকল স্থানে উচ্চারণ সংকুচিত করতে হয় বৈষ্ণব পদের মতই। 'ভুবনেশ্বর হে' গানেও ছয় মাত্রার পর্ববিভাগ। সেইজন্য 'অন্ধযাত্রী'র 'যাত্রী' শব্দকে 'যাত্রি'রূপে উচ্চারণ করতে হয় 'পঠিত ছন্দে'। তেমনই আবার 'মুখ', 'সুখ' সঙ্গে মিলিয়ে 'জাগরূকে'র 'রূক'কে সংকুচিত করতে হয়। পক্ষান্তরে, 'শুভ্র নব শঙ্খ তব' গানটিতে 'জাগরণগীতে'র সঙ্গে মিলিয়ে 'মম হৃদয়কমল বিকশিত' এবং 'পুণ্যকরপরশ-হরষিত' অংশ দুটির 'শিত' ও 'ষিত'কে তিন মাত্রা করবার জন্য টেনে পড়তে হয়। এই গানের পূর্ণ পঙ্‌ক্তিতে মাত্রাবিভাগ নিম্নরূপ—

'শুভ্র নব | শঙ্খ তব || গগন ভরি | বাজে' ( ৫।৫॥৫।৪ )

তদনুসারে, 'গ্রহণ কর | তারে || তিমির পর : পারে'—পঙ্‌ক্তিটিতে দ্বিতীয় পর্বে এক মাত্রা কম আছে, কিন্তু 'পরপারে'র সঙ্গে মিলিয়ে সে ত্রুটি কানে লাগে না।

'জাগ' জাগ' রে জাগ' সংগীত' গানে আছে সাত মাত্রার প্রত্নরীতির ছন্দ। তাই 'তানে তানে প্রাণে প্রাণে' অংশে প্রথম 'তানে' ও প্রথম 'প্রাণে' শব্দে এ-কারের দীর্ঘত্ব বজায় রাখা যায় না।

এরকম ছন্দস্খলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে' গানটি। প্রথম পঙ্‌ক্তিটি পড়লে বোঝা যায়, গানটিতে প্রত্ন কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে সাত মাত্রার পর্ব গঠিত হয়েছে। কিন্তু তৎপরে 'হৃদে বিরাজ' ছাড়া আর সব পর্বেই মাত্রাসংকোচ করতে হয়। আর, শেষ তিনটি খণ্ড পঙ্‌ক্তিতে মনে হয়, একেবারে বাংলা কলাবৃত্ত ছন্দের মত মাত্রাবিভাগ।

"যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে॥"

অথচ, একে সম্পূর্ণভাবে কোনো বাংলা ছন্দোরীতিরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই জাতীয় ব্যতিক্রম ছন্দশিল্পী কবির স্বেচ্ছাকৃত।

এইভাবে, যেখানে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই ছন্দের সংকোচন-প্রসারণ রীতির ব্যতিক্রম দেখা গেছে খুব ঘন ঘন, সেখানে তার নাম দেওয়া যেতে পারে, 'স্বৈর প্রত্ন কলাবৃত্ত রীতি'। পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রকাব্যে প্রত্নরীতিব ছন্দ নেই, সুতরাং স্বৈর প্রত্নরীতি যে নেই-ই সে কথা বলা বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে, গানেই স্বৈরবৃত্ত রীতির অবকাশ থাকে। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে 'পঠিত ছন্দে ও গীত ছন্দে প্রভেদ' থাকে। ছন্দের ত্রুটি তাল দিয়ে রক্ষা করা যায়।

'প্রবাহিণী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি সবই গান, 'সুরে বসানো'। "এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বন্ধন নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" রবীন্দ্রনাথের গীতরচনা সম্পর্কে এ কথা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। ছন্দের অল্প-বিস্তর বেশ-কম উচ্চারণের সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা পূর্ণ করে নেওয়া চলে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। গানের সুরে তিন-চার মাত্রার অভাব পূরণ করা যায়, কিন্তু 'পঠিত ছন্দে' অতখানি টেনে পড়া যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটির পুনরুল্লেখ করি। এই গানে প্রত্নরীতি অনুসারে প্রতি পদে ষোল মাত্রা। কিন্তু, 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী', 'জনক-জননিজননী' এবং 'শুভ্রতুষারকিরীটিনী'— এই তিনটি পদে যথাক্রমে তেরো, দশ ও তেরো মাত্রা আছে। অথচ, এর পরবর্তী দুটি চতুষ্পদী পঙ্‌ক্তির শেষ পদে

পুরোপুরি ষোল মাত্রাই আছে। তাই প্রথমোক্ত তিনটি পদকে অসম্পূর্ণ বলা যায়, এবং সেই মাত্রা-সংক্ষেপ টেনে পড়েও সম্পূরণ করা যায় না। বাংলা ছন্দেও সেই-রকমই ত্রুটি আছে, 'দেখি নাই কভু দেখি না—ই, এমন তরণী বাওয়া' ( 'অমল ধবল পা-লে লেগেছে' )। অবশ্য এইরকম ছন্দোগত ত্রুটি রবীন্দ্র-গীতরচনায় বিরল।

বাংলার প্রত্ন কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলীতে দেখা গেলেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করবার কোন হেতু নেই। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বৈষ্ণব পদকর্তাদেরও ছন্দোগুরু জয়দেবের রচনা থেকেই এ ছন্দ রচনার অনুপ্রাণনা লাভ করেছিলেন।[1]

সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেছেন, গানে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর পূর্বোল্লিখিত 'বাণী ও বীণা' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বর্ণবৃত্ত ছন্দ কত সার্থকভাবে রবীন্দ্রসংগীতে প্রযুক্ত হয়েছে। তাঁর মতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'র কোন কোন গানে এবং 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানে 'তূণক' জাতীয় ছন্দের দোলা লেগেছে।

'তোটক' ছন্দ ভারতচন্দ্র সচেতন ভাবে রচনা করেছিলেন।—

˘˘ ¯˘˘ ¯˘˘ ¯˘˘ ˘¯

'দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে'।

রবীন্দ্রনাথও এই জাতীয় ছন্দকে হাসির গানে প্রয়োগ করেছিলেন।

"কত কাল-রবে বল ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।"

'চিরকুমার সভা'র এই গানটির সর্বত্র কিন্তু ছন্দের এই বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি, কিংবা সংস্কৃত উচ্চারণরীতি রক্ষিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের গম্ভীর রচনাতেও তোটক ছন্দের ছায়াপাতের দৃষ্টান্ত আছে।—

"শুভ কর্ম প | থে ধর | নির্ভয় | গান্।
সব দুর্বল | সংশয় | হোক্ অব | সান্॥

---

১. " 'জনগণমন-অধিনায়ক' সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় আমদানি।" —'ছন্দ', সাধুছন্দে হসন্ত প্রয়োগ। অন্যত্র বলছেন ( জনগণমন অধিনায়ক গানে ) "যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ লাগিয়ে ওটাকে আমাদের পাড়া থেকে জয়দেবীয় পল্লীতে চালান করে দেওয়া হয়েছে।" 'ছন্দ', ছন্দ ও উচ্চারণরীতি ১

চির- শক্তির | নির্ঝর | নিত্য ঝ | রে।
লহ' সে অভি | ষেক ল | লাট প | রে॥
তব জাগ্রত | নির্মল | নূতন | প্রাণ্।"

কিন্তু এই গানেরও শেষ অংশে তোটকের ছাঁদ বজায় থাকে নি। অন্য গানেও তোটকের ছাঁদ দেখা যায়।—

"কেন পান্থ এ | চঞ্চল | তা,
কোন্ শূন্য হ | তে এল | কার বার | তা।"

'ওরে চিত্ররেখা ডোরে বাঁধিল কে' গানটিতেও তোটকের বাঁধুনি পাওয়া যায়।

এই জাতীয় ছন্দের প্রকৃষ্ট উদাহরণ অপর একটি গান—

"মধু গন্ধে ভ | রা মৃদু | স্নিগ্ধ ছা | য়া
নীপ কুঞ্জ ত | লে,
শ্যাম কান্তি ম | য়ী কোন্ | স্বপ্ন মা | য়া
ফিরে বৃষ্টি জ | লে॥"

এই গানগুলিতে তোটক ছন্দের ছাপ সুস্পষ্ট হলেও, প্রয়োজনমতো রবীন্দ্রনাথ ছন্দের নিয়ম ভেঙে দিয়েছেন; সংস্কৃত উচ্চারণরীতিকেও বর্জন করেছেন। তার ফলে গানের ভাবই প্রধান হয়ে গানের মূল্যবত্তা বৃদ্ধি করেছে, গান ছন্দ-সর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত শেষ গানটির অংশ স্মরণ করা যায়।

"পিয়ে উচ্ছল | তরল প্র | লয় মদি | রা
উন্ মুখর ত | রঙ্গিণী | ধায় অধী | রা,
কার্ নির্ভীক | মূর্তি ত | রঙ্গ দো | লে
কল মন্দ্র রো | লে।
এই তারাহারা | নিঃসীম | অন্ধকা | রে
কার্ তরণী চ | লে॥"

লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখানে 'উন্', 'কার্', 'এই' প্রভৃতি জায়গায় হসন্ত শব্দের ব্যবহারে তোটকের রীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। আবার 'তরল প্র', 'লয় মদি', 'মুখর ত', 'তরণী চ' প্রভৃতি পর্বে তোটকের বিন্যাস ভেঙে দিয়ে চারটি লঘুধ্বনি স্থাপন করা হয়েছে, ভাষায় গতিবেগ সঞ্চারের জন্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ গীতরচনায় ছন্দশাস্ত্র অপেক্ষা ভাবকেই মূলতঃ অনুসরণ করেছেন। সমতল ভূমির উপর দিয়ে জলস্রোতের উচ্ছল কলধ্বনির মত ভাষা লঘু মুক্তদলকে আশ্রয় করে ছুটে চলেছে। ভাষার তরঙ্গভঙ্গ কবি এখানে রক্ষা করতে চান নি।

এইভাবে দেখা যায়, শুধু ছন্দের বৈচিত্র্যসাধন বা সুরবিস্তারের অবকাশ রক্ষার জন্যই নয়, ভাবের প্রাধান্য রক্ষা করার জন্যও কবি ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। সেখানে গানগুলি শিল্পকলাকে আশ্রয় করেই শিল্পকলাকে ছাড়িয়ে গেছে।

এবারে বাংলা ছন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক্। বাংলার 'অসাধু ছন্দ' অর্থাৎ দলবৃত্ত ছন্দ ছিল ছড়া-পাঁচালীর ছন্দ, অথবা একেবারেই লোকসাহিত্যের ছন্দ। সাধু সাহিত্যে এর সমাদর ছিল না। এই ছন্দের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' ও নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গলে'। তাঁরা একে 'লাচাড়ি' ছন্দ বলেছেন। এঁদের পরে লোচনদাস তাঁর 'ধামালী' রচনায় এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ভারতচন্দ্রও তাঁর কাব্যে একটি মাত্র স্থানে ( নারীদের মুখে ) এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কেউই একে লৌকিক পর্যায় থেকে উচে তোলেন নি।

রামপ্রসাদের গানে এই ছন্দ প্রথম গভীর ও গম্ভীর ভাবনার বাহন হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তখনও কাব্যে এর স্থান হল না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কখনো কখনো এই ছন্দে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু কাব্যের বাহন রূপে তখনও এ ছন্দ স্বীকৃতি পায় নি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায় এ ছন্দে কবিতা লেখেন, কিন্তু সেগুলি হাল্কা জাতের কবিতা।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ছন্দের মাধুর্য, সৌন্দর্য এবং গুরুত্ব অনুভব করেন এবং তাকে সুমার্জিত, সুনির্দিষ্ট ও বলিষ্ঠ রূপ দিয়ে উচ্চাঙ্গের কাব্যসাহিত্যের বাহন রূপে স্বীকৃতি দেন। রবীন্দ্রনাথের এ এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। 'ক্ষণিকা'তে ( ১৯০০ ) প্রথম এই ছন্দের পূর্ণ এবং সগৌরব প্রকাশ, যদিও এর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এর গুরুত্ব ও স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন এবং এর ইতস্ততঃ স্ফুরণও দেখা দিয়েছিল তাঁর কাব্যে।

> **"In Kshanika, I found my language. ...In Kshanika I first realized the beauty and music of the colloquial speech. That gave me an extraordinary sense of joy and power. ... There had been nothing like it in our literature before. But now we are flooded with it."**

**—Conversation with Edward Thompson.**

**'Rabindranath Tagore'—by Edward Thompson, 2nd ed. (1948). chapter 15 : pp. 174-75**

বাংলা ভাষার 'নিজস্ব কলধ্বনি'টি এই ছন্দে পরিপূর্ণভাবে ধরা দেয়। তাই এক-দিকে এই ছন্দে যেমন বাংলা ভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়, অন্যদিকে ভাষার অকৃত্রিমতার ফলে ছন্দও শক্তিশালী হয়। গানে এই ছন্দ পূর্ণতর, সুন্দরতর ও বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসংগীত-সম্ভারে কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত গানগুলি বাদ দিলে দলবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। এই রীতির ছন্দে আয়তনভেদে পর্বের গঠনবৈচিত্র্য-সাধনের পথ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ; তাই এর বহুরকম বন্ধ-বৈচিত্র্য সাধন করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আরও কয়েকজন কবি এই ছন্দে সার্থক কাব্য ও সংগীত রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তিনি সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গান রচনা করলেও সংস্কৃত উচ্চারণপদ্ধতি বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণরীতির অন্তরায় বলে সেই ছন্দকে ভেঙে একটি বাংলা রূপ দেন। এতে মূল আকৃতিটা একই রইল কেবল দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব আর বজায় রইল না। তৎপরিবর্তে রুদ্ধদল দুই মাত্রা বলে গণ্য হল। এই নব্য কলাবৃত্ত রীতির ছন্দের শুভযাত্রা শুরু হয় 'মানসী' রচনার সময়ে।

"In Manasi, I first used compound letters as equivalent to two matras."[১]

—পূর্ববৎ

শুধু প্রবর্তনা নয়, এই নতুন রীতির ছন্দ সুবিপুল বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বিভিন্ন আকারের পর্ব গঠন করে ও অজস্র রকমের ছন্দোবন্ধ গ্রন্থন করে কবি এই ছন্দকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলা সাহিত্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণেই এই ছন্দের সৃষ্টি। সেইজন্যই পূর্বে বলা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর পরে রবীন্দ্রসাহিত্যে বাংলা ছন্দের দ্বিতীয় ঢেউ ওঠে। সে ঢেউ প্রবলতর ও সমৃদ্ধতর হয়েছে গানে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ। প্রাচীন কবিরা 'পয়ার' বলতে এই মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেই বুঝিয়েছেন।

১. অবশ্য 'মানসী'র পূর্বে 'কড়ি ও কোমলে'র 'বিরহ' কবিতায় (প্রথম প্রকাশ: ১২৯৩, ভারতী ও বালক পত্রিকা) এই ছন্দের প্রথম নিদর্শন পাই। মনে হয় এই কবিতা 'মানসী' রচনার সময়েই রচিত, কড়ি ও কোমলে রয়ে গেছে যুথভ্রষ্ট হরিণের মত।

রবীন্দ্রনাথও 'মানসী' ও 'ক্ষণিকা'র পূর্বে প্রধানতঃ এই ছন্দেই কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর গীতরচনায় এই ছন্দের ব্যবহার সবচেয়ে কম।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের গীতরচনায় বাংলার এই তিন রীতির ছন্দের কত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপায়ণ ঘটেছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে প্রয়াসী হব।

দলবৃত্ত : দলবৃত্ত ছন্দে সাধারণতঃ চার মাত্রার পর্ব গঠিত হয়।

১. "প্রাঙ্গণে মোর | শিরীষশাখায় | ফাগুন মাসে |
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফুটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
"এসেছে কি—এসেছে কি'।"

২. "ডান হাতে তোর | খড়্গ জ্বলে, | বাঁ হাত করে | শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।...
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে, রৌদ্রবসনী।"

—আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে

কলাবৃত্ত : কলাবৃত্ত রীতিতে গঠিত চতুষ্কল, পঞ্চকল, ষট্‌কল ও সপ্তকল পর্বের দৃষ্টান্ত আছে গানে।

চতুষ্কল পর্ব—

১. "ওগো বধূ | সুন্দরী, | তুমি মধু | মঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে ফাল্গুনরাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।"

২. "উদ্‌বেল | উতরোল | যমুনার | কল্লোল,
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন।
আনো নবপল্লবে নর্তন উল্লোল,
অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরীবন্ধন॥"

—তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি

পঞ্চকল পর্ব—

১. "আধেক ঘুমে | নয়ন চুমে | স্বপন দিয়ে | যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়॥...

চৈত্রদিনে তপ্ত বেলা তৃণ-আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধ-ভেলা ভাসায় বাতাসেতে—
কপোত ডাকে মধুকশাখে বিজন বেদনায় ॥"

২. "নিবিড় অমা- | তিমির হতে | বাহির হল | জোয়ার-স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।...
উৎসবের পশরা নিয়ে পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী ॥"

ষট্‌কল পর্ব—

১. "নীল, অঞ্জনঘন | পুঞ্জছায়ায় | সম্বৃত অম্ | বর
হে গম্ভীর!...
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসবমন্দির হে গম্ভীর ॥"

২. "নৃত্যের বশে | সুন্দর হল | বিদ্রোহী পর | মাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।"

—নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ

সপ্তকল পর্ব—

১. "ধ্বনিল আহ্বান | মধুর গম্ভীর | প্রভাত-অম্বর- | মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসংগীত বাজে।...
কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ—
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণকাজে।"

২. "হৃদয়ে মন্দ্রিল | ডমরু গুরু গুরু, |
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর—
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথিরে।"

এই জাতীয় সপ্তকল পর্ব কবিতায় দুর্লভ হলেও, গানে সুলভ।

মিশ্রবৃত্ত: রবীন্দ্রসংগীতে মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

চতুষ্কল পর্ব—

১. "দীপ নিবে | গেছে মম | নিশীথ স | মীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে ॥

এপথে যখন যাবে আঁধারে চিনিতে পাবে—
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে ॥"

২. "সহসা উ | চ্ছুসি উঠে | ভরিয়া আ | কাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস
অম্বরপ্রান্তে যে দূরে ডম্বরু গম্ভীর স্বরে
জাগায় বিদ্যুতছন্দে আসন্ন বৈশাখী—
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী ॥"

—মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে চতুষ্কল পর্বই সুপরিচিত। তবে, ষট্‌কল পর্বেরও দৃষ্টান্ত মেলে।

"প্রতিদিন আমি, | হে জীবনস্বামী, | দাঁড়াব তোমারি | সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥···
তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে কর্মপারাবারপারে হে—
নিখিল ভুবনলোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥"

রবীন্দ্রনাথ ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে ( 'তিন মাত্রার ছন্দ' ) পছন্দ করতেন না। তাই 'যুক্ত অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করবার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমই পেয়ে বসছিল।' এরপর 'মানসী' লিখবার সময়ে তিনি সংকল্প করলেন, 'যুক্তধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব দিয়ে ছন্দকে ধ্বনিবন্ধুর করব।' রুদ্ধদলে এক মাত্রা গণনা করলে তা শ্রুতিমধুর হয় না, কিন্তু রুদ্ধদলে দুই মাত্রা ধরলে ছন্দোভঙ্গি তরঙ্গিত হয়, এ কথা কবি জানতেন। মানসীর পূর্বে তিনিও 'আহ্বানগীত' প্রভৃতি কবিতায় ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ রচনা করেছেন, অন্যান্য কবিদের রচনা তো ছিলই। কিন্তু 'মানসীর সময় থেকে আমি অসমমাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রার value দিয়ে আসছি এবং বাংলা সাহিত্যে এই রীতিটাই চলে গেছে।'[১] তথাপি কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতার ( 'কথা ও কাহিনী' ) উল্লেখ করেছেন। উপরি-উদ্ধৃত গানটিও ( 'নৈবেদ্য' ) সেই ব্যতিক্রমেরই নিদর্শন।

স্বৈরবৃত্ত : গানে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনমতো সংস্কৃত ছন্দকে ভেঙেছেন, তেমনই বাংলা রীতির ছন্দকেও ভেঙেছেন। অনেক সময় সুরবিস্তারের সহায়তার জন্য কোনো কোনো পর্বে মাত্রাহ্রাস করেছেন। যেমন—

১। 'অমল ধবল পা-লে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'

১. দ্রষ্টব্য : 'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত-হলন্ত ২ ; ছন্দের প্রকৃতি ; ছন্দবিচার ১

২। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ মা-লা- তুমি আমার সাধের সাধনা'

৩। 'এসো দুঃখে সুখে-, এসো মর্মে এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,

৪। কী- গাব আমি কী- শুনা-ব আজি আনন্দধামে।

আবার কোথাও বা মাত্রাবৃদ্ধি ঘটেছে।

"অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশা 'দিয়েছি জলান্'জলি।"

গীতরচনার এই জাতীয় ছন্দ সম্পর্কে কবির কৈফিয়ৎ—এগুলিতে,

"গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হল। যদি বল, পাঠকেরা তো শ্রোতা নয়, তারা মাপ করবে কেন? হয়তো করবে না—কবি জোড়হাত করে বলবে, 'তাল দ্বারা ছন্দ রাখিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন'।"

—'ছন্দ', বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ ১

সাধারণতঃ কবিতায় একক মুক্তদলের দীর্ঘত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। যেমন—

না-, না- গো না-, কোরো না ভা-বনা।

কিংবা,

"গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা- খাস নে।"

কিন্তু যখন একটি শব্দের মধ্যেই মুক্তদলের উচ্চারণ প্রসারিত করতে হয়, তখন তাকে ছন্দের অপূর্ণতা বলা যায়। অবশ্য সেগুলি কবির স্বেচ্ছাকৃত, অনবধানতা-প্রসূত নয়। এই ঘাটতি সুরের বা 'তালে'র সাহায্যে পূরণ করে নিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছন্দের ঘাটতি পূর্ণ করতে গেলে ভাব বা ভাষার সৌন্দর্যহানি ঘটে। সে সব ক্ষেত্রেও কবি ছন্দেরই অঙ্গহানি করেছেন। কারণ 'মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।'

এইভাবে যখন পুনঃপুনঃ 'তালদ্বারা' ছন্দ রক্ষা করতে হয়, উচ্চারণের সংকোচন-প্রসারণ এবং মাত্রাবিভাগ ঠিক প্রত্যাশিতরূপে ঘটে না—তখন তাকে স্বৈরবৃত্ত বা মুক্তবৃত্ত ছন্দ ( free style verse ) আখ্যা দেওয়া যায়।[১] জীবনের প্রথম প্রহরে রবীন্দ্রনাথ 'ছবি ও গান' কাব্যে ( ১৮৮৪ ) এই স্বৈরবৃত্ত ছন্দে কাব্যরচনার প্রচেষ্টা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ( 'বিজ্ঞাপন' ) কবি

১. দ্রষ্টব্য : 'ছন্দ', অনুষঙ্গ ১ ; ছবি ও গান কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ : প্রথম পর্যায়

লিখেছেন—

"এই পুস্তকের কোনো কোনো গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে সকল পাঠকের কান আছে, তাঁহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন, দেখিতে পাইবেন বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর; হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোনো কোনো স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত হইবে।"

মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে শব্দান্তের রুদ্ধদলের ( 'হসন্ত বর্ণ' ) উচ্চারণ প্রসারিত এবং তদনুসারে দুই মাত্রা বলে গণ্য। ছবি ও গানের কয়েকটি কবিতায় 'বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ' বজায় রেখে সেগুলিকে এক মাত্রা ধরা হয়েছে। সেইজন্যই কবি বলেছেন কোনো কোনো গানে ছন্দ নেই বলে মনে হতে পারে। অর্থাৎ এই কবিতাগুলিতে কবি মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন সচেতনভাবেই। বস্তুতঃ এই কাব্যের অনেক স্থলেই দলবৃত্ত ছন্দের বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু প্রকাশ দেখা গেছে। যাই হোক, ছবি ও গানের মুক্তবৃত্ত ছন্দের একটু নমুনা দেওয়া গেল।

"ধীরে ধীরে 'প্রভাত' হল, আঁধার মিলায়ে গেল,
উষা হাসে কনকবরণী···
বহিছে 'প্রভাত' বায়, আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল।"

—'ছবি ও গান', বিরহ

এখানে একই 'প্রভাত' শব্দ এক জায়গায় স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণে এক মাত্রা, অন্য জায়গায় সাধু উচ্চারণে অকারান্ত ও দুই মাত্রা। এই কাব্যের 'কে', 'দোলা', 'আদরিণী', 'খেলা' প্রভৃতি এগারোটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদী ভঙ্গিতে হসন্ত শব্দে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসরণ করেছেন। তবে সর্বত্র নয়। এখানে কাব্যের প্রয়োজন অনুসারে স্বেচ্ছায় হসন্ত শব্দের কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দ্বিবিধ উচ্চারণের সমাবেশ ঘটিয়ে যথার্থ স্বৈরবৃত্ত ছন্দ সৃষ্টি করেছেন।

যে কারণেই হোক, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে কাব্যে এই জাতীয় ছন্দ আর রচনা করেন নি। কিন্তু গানে এই ছন্দের বহুল ব্যবহার ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ছবি ও গানের বিজ্ঞাপনে ছন্দ প্রসঙ্গে কবি 'গান' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। সে কথা সর্বৈবরূপে সত্য না হলেও, পরবর্তী কালে গানেই এই

ছন্দের উত্তরাধিকার বজায় থেকেছে। যেমন—

"হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
'ঝরা শেফালির' পথ বাহিয়া॥
'কোন্ অমরার' বিরহিণীরে চাহ নি ফিরে,
'কার বিষাদের' শিশিরনীরে এলে নাহিয়া।
'ওগো অকরুণ' কী মায়া জানো,
মিলনছলে বিরহ আনো।
'চলেছ পথিক' আলোকযানে আঁধার-পানে
মনভুলানো মোহনতানে গান গাহিয়া॥"

গানটির ছন্দোরীতি কলাবৃত্ত। কলাবৃত্ত রীতির নিয়মানুসারে 'ঝরা শেফালির', 'কোন্ অমরার', 'কার বিষাদের', 'ওগো অকরুণ', 'চলেছ পথিক', এই পাঁচটি পর্বের প্রত্যাশিত মাত্রাসংখ্যা ছয়। কিন্তু শব্দান্তের রুদ্ধদলের সংকুচিত উচ্চারণের ফলে সেখানে এক মাত্রাই ধরা যায়, এবং ছন্দের পতন ঘটেছে বলে মনে হয় না। অথচ, 'হে ক্ষণিকের', 'মোহনতানে' প্রভৃতি পর্বে শব্দান্তস্থিত রুদ্ধদল প্রসারিত ও দুই মাত্রা। এখানে সার্থক স্বৈরবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। এই রকমই আর একটি গান—

"ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি, 'অনেক অশ্রু'জলে
ফাগুন দিল 'বিদায়মন্ত্র' আমার হিয়াতলে॥
ঝরা পাতা গো, 'বসন্তী রঙ' দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ।
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
'বসন্তের এই' চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো 'আমারো উত্ত'রী
আগুন রঙে দিয়ো রঙিন করি—
অস্তরবি 'লাগাক পরশ'মণি
প্রাণের মম 'শেষের সম্ব'লে ।"

এই গানে 'অনেক অশ্রু', 'বিদায়মন্ত্র', 'বসন্তী রঙ', 'বসন্তের এই', 'আমারো উত্ত'( রী ), 'লাগাক পরশ', 'শেষের সম্ব'( লে ) ইত্যাদি পর্বগুলিতে গানের মূল

অবলম্বন পাঁচ কলামাত্রা বজায় থাকে নি। পর্বগুলিতে প্রয়োজনমতো রুদ্ধদলের উচ্চারণ-সংকোচ করে মাত্রাসাম্য রক্ষা করতে হয়।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের গানেও 'স্বৈরবৃত্তি' দেখা যায়। 'হৃদয়-নন্দনবনে' গানটি চার মাত্রার মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। কিন্তু 'দেখাও তব', 'শুভরজনী', 'সফল করো', 'ধ্বনিত করো', 'সুধানির্ঝর'— এই পর্বগুলিতে পাঁচ মাত্রা হয়ে যায়। এখানে লক্ষণীয় যে, পর্বগুলির শেষে সব সময় 'হসন্ত বর্ণ' বা রুদ্ধদলও নেই যে, সংকুচিত উচ্চারণে 'তালরক্ষা' করা যাবে। পক্ষান্তরে, 'পাসরি সর্বদুখ' পদে এক মাত্রা টেনে পড়তে হয় ( 'পা-সরি' )।

দলবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন এ ছন্দ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। অপর দুই ছন্দের উচ্চারণে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য সে কৃত্রিমতা ভাষার পক্ষে যতটা সয়, ততটাই কাব্যে ব্যবহৃত হয়। গানে কৃত্রিমতাকে আরও বেশি প্রশ্রয় দেওয়া যায়; তাই প্রত্নরীতি এবং ভাঙা প্রত্নরীতির ব্যবহার গানেই সম্ভব। ছড়ার ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ( 'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ) —

> "সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে; এ দুয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ। প্রকৃতি আমের মধুরতায় জল মিশিয়েছেন, তাকে আমসত্ত্ব করে তোলেন নি; সেজন্যে রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই কৃতজ্ঞ।"

এ কথা গান সম্পর্কে অধিকতর প্রযোজ্য। গানে ছন্দের যে কোনো অভাব পূরণ করা যায়। পক্ষান্তরে, সুরের পাখা মেলবার অবকাশের জন্য গানে স্বেচ্ছায় ফাঁক রাখা হয়।

যাই হোক, দলবৃত্ত ছন্দে বাংলার 'স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার' করার ফলে তার মধ্যে বৈচিত্র্যসাধনের সুযোগ খুবই বেড়ে গেছে। যুক্তবর্ণ বা খণ্ডবর্ণ সূচিত রুদ্ধদল[১] এবং মুক্তদল—সবগুলিকেই প্রয়োজনমতো যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যায়। কখনও মুক্তদলের ব্যবহারে 'স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে বাড়ানো' যায় আবার কখনও রুদ্ধদলের ব্যবহারে ছন্দকে বাজিয়ে তোলা যায়। এই সব কারণে দলবৃত্ত ছন্দে স্বাভাবিক ভাবেই বৈচিত্র্যসাধনের পথ এত প্রশস্ত যে, সেখানে আর স্বৈরবৃত্তির প্রয়োজন থাকে নি।

দলবৃত্ত ছন্দের গানে একক মুক্তদলের দীর্ঘত্ব পুনঃপুনঃ স্বীকার করা হয়েছে

১. খণ্ডবর্ণ সূচিত রুদ্ধদল, যথা—যাই, যাও, মাস্, দিন্। যুক্তবর্ণ সূচিত রুদ্ধদল, যথা—ছন্দ ( ছন্. দ ), মুক্ত ( মুক্. ত ), দৈব ( দই. ব ), গৌণ ( গউ. ন )

স্বরবিস্তারের জন্য। যেমন—

"ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না- না- না।'...
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা- হা- ফুলের বনে।"

যে বৈচিত্র্যসাধনের জন্য কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত ছন্দে স্বৈরবৃত্তির প্রয়োজন হয়, দলবৃত্ত ছন্দে আপনিই সেই বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। স্বাভাবিকতার জন্য দুরূহ ও প্রাঞ্জল—দুইরকম শব্দই এই ছন্দে অনায়াসে খাপ খেয়ে যায়।

গীতবিতানে স্বৈরবৃত্ত ছন্দের গান অজস্র। এই জাতীয় আর একটি গানের কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করা যাক্।—

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে না-চে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বা-জে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।" ইত্যাদি

এই গানে 'কে যে নাচে' আর 'সদা বাজে' পর্ব দুটিতে 'না-চে' ও 'বা-জে' উপপর্ব দুটিকে টেনে পড়ে পাঁচ কলামাত্রার পূর্ণ পর্ব করতে হয়। আবার 'তাতা থৈ থৈ'-এর দ্বিতীয় 'থৈ' সংকুচিত উচ্চারণে এক কলামাত্রা। গানটির আর একটি বৈশিষ্ট্য দুই-তিন মাত্রার উপপর্ব-বিভাগ। সাধারণতঃ পাঁচ-কলামাত্রার বিভাগ হয় তিন-দুই মাত্রায়। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তদনুরূপ 'ঝম্পক' তাল[১] প্রবর্তিত করেছেন গানে। কিন্তু উক্ত গানটিতে ঝাঁপতালের মত উপপর্ব-বিভাগ স্বীকৃত। সাধারণতঃ গানটি 'কাশ্মীরী খেম্‌টা' তালে (৩।৩) গাওয়া হলেও, একে 'ষষ্ঠী' তালেও (২।৪) গাওয়া যায়। সেখানে 'পঠিত ছন্দ ও গীত-ছন্দে'র পার্থক্য ঘটে কেবলমাত্র দ্বিতীয় উপপর্বের এক মাত্রায়।

এইভাবে দেখি গীতবিতানে ভাবের বিভিন্নতা ও সূক্ষ্মতার যেমন কোনো তুলনা নেই, তেমনই এর ছন্দোরীতির বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বেরও কোনো তুলনা নেই। ভারতীয় বা বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, রবীন্দ্রকাব্যেও ছন্দোরীতি-বৈচিত্র্যের এমন বিপুল সমাবেশ ঘটে নি।

**রবীন্দ্র-গীতরচনার ছন্দোবন্ধ :** ছন্দোরীতির মত গীতবিতানের ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্য ও সম্পদও যথার্থ বিস্ময়ের বস্তু। এতরকমের ছন্দোবন্ধ গঠন করেছেন রবীন্দ্রনাথ

---

১. ঝাঁপতালে দুই-তিন মাত্রার পর্ববিভাগ স্বীকৃত। এই তাল শাস্ত্রীয় তাল। ঝম্পক শাস্ত্রীয় তাল নয়। তিন-দুই মাত্রার পর্ববিভাগ-যুক্ত এই তাল রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত করেছেন।

যে তার যেন অন্ত পাওয়া যায় না। নিঃশেষে তার পরিচয় দেওয়া স্বল্প পরিসরে দুঃসাধ্য, তাই সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে ছন্দোবন্ধের কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা গেল।

বাংলা ছন্দের প্রধান বন্ধ চারটি—একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী। এর মধ্যে দ্বিপদী বন্ধেরই প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি; আবার বিভিন্ন প্রকার দ্বিপদীর মধ্যে আট-ছয় মাত্রার বন্ধটি সর্বাধিক প্রচলিত এবং 'পয়ার' এই বিশেষ নামে সুপ্রচলিত। অন্য কোন বন্ধের এরকম কোন বিশেষ নাম নেই। রীতিভেদে সব বন্ধই তিনরকম। পয়ারও তিন রকম—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত।

সাধারণতঃ গানের বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী হয়। গানের দ্বিতীয়াংশও আবার সেইভাবেই সাজানো থাকে। যেমন—

"আলোয় আলোকময় করে হে ‖ এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার ‖ মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা ‖ আনন্দে হাসিতে ভরা ‖
যে দিক পানে নয়ন মেলি ‖ ভালো সবই ভালো"।

এর ছন্দ দলবৃত্ত পয়ার। অধুনা-পূর্ব বাংলা কাব্য ও গীতসাহিত্যের অন্যতম মুখ্য বাহন ছিল এই পয়ার-বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ পয়ার-বন্ধকে বজায় রাখলেও, অন্যান্য বিভিন্ন জাতীয় দ্বিপদী বন্ধ রচনা করেছেন এবং রবীন্দ্র-গীতরচনায় পয়ার-বন্ধের প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে বলেও মনে হয় না। নীচে যথাক্রমে বিভিন্ন বন্ধের কিছু দৃষ্টান্ত এবং প্রত্যেক বন্ধেরই রীতিভেদে বিভিন্ন রূপ দেখানো গেল।—

### একপদী

দলবৃত্ত :

১. "সকল জনম | ভরে
ও মোর দরদিয়া।
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া॥"

এই গান দলবৃত্ত ছন্দে সার্ধপর্বিক একপদী বন্ধে রচিত ( ৪+২ )।

কলাবৃত্ত :

২. "এ যে মোর আব | রণ
ঘুচাতে কতক্ষণ।"

এটি কলাবৃত্ত ছন্দের সার্ধপর্বিক একপদী ( ৬+২ )।

**দলবৃত্ত ঃ**

৩. "ভরা থাক্ : স্মৃতিসুধায় | বিদায়ের : পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিও আনি॥"

এই গানের বন্ধ দ্বিপর্বিক একপদী। পর্বগুলি তিন-চার মাত্রার সপ্তদল পর্ব। সেই কারণে তিন মাত্রার পরে উপযতি চিহ্ন দেওয়া হল। দলবৃত্ত ছন্দে এই রকম সপ্তদল পর্বগঠনের নিদর্শন কাব্যে আছে বলে মনে হয় না।

৪. "তুমি যে : চেয়ে আছ | আকাশ ভরে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে॥"

এটিও দলবৃত্ত দ্বিপর্বিক একপদী। প্রথম পর্বটি তিন-চারে মিলে সপ্তদল পর্ব, শেষ পর্বে চার মাত্রা। এই জাতীয় বন্ধ রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যে সুলভ হলেও কাব্যে দুর্লভ।

**কলাবৃত্ত ঃ**

৫. "জীবনে : যত পূজা | হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।"

এটি কলাবৃত্ত দ্বিপর্বিক একপদী। প্রথম পর্বে তিনে-চারে সাত কলামাত্রা ও দ্বিতীয় অপূর্ণ পর্বে পাঁচ কলামাত্রা।

৬. "জীবন মরণের | সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে॥"

কলাবৃত্ত দ্বিপর্বিক একপদী এটি। প্রথম পর্বে সাত ও দ্বিতীয় পর্বে ছয় মাত্রা।

৭. "মুখে নাহি | নিঃসরে | ভাষ,
দহে অন্তরে নির্বাক বহ্নি।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস,
তব মর্মে যে ক্রন্দন তন্বী॥"

—প্রাণ চায় চক্ষু না চায়

কলাবৃত্ত ছন্দে সার্ধ দ্বিপর্বিক একপদী বন্ধের একটি অভিনব নিদর্শন এই গান। পদের মাত্রাবিভাগ চার-চার-দুই। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তির সামনে দুই মাত্রার একটি করে অতিপর্ব আছে।

৮. "ভেঙেছ দুয়ার | এসেছ জ্যোতির্ | ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়॥"

এটিও কলাবৃত্ত একপদী। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ছয়-ছয়-দুই মাত্রাবিভাগ। আর, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ছয়-দুই মাত্রার ভাঙা পঙ্‌ক্তি।

দলবৃত্ত :

৯. "রয় যে কাঙাল | শূন্য হাতে | দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে স্বপনবেশে॥
আলোয় যারে মলিনমুখে মৌন দেখি
আঁধার হলে আঁখিতে তার দীপ্তি এ কি—
বরণমালা কে যে দোলায় তাহার কেশে॥"

এটি দলবৃত্ত ত্রিপর্বিক একপদী বন্ধের গান। প্রতিটি পর্বই চার মাত্রার পূর্ণপর্ব। ত্রিপর্বিক একপদীর এই জাতীয় নিদর্শন কাব্যে বিরল।

কলাবৃত্ত :

১০. "কোথা বাইরে দূরে | যায় রে উড়ে | হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।"

এই কলাবৃত্ত ত্রিপর্বিক একপদীতে পাঁচ মাত্রার পর্ব গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শুরুতে একটি করে অতিপর্ব আছে।

দলবৃত্ত :

১১. "মাটির বুকের মাঝে | বন্দী যে জল | মিলিয়ে থাকে
মাটি পায় না তাকে॥
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে
আকাশপুরে,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে,
মাটি পায় না তাকে।"

এই দলবৃত্ত একপদী বন্ধের অভিনবত্ব ও নূতনত্ব লক্ষণীয়। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে একটি অতিপর্ব এবং চার-মাত্রার তিনটি পূর্ণ পর্ব। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে একটি অতিপর্ব ও একটিমাত্র পূর্ণ পর্ব। কিন্তু চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে সেই অতিপর্বটিও নেই।

কলাবৃত্ত :

১২. "একদা : তুমি প্রিয়ে, | আমারি এ | তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে সে কথা যে গেছ ভুলে॥
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলে নি,
তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,
তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে।"

এই ত্রিপর্বিক একপদী বন্ধে মাত্রাবিভাগ সাত-চার-চার কলামাত্রায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মিলগুলিও লক্ষণীয়। মানসী কাব্যের 'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিক মিলন' কবিতা দুটির ছন্দোবন্ধের সঙ্গে এর গভীর সাদৃশ্য আছে।

## দ্বিপদী

দলবৃত্ত :

১. "আমি তোমায় | যত ‖ শুনিয়েছিলেম | গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান ॥"

এই দলবৃত্ত দ্বিপদী বন্ধে, প্রত্যেক পদের প্রথম পর্বে চার মাত্রা ও দ্বিতীয় অপূর্ণ পর্বে দুই মাত্রা।

কলাবৃত্ত :

২. "প্রতিদিন তব | গাথা ‖ গাব আমি সুম | ধুর—
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর।"

এই কলাবৃত্ত দ্বিপদীর প্রতি পদে ছয় মাত্রার একটি পূর্ণ পর্ব ও দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব আছে।

৩. "দুয়ার মোর | পথপাশে ‖ সদাই তারে | খুলে রাখি
কখন্ তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি ॥
শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে লাগায় গুরু গরো-গরো,
ফাগুনে শুনি বায়ুবেগে জাগায় মৃদু মরো মরো
আমার বুকে উঠে জেগে চমক তারি থাকি থাকি ॥"

এই গানকে দ্বিপদী মনে করলে, প্রত্যেক পদের প্রথম পর্বে পাঁচ ও দ্বিতীয় পর্বে চার কলামাত্রা। কিন্তু এর প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে মিল থাকায়, মনে হয় এর একপদী রূপ হয়তো রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল।

৪. "প্রেমমুখহাসি | তাঁহারি ‖ পড়িছে ধরার | আননে—
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।...
জগত যে দিকে চাহিছে সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।"

—আঁধার রজনী পোহালো

এই দ্বিপদীতে প্রতি পদের প্রথম পর্বে ছয় ও দ্বিতীয় পর্বে তিন কলামাত্রা আছে।

৫. আয় আমাদের | অঙ্গনে ‖ অতিথি বালক | তরুদল—
মানবের স্নেহসঙ্গ নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্ ॥...

তোদের নবীন পল্লবে নাচুক আলোক সবিতার
দে পবনে বনবল্লভে মর্মরগীত-উপহার।"

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তটির সঙ্গে এর পার্থক্য পদের দ্বিতীয় পর্বে এক মাত্রার বৃদ্ধি।

দলবৃত্ত :

৬. এবারে ঘুচল কি ভয়, | এবারে হবে কি জয় ‖
আকাশে হল কি ক্ষয় | কালীর লেখা ॥...
ওরে তুই সকল ভুলে চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে—
নীরবে চরণমূলে মাথা ঠেকা ॥"

—আলো যে যায় রে দেখা

এই দ্বিপদী বন্ধের প্রতি পূর্ণ পর্বে সাত দলমাত্রা, শেষ অপূর্ণ পর্বে চার দলমাত্রা। পূর্ণ পর্বে তিন-চার দলমাত্রার উপপর্ব-বিভাগ।

কলাবৃত্ত :

৭. "যে ফুল না ফুটিতে | ঝরেছে ধরণীতে ‖
যে নদী মরুপথে | হারালো ধারা...
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা।"

—জীবনে যত পূজা হল না সারা

এই দ্বিপদীর প্রতি পূর্ণ পর্বে সাত কলামাত্রা, শেষ অপূর্ণ পর্বে পাঁচ কলামাত্রা। পূর্ণ পর্বে তিন-চার মাত্রার বিভাগ।

## ত্রিপদী

দলবৃত্ত :

১. "সুদূর দেশের | বাণী ও যে ‖ যায় বলে, হায়, | কে তা বোঝে ‖
কী সুর বাজায় | একতারাতে ॥...
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে গান যে ওরে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে ॥"

—সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর

এই দলবৃত্ত ত্রিপদীর পদবিভাগ আট-আট-আট দলমাত্রায়।

কলাবৃত্ত :

২. "বহুদিন | বঞ্চিত ‖ অন্তরে | সঞ্চিত ‖
কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই মিটিল সে পরশের
তিয়াষা।"

—দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই

কলাবৃত্ত রীতিতে পদবিভাগ আট-আট-চার মাত্রায়। বলা বাহুল্য, শেষ পদটি প্রকৃতপক্ষে একটি পর্ব এবং সেখানেও টেনে পড়ে চার মাত্রা করতে হয়।

দলবৃত্ত :

৩. "বাহুপাশের | কাঙাল সে যে ‖ চলেছে তাই | সকল ত্যেজে ‖
কাঁটার পথে | ধায় সে তোমার | অভিসারে ‖…
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম      ঝড়ের রাতের পাখি-সম,
বাহির হয়ে এসো তুমি অন্ধকারে ‖"

—আমার ব্যথা যখন আনে আমায়

এই দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম দুই পদে আট মাত্রা, তৃতীয় পদে বারো মাত্রা।

৪. "তাণ্ডবে ওই | তপ্ত হাওয়ায় | ঘূর্ণি লাগায়, ‖
মত্ত ঈশান | বাজায় বিষাণ | শঙ্কা জাগায় ‖
ঝংকারিয়া | উঠল আকাশ | ঝঞ্ঝারবে ‖…
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে—
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা কবে ‖"

—ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক

এই দলবৃত্ত ত্রিপদীর প্রতি পদ ত্রিপর্বিক ; পর্বগুলি চার মাত্রা-সমন্বিত।

কলাবৃত্ত :

৫. "এসো   অঙ্গে পুলকময় পরশে, ‖ এসো   চিত্তে সুধাময় হরষে, ‖
এসো   মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে ‖
এসো   নির্মল উজ্জ্বল কান্ত, এসো   সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত
এসো   এসো হে বিচিত্র বিধানে ‖"

—তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে

এখানে তিনটি পদেই বারো কলামাত্রা ( টেনে পড়তে হবে )। প্রতি পদের পূর্বে একটি করে অতিপর্ব আছে।

কলাবৃত্ত :

৬. "বিরাম হল | আরামহীন ‖ যদি রে তোর | ঘরে ‖
না যদি রয় | সাথি,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন      মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বলে বাতি।"

—বাহির পথে বিবাগি হিয়া

এই ত্রিপদীর প্রথম পদে পাঁচ মাত্রার দুটি পূর্ণ পর্ব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে পাঁচ ও দুই মাত্রার দুটি পর্ব। এখানে মিলের বৈশিষ্ট্যটুকুও লক্ষণীয়।

৭. "মধুপগুঞ্জে সে | লহরী তুলিবে ॥
কুসুমপুঞ্জে সে | পবনে দুলিবে ॥
ঝরিবে শ্রাবণের | বাদলসিচনে।"

—সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে

এখানে পদ গঠিত হয়েছে সাত-ছয় কলামাত্রায়। তিনটি পদই সমায়তন।

দলবৃত্ত :

৮. "প্রভু, তোমার বীণা | যেমনি বাজে ॥
আঁধার মাঝে ॥
অমনি ফোটে | তারা।
যেন, সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনিধারা ॥"

মাত্রার হিসাবে একে মহাপয়ার বলা যায়। কিন্তু এর মেজাজটি অনুসরণ করলে একে খণ্ডিত ত্রিপদী বলতেই ইচ্ছা হয়।[১] দলবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক ও সাবলীল চলনভঙ্গি এখানে সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মতে ( 'ছন্দ', ছন্দেব প্রকৃতি ) —

"এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানাভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে-ঘষে এব শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।"

কবি দৃষ্টান্তস্বরূপ লালন ফকিরের গান তুলেছেন—

"আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা ॥
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন্ পাগেলা।" ইত্যাদি

এই বাউল গানের সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত গীতরচনাটির ছন্দ মিলিয়ে পড়লে উভয়ের সাদৃশ্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

---

১. 'পুরবী' কাব্যের 'পূর্ণতা' কবিতার সঙ্গে এর তুলনা চলে। ঐ কবিতা খণ্ডিত ত্রিপদী। উভয়ের পার্থক্য হল, পূর্ণতা মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত ; পদবিভাগ আট-চার-দশ মাত্রায়। এই গান দলবৃত্ত ছন্দে আট-চার-ছয় মাত্রায় বিভক্ত।

## চৌপদী

**দলবৃত্ত :**

১. "এই দুয়ার-দেওয়া | ঘরে ‖
কভু আঁধার নাহি | সরে, ‖
তবু আছ তারি | 'পরে ‖
ও মোর দর | দিয়া।
সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া ॥"

—সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদিয়া

পদের মাত্রাবিভাগ চার-দুই মাত্রা। প্রথম তিন পদে অতিপর্ব আছে।

**কলাবৃত্ত :**

২. "বিষাদে হয়ে | ম্রিয়মাণ ‖
বন্ধ না ক | রিয়ো গান ‖
সফল করি | তোলো প্রাণ ‖
টুটিয়া মোহকারা ॥···
সংসারের সুখে দুখে
চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে
ভরিয়া সদা রেখো বুকে
তাঁহারি সুধাধারা ॥"

—নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা

এখানে পদের মাত্রাবিভাগ পাঁচ-চার কলামাত্রা। শেষ অপূর্ণ পদে পাঁচ-দুই কলামাত্রা।

৩. তোমার বিশ্ব | ছবিতে ‖
তব প্রেমরূপ | লভিতে, ‖
গ্রহ-তারা-শশী | রবিতে ‖
হেরিতে তোমার | আরতি।
বচনমনের অতীতে
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী ॥"

—বল দাও মোরে বল দাও

এখানে ছয়-তিন কলামাত্রায় পদ গঠিত হয়েছে।

৪. "আকাশেতে ঘোরে | ঘূর্ণি ||
স্বষ্টির বাঁধ | চূর্ণি ||
বজ্রভীষণ | গর্জনরব || প্রলয়ের জয় | ডঙ্কার।
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি,
সুরপরিষদ বন্দী—
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝঙ্কার।"

—পিনাকেতে লাগে টঙ্কার

এর প্রথম দুই পদ ছয়-তিন কলামাত্রায় গঠিত। তৃতীয় পদে দুটি ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং চতুর্থ পদে একটি ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্ব ও একটি চার মাত্রার অপূর্ণ পর্ব।

দলবৃত্ত :

৫. "প্রভাতে পথিক ডেকে | যায়, ||
অবসর পাই নে আমি | হায় ||
বাহিরের খেলায় ডাকে | যে, ||
যাব কী ক' | রে ||...
যে আমার নতুন খেলার জন
তারি এই খেলার সিংহাসন,
ভাঙারে জোড়া দেবে সে
কিসের মন্তরে ||"

—খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি

দলবৃত্ত রীতিতে এর প্রতি পদে সাত-এক মাত্রা। চতুর্থ অপূর্ণ পদে চার-এক মাত্রা। একপদী বন্ধের নিদর্শনরূপে সপ্তদল-পর্বিক 'ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়' গানটি উদ্‌ধৃত হয়েছে যথাস্থানে। এখানে আরও এক মাত্রার যোগে ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

৬. "বসব তোমার | পথের ধুলার | 'পরে, ||
এড়িয়ে আমায় | চলবে কেমন | করে ||
তোমার তরে | যে জন গাঁথে | মালা ||
গানের কুসুম | জুগিয়ে দেব | তারে।...
জেগে রব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে—

যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বালো
বসে রব সেথায় অন্ধকারে ॥"

—নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে

এখানে প্রতি পদে চার-চার-দুই দলমাত্রা। চারটি পদই সমায়তন।

কলাবৃত্ত :

৭. "বুঝি মধু | ফাল্গুন | মাসে ॥
চঞ্চল | পান্থ সে | আসে ॥
মধুকর | পদভর ॥ কম্পিত | চম্পক ॥
অঙ্গনে | ফোটে নি কি | আজও।...
মঞ্জীরঝংকৃত পায়ে
সৌরভমন্থর বায়ে
বন্দনসংগীতগুঞ্জনমুখরিত নন্দনকুঞ্জে বিরাজো ॥"

—বাজো রে বাঁশরি, বাজো

এখানে বন্ধের কিছু অভিনবত্ব আছে। প্রথম দুটি পদে (অথবা একপদী পঙ্‌ক্তিতে) চার-চার-দুই কলামাত্রা। তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি আসলে একটি দীর্ঘ ত্রিপদী (আট-আট-দশ মাত্রা)। কিন্তু এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে সাজিয়ে একটি চৌপদী গঠন করা হয়েছে।

৮. "আসে কোন্ | তরুণ অ | শান্ত ॥
উড়ে বস | নাঞ্চল | প্রান্ত ॥
আলোকের | নৃত্যে ব | নান্ত ॥
মুখরিত | অধীর আ | নন্দে।...
কার পদপরশন-আশা
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা—
সমীরণ বন্ধনহারা
উন্মন কোন্ বনগন্ধে ॥"

—মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি

এখানে চারটি পূর্ণ পদই চার-চার-তিন কলামাত্রার সমাহার।

দলবৃত্ত :

৯. "ভাঙন-ধরার | ছিন্ন-করার | রুদ্র নাটে ॥
যখন সকল | ছন্দ বিকল | বন্ধ কাটে ॥

মুক্তিপাগল | বৈরাগীদের | চিত্ততলে ‖
প্রেমসাধনার | হোমহুতাশন | জলবে তবে।"

—ওরে পথিক ওরে প্রেমিক

প্রতিটি পদই পূর্ণ পদ ; চার-চার-চার দলমাত্রায় গঠিত।

কলাবৃত্ত :

১০. "সারাটা বেলা | সাগরধারে | কুড়ালি যত | নুড়ি ‖
নানা রঙের | শামুক-ভারে | বোঝাই হল | ঝুড়ি ‖
লবণ পারা | বারের পারে | প্রখর তাপে | পুড়ি ‖
মরিলি পিপা | সায়।"

—বাহির পথে বিবাগি হিয়া

এই কলাবৃত্ত চৌপদীটি একটি অভিনব বন্ধ। এর প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তি বস্তুতঃ ত্রিপদী (৫+৫+৫+২)। অথচ এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে পদের মত সাজিয়ে একটি চৌপদী গঠন করা হয়েছে। চতুর্থ পদটি একটি অপূর্ণ পদ (৫+২)।

মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ রবীন্দ্রনাথের মতে কৃত্রিম ছন্দ ; তাতে সাবলীলতা ও নমনীয়তার অভাব। ভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তির জন্য ভাষা ও ছন্দের সাবলীলতা ও স্বাভাবিক নমনীয়তা একান্ত প্রয়োজনীয়। দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত ছন্দ এই গুণের অধিকারী বলে কবি তাদের নিয়ে এত রকম গঠনবৈচিত্র্য সাধন করেছেন। কিন্তু মিশ্রবৃত্তে বন্ধ-বৈচিত্র্য বিশেষ সৃষ্টি করেন নি।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। গীতরচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, একাধিক বন্ধের মিশ্রণ ঘটেছে ; কবিতার মত কোনো একটিমাত্র বন্ধে আগাগোড়া গানটি রচিত হয় নি। সম্ভবতঃ রচনার একঘেয়েমি দূর করবার জন্যই কবি এই 'বন্ধ-মিশ্রণ' ঘটিয়েছেন। তার ফলে অনেক সময় একই গান থেকে বিভিন্ন বন্ধের নিদর্শন দেওয়া গেছে।

**স্বৈরবন্ধ :** নিয়মিত ও পূর্ণাঙ্গ বন্ধের বহু বিচিত্র দৃষ্টান্তের সঙ্গে অ-নিয়মিত বন্ধেরও নিদর্শন পাওয়া যায় রবীন্দ্র-গীতরচনায়। এই অনিয়মিত বন্ধকে 'স্বৈরবন্ধ' বা 'মুক্তবন্ধ' ছন্দ ( free form verse ) বলা যায়।[১] স্বৈরবন্ধ বা মুক্তবন্ধের ছন্দোরচনার প্রথম প্রয়াস দেখা দিয়েছিল 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই বন্ধের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে 'বলাকা'-'পলাতকা' কাব্যে। গানেও স্বৈরবন্ধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে। এ ছাড়া এমন অনেক গান

১. দ্রষ্টব্য : 'ছন্দ', অনুষঙ্গ ১ ; মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর মুক্তবন্ধ ছন্দ

আছে, যাদের ছন্দোবন্ধ ঠিক সু-নিয়মিত নয়, অথচ ঠিক স্বৈরবন্ধও নয়। এগুলিকে স্বৈরবন্ধের পথে প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

১. "দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম,
নিত্য সে নিঃসংশয়,
গৌরব তার অক্ষয় ॥
দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ—
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয় ॥
অশ্রু-উৎস-জল-স্নানে তাপস জ্যোতির্ময়
আপনারে আহুতি-দানে হল সে মৃত্যুঞ্জয়।
গৌরব তার অক্ষয় ॥

২. "গগনে গগনে ধায় হাঁকি
বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,
স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায় বনস্পতির শাখাতে ॥
শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,
অলখ পথের ছন্দ উড়ায় মুক্তবেগের পাখাতে ॥
অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে
সাদা কালোর দ্বন্দ্বে,
কভু ভালো কভু মন্দে,
কভু সোজা কভু বাঁকাতে।" ইত্যাদি

৩. "যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে
ঝংকারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে
বন্ধমোচন ছন্দে তখন নেমে এলে নির্ঝরিণী—
তোমারে চিনি, তোমারে চিনি।...
হে নিঃশঙ্কিতা,
আত্ম-হারানো রুদ্রতালের নূপুরঝংকৃতা,
মৃত্যুতোরণতরণ-চরণ-চারিণী
চিরদিন অভিসারিণী,
তোমারে চিনি ॥"

স্বৈরবন্ধের আভাস আরও অনেক গানে আছে। লক্ষণীয় যে, এই গানগুলিতে নির্দিষ্ট ছন্দোরীতিতে সমান মাপের পর্ব গঠিত হয়েছে এবং পঙ্‌ক্তির শেষে মিলও আছে। অবশ্য কোথাও কোথাও গীতছন্দের খাতিরে টেনে পড়তে হয়। কিন্তু সব পঙ্‌ক্তিতে পর্বসংখ্যা সমান নয়। এরই পরিণত রূপ আছে অন্য কয়েকটি গানে, যাকে যথার্থ স্বৈরবন্ধ বলা যায়।

১. "হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল আজি মম পূর্ণ হল,
শুন সবে জগতজনে।
কী হেরিনু শোভা, নিখিলভুবননাথ
চিত্ত-মাঝে বসি স্থির আসনে॥"

২. "প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন॥
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধনয়নে অশ্রু-বরিষন॥" ইত্যাদি

৩. "নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ॥
মন্থর নব-নীলনীরদ- পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহকান্তারে॥"

অ-নিয়মিত বন্ধ ও মিলের অভাব এই স্বৈরবন্ধকে প্রায় গদ্যবন্ধের কাছে নিয়ে যায়। বিশেষতঃ শেষ গানটিতে ক্রিয়াপদের অভাব যেন মুক্তবন্ধকে অধিকতর মুক্তি দিয়েছে। এই পরিপূর্ণ স্বৈরবন্ধের নিদর্শন আছে আরও বহু গানে, 'প্রথম দিনের সূর্য', 'রূপনারাণের কূলে' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায়।

গদ্যবন্ধ : ছন্দে স্বৈরবন্ধের পরবর্তী পদক্ষেপ গদ্যবন্ধ। বিশুদ্ধ গদ্যছন্দের পরিচয় আছে রবীন্দ্র-গীতরচনায়। 'গদ্য ভাষার মুক্ত পদক্ষেপ'কে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন 'সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গির অশিক্ষিত ছন্দে'র সঙ্গে। তাঁর মতে গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। অর্থাৎ, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখেই বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায়। কারণ—

> "গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত।…যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।"

—'সাহিত্যের স্বরূপ', কাব্য ও ছন্দ

এই মিশ্রিত গদ্যছন্দের নিদর্শন আছে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে (১৯৩৮)। চণ্ডালিকাতে একদিকে আছে সুর-তাল-লয়-ছন্দ সমন্বিত নিখুঁত কাব্যসংগীত, অপরদিকে বিশুদ্ধ গদ্য।—

১. "সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর; স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে। সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—বললেন, 'জল দাও, জল দাও, জল দাও।'

শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ—

বল্ দেখি মা

সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!

কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে, আমাকে দিলেন সহসা মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।"

২. "হাঁ গো মা, সেই কথাই তো ব'লে গেলেন তিনি, তিনি আমার আপন জাতের লোক। আমি চণ্ডালী—সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা, সে যে দারুণ মিথ্যা। শ্রাবণের কালো যে মেঘ, তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল'—তা ব'লে কি জাত ঘুচিবে তার, অশুচি হবে কি তার জল! তিনি ব'লে গেলেন আমায়—নিজেরে নিন্দা কোরো না, মানবের বংশ তোমার, মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।"

—'চণ্ডালিকা', দ্বিতীয় দৃশ্য

এই নিরীহ গদ্যরচনাগুলি সুরে লয়ে যুক্ত হয়ে কি অপূর্ব কাব্যানুভূতির উদ্রেক করতে পারে, তা অংশগুলি পাঠ করলে কল্পনা করা যায় না। এই জাতীয় গদ্যাত্মক রচনা 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যেও আছে (১৯৩৬); কিন্তু সেগুলিতে সুরসংযোগ করা হয় নি, গানের ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি করা হয়।

"হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি। পৌরুষের সে অধৈর্য তাহারে গৌরব মানি আমি—আমি তো আচারভীরু নারী নহি শাস্ত্রবাক্যে-বাঁধা। এসো সখী, দুঃসাহসী প্রেম বহন করুক আমাদের অজানার পথে॥"[১]

—'চিত্রাঙ্গদা', তৃতীয় দৃশ্য

গদ্যরচনায় সুরসংযোগ সংগীতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। চিত্রাঙ্গদার পরে চণ্ডালিকায় কবি গদ্যে সুর বসালেন; সংগীতের মুক্তিপথে এ এক নতুন ও

১. এই অংশগুলির গদ্যরূপ বোঝাবার জন্য এগুলিকে গদ্যের মত করে সাজানো হল। গীতবিতানে এগুলিকে গান বা কবিতার মত ভেঙে ভেঙে লেখা আছে।

অবিস্মরণীয় পদক্ষেপ। তবে এই পরিকল্পনা কবিমনে অনেক আগেই জাগ্রত হয়েছিল।—

"গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়।"

—'পথে ও পথের প্রান্তে', পত্র ৩৯, ২৩শে শ্রাবণ ১৩৩৩

নৃত্য, গীত ও কথকতার সম্মিলনে অনুষ্ঠিত 'শাপমোচন' নাটকের (প্রথম অভিনয় : পৌষ, ১৩৩৮ ; কবির জীবদ্দশায় শেষ অভিনয় পৌষ, ১৩৪৭) বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত কথা অংশগুলিতেও সুরারোপ করা হয়েছিল—

"রাজা। অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব।···

রাণী। তোমার এ কী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে, তাহার অর্থ বুঝি নে।" ইত্যাদি।[১]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ('ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : প্রথম পর্যায়)—

"ইংরেজি ছন্দে একসেন্টের প্রভাব ; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘহ্রস্বের সুনির্দিষ্ট ভাগ। বাংলায় তা নেই, এইজন্যে লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোন বাধা নেই।"

বাধা নেই বলেই রবীন্দ্রনাথ গীতরচনায় ছন্দে এত বৈচিত্র্য সাধন করেছেন এবং সেই বৈচিত্র্যের পথ ধরে গানের ছন্দ গদ্যছন্দ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। গীতবিতানে ছন্দোরীতির যত বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে, ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্য তার থেকে কম তো নয়ই, বরং বহুগুণে বেশি। এই সীমাহীন বন্ধ-বৈচিত্র্যের কোনও তুলনা নেই রবীন্দ্রকাব্যে।

## ছন্দ ও তাল

ভাবের বিভিন্নতা ও হৃদয়ানুভূতির সূক্ষ্মতার জন্য রবীন্দ্র-গীতরচনায় বিস্ময়কর ছন্দোবৈচিত্র্য সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ইতস্ততঃ দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি থাকলেও, সাধারণতঃ গীতরচনায় ছন্দে আকারের বিস্তৃতি দেখা যায় না। গানে, ভাষার সংহতি ও তির্যক দীপ্তি, সংক্ষিপ্ত অলংকার ও ব্যঞ্জনার বহুল ব্যবহার,

১. দ্রষ্টব্য : গীতবিতান (অখণ্ড) ১৩৭০, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৯৮৮

ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধের বিভিন্ন রূপায়ণ এবং সর্বোপরি সুরের মাধুর্য অনির্বচনীয় রসলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার সহায়ক। বিস্তৃতি সে পথের অন্তরায়, তাই ছন্দেও বিস্তৃতি বর্জনীয়। সেইজন্যই সম্ভবতঃ গীতরচনায় একপদী বন্ধের এত বিপুল সমাবেশ; কাব্যে একপদী বন্ধ অনেক কম দেখা যায়।

শুধু ভাবের বিভিন্নতাই নয়, গীতকবিতায় ছন্দোবৈচিত্র্য-সাধনের অপর কারণ গানের তালের সঙ্গে ছন্দের সংগতিরক্ষা।

> "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম।"
>
> —'সংগীতচিন্তা', সংগীতের মুক্তি

রবীন্দ্রনাথ তাল বলতে এখানে শাস্ত্রীয় তাল বোঝান নি। তাঁর কাছে কবিতার ছন্দ এবং গানের তাল বা লয়—দুই-ই হচ্ছে Rythm, ভাবস্পন্দ বা বাণীস্পন্দ। সেইজন্যই বলেছেন (পূর্ববৎ)—

> "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়।··· লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।"

বস্তুতঃ শাস্ত্রীয় তালকে প্রয়োজনমতো উপেক্ষা ক'রে, 'কানের স্বাভাবিক রুচি' এবং ভাষার স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ গীতরচনার ছন্দোগঠন করেছেন। ভাষাকে, অথবা সংগীতের 'লয়'কে অবিকৃত রাখবার জন্য ছন্দকেই বিচিত্র করেছেন, ভাষাকে শাস্ত্রীয় তালের দাস করে তোলেন নি। এইভাবে তিনি সংগীতকে যথার্থই মুক্তি দিয়েছেন। ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসে 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরও বহু পূর্বে 'সংগীত ও কবিতা' প্রবন্ধেও (মাঘ ১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে মুক্তিদান করবার কথা চিন্তা করেছিলেন।—

> "সংগীতে কতকগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ হইয়া না থাকি। কবিতারও যে স্বাধীনতা আছে সংগীতেরও সেই স্বাধীনতা হউক,···প্রত্যেক গীতিকবির রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস জন্মগ্রহণ করিবেন।"

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানকে এই স্বাধীনতা দান করেছিলেন; সেই কারণেই 'গীতবিতান' নামক অপূর্ব বস্তু আমরা লাভ করেছি।

গীতরচনায় শাস্ত্রীয় তালকে আপাততঃ উপেক্ষা করলেও, রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দ ও সংগীতের তাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরোধী নয়। কারণ গীত-

রচনায় বাক্‌স্পন্দন ও গীতস্পন্দন দুই-ই ভাবস্পন্দনের তালে তালে রচিত। সুরের যোগে কথা তার মূল্য হারায় না। এখানে পঠিত ছন্দ ও গীতছন্দে সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। যদিও, সুরসংযুক্ত গানে পর্বের আয়তন সর্বত্র সমান থাকে নি।

সাধারণতঃ ছয় মাত্রার পর্ব, তিন মাত্রার তালে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কখনও কখনও ছয় মাত্রার পর্বের গীতরচনা গাওয়া হয় 'তেওট' ( ৩+২+২ ) তালে। 'আমার মাথা নত করে', 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে' প্রভৃতি গান তার দৃষ্টান্ত। তেমনই পাঁচ মাত্রার পর্বের গান গাওয়া হয়েছে তিন মাত্রার বিভাগ-সম্পন্ন 'একতাল'-এ ( ৩+৩+৩+৩ )। উদাহরণস্বরূপ আমারে 'করো তোমার বীণা' গানটিকে স্মরণ করা যায়। 'ঐ রে তরী দিল খুলে' গানটিতে চারমাত্রার পর্ববিভাগ থাকলেও, গানের মেজাজটি ধীর, শান্ত ব'লে, একে 'কাহারবা-য়' না গেয়ে, নতুন তাল প্রচলিত করলেন 'রূপকড়া' ( ৩+২+৩ )। কখনও বা পঠিত ছন্দ ও গীতছন্দে সৌষম্য রক্ষা করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নতুন তালের প্রবর্তনা করেছেন। 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' গানটির তাল 'ঝম্পক'। এই কবি-প্রবর্তিত তালে কাব্যছন্দ ঠিক ঠিক বজায় থাকে। তেমনই, 'নিবিড় ঘন আঁধারে' গীত-রচনাটিতে নয় মাত্রার পদবিভাগ থাকায় নয় মাত্রার নতুন তাল চালু হল, 'নবতাল' ( ৩+২+২+২ )। 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে' গানটিও সেই কারণেই নয় মাত্রার তালে ( ৫+৪ ) গাওয়া হয়। আবার, গীতরচনার পর্ববিভাগ ও প্রচলিত শাস্ত্রীয় তালের মাত্রাসংখ্যা সমান হয়েছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। 'ধ্বনিল আহ্বান', 'হৃদয়ে মন্দ্রিল' প্রভৃতি গান সাতমাত্রার তালে, 'দুঃখের বরষায়', গান 'কাহারবা' তালে, 'আজি মর্মরধ্বনি কেন' গান 'ত্রিতালে' ( ৪+৪+৪+৪ ) গাওয়া হয়। বস্তুতঃ সাধারণ ক্ষেত্রে গানের তাল ও কাব্যছন্দের পর্বের মাত্রাসংখ্যা সর্বত্র সমান না থাকলেও, উভয়ের পর্ববিভাগ একই থেকেছে। ফলে, একদিকে গান কবিতা হিসাবে যেমন পড়া যায়, সুরের অভাবে পড়ায় বাধা ঘটে না; তেমনই ওই গান যখন সুরের হাওয়ায় ভেসে চলে, তখনও কথার বাঁধুনি অব্যাহতই থাকে। গানের ভাবগ্রহণে কোন বাধা তো ঘটেই না, বরং সুরের পথ ধরে ভাব আরও সহজেই হৃদয়ে প্রবেশ করে। এ বিষয়ে 'মধুগন্ধে-ভরা' গানটির প্রতি মনোনিবেশ করা যায়। গানটির পুষ্পছন্দের বাঁধুনি তোটকের মত, প্রত্যেক পর্বে চার মাত্রা। অথচ এর গীতছন্দ বা তাল তিন-মাত্রাযুক্ত। আবার গানের শেষাংশে, যেখানে তোটকের বাঁধুনি আলগা করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আছে চারমাত্রার তাল। কিন্তু পঠিত ছন্দ ও গীতছন্দে কোথাও বিরোধ ঘটে নি। দুই-ই ভাবছন্দের অনুসারী।

অবশ্য কোথাও কোথাও গীতস্পন্দন ও ভাবস্পন্দনের সৌষম্য রক্ষিত হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটি স্মরণ করি। এই কবিতার ছন্দ বাক্‌ছন্দের অনুবর্তী।

"ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতিসৌরভ | রভসে
ঘন গৌরবে | নবযৌবনা | বরষা
শ্যামগম্ভীর | সরসা।"

কিন্তু সুরযোগে এর তাল হয় নিম্নরূপ—

"ওই আসে | ওই অতি | ভৈরব | হরষে
জল সিঞ্‌ | চিত ক্ষিতি | সৌরভ | রভসে
ঘন গৌ | রবে নব | যৌবনা | বরষা
শ্যাম গম্‌ | ভীর সর | সা"

এই ছন্দে কথার তাল রক্ষিত হয় নি। অনেক জায়গাতে কথার তালের সঙ্গে অনেক শব্দও অস্বাভাবিক ভাবে খণ্ডিত হয়েছে। এভাবে বাক্‌ছন্দ এবং কবিতা বা গানের ছন্দের বিরোধ ঘটলে রচনার ভাবগ্রহণে ও রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। তবে, এখানে সে ব্যাঘাত গুরুতর নয়, কারণ সুরবিস্তারের অবকাশ কম বলে শব্দচ্ছেদ বা ভাবচ্ছেদ উৎকট হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া, ঐ গানটিরই শেষের দিকে এরকম ভাবে অস্থানে ভাবচ্ছেদ বা শব্দচ্ছেদ ঘটে নি। আর, এ জাতীয় ত্রুটি রবীন্দ্রসংগীতে যে বিরল, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

## মিল ও শব্দানুপ্রাস

সর্বশেষে একটু মিলের কথা বলা প্রয়োজন। মুক্তবন্ধ ও গদ্যবন্ধের গান ছাড়া অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতে মিল আছে। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে মিলের যে বিভিন্ন প্রকার চমৎকারিতা দেখা যায় রবীন্দ্রসংগীতে তা নেই। এর কারণ আছে। প্রথমতঃ মিলের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হলে এবং অভিনব মিল প্রয়োগ করতে হলে অনেক সময় হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়। যেমন,

"তার পরে এল গনৎকার
গণনায় রাজা চমৎকার
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার
বাজায়ে সে গেল চলি।"

—'সোনার তরী', পুরস্কার

কিংবা,

"শলাকাবিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ মন্থুনিবিদ্ধ পক্ষী।"

—'কল্পনা', উন্নতিলক্ষণ

এই জাতীয় রচনায় মিলের অভিনবত্ব হাস্যরসের খোরাক। গানের সুগম্ভীর পরিবেশে এর স্থান নেই। দ্বিতীয়তঃ মিলের জন্য যে বাগ্‌বিস্তার প্রয়োজন, গানে তারও স্থান কম। তৃতীয়তঃ, মিলের বৈচিত্র্য কাব্যের বহিরঙ্গ-প্রসাধনমাত্র। মিলের দ্বারা অন্তর্নিহিত ভাবোৎকর্ষ সাধিত হয় না। রবীন্দ্রসংগীতে ভাবের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য কবি অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানিও ঘটিয়েছেন। সেই কারণেই বহুল পরিমাণে মিলের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে কবি গানগুলিকে ভারাক্রান্ত করতে চান নি। বরং বহিরঙ্গের লঘুতা সাধন করে গানগুলিকে তিনি সুরের আকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতই অবাধ অব্যাহতি দিয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে অভিনব মিলও দেখা যায়। যেমন—

"রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো,
তোর আঙিনা হয় নি যে নিকোনো।"

—'চণ্ডালিকা', প্রথম দৃশ্য

অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে, ভাবপ্রকাশের জন্য বা ভাবোৎকর্ষ সাধনের জন্য কবি মিল ও শব্দানুপ্রাস ব্যবহার করেছেন এবং সেই সকল স্থলে শব্দ ও মিলের ঝংকার ও ধ্বনিসৌন্দর্যে গানগুলির শিল্পগত যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তাও যথার্থ বিস্ময়ের বস্তু। সেই রকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

১. "মনোমন্দিরসুন্দরী! মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা! অয়ি মঞ্জুলা মুঞ্জরী!
রোষারুণরাগরঞ্জিতা! বঙ্কিম-ভুরু-ভঙ্গিতা!
গোপনহাস্য-কুটিল-আস্য কপটকলহগঞ্জিতা!...
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা! মধুকরভরকুণ্ঠিতা
লুব্ধপবন-ক্ষুব্ধ-লোভন মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা!"

এই গানে, প্রিয়ার রূপ ও গুণ বর্ণনায় শব্দানুপ্রাস ও মিলের সুমধুর ঝংকারের দ্বারা অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

২. সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার॥
নীল অম্বর চুম্বনন্ত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সংগীত যত গুঞ্জরে শতবার॥

ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ—
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।”

সৌন্দর্য-বিহ্বল ভাবতন্ময়তা এখানে ভাষার ঝংকার ও শব্দসংগীতের সাহায্যে অভিব্যক্ত। প্রেমের আবেগে দেহ ও মনে যে 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা' উন্মত্ত ব্যাকুলতা জাগে, জগৎ ও জীবনের যে নূতন রূপ উদ্‌ভাসিত হয় প্রেমিকের চোখে, তাকেই ছন্দের দোলায় ও শব্দের তরঙ্গে কবি মূর্ত করে তুলেছেন।

৩. “আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশথপল্লবে অশান্ত হিল্লোল সমীরচঞ্চল দিগঙ্গনে॥···
কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধমদিরা অজস্র লুটিছে দুরন্ত ঝটিকা।
তড়িৎশিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া, ভয়ার্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া—
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত-দানব মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া॥”

ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ নিশীথ-ধরণীর এই রূপ অনুপ্রাস ও মিলের সহায়তা-বিনা কখনই এতখানি ফুটিয়ে তোলা যেত না। ভাব ও বর্ণনার উপযোগী শব্দপ্রয়োগ রবীন্দ্র-রচনাশৈলীর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই গান তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এতাবৎ আলোচনায় রবীন্দ্র-গীতরচনার ছন্দোবৈশিষ্ট্য ও ছন্দোবৈচিত্র্যের কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। স্বল্প পরিসরে এর সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া সাধ্যাতীত। শেষ করবার পূর্বে তাঁর গানের ছন্দ সম্পর্কে তাঁর ভাষাতেই বলি—

“ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্‌ধৃবীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের রুদ্ররথের চাকাতে॥”

—গগনে গগনে ধায় হাঁকি

# অলংকার

## ব্যঞ্জনা ও অলংকার

সাহিত্যে ভাষা, ছন্দ, অলংকার, সুর—এই আঙ্গিকগুলির অপরিহার্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ( 'সাহিত্য', সাহিত্যের তাৎপর্য ) —

“অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়।···ভাষার মধ্যে···ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়।···

উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়।…এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে।”

অর্থাৎ সাহিত্যে ভাষার শব্দসম্পদ বিশেষ প্রয়োজনীয় হলেও, অনুরূপ প্রয়োজনীয় ছন্দ এবং অলংকার। এদের সংযোগেই সাহিত্যের চিত্র ও সংগীতময়তা প্রকাশ পায়।

গান সম্পর্কে এই কথা অধিকতর প্রযোজ্য। কেননা, গানের স্বল্প পরিসরে ভাবকে অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা দান করবার জন্য বাণীকে সংহত, সংক্ষিপ্ত অথচ তির্যক দীপ্তি লাভ করতে হয়, অল্প কথায় অনেক কথা বলবার জন্য অলংকারের আশ্রয় নিতে হয়। রবীন্দ্রসংগীতে সেই কারণেই অলংকারের এত প্রাচুর্য। এই অলংকার-গুলি ভাষার ভার নয়, ভাষার শক্তি। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

“মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে মত্তহাওয়ার ছন্দে
মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে॥”

—আমি তখন ছিলেম মগন গহন

‘মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে’—এই একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে এক দিকে বিদ্যুৎশিখার বঙ্কিম কুটিল গতি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনই অন্য দিকে সংস্কৃত কাব্যের শ্যাম সুগম্ভীর বর্ষার স্মৃতির অনুষঙ্গে মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। এমন সার্থক অলংকার-প্রয়োগ মহাকবির পক্ষেই সম্ভব।

আলংকারিকদের মতে, কাব্যের প্রাণ কথা বা বাচ্য নয়, ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনি। রবীন্দ্রসংগীতে এই ব্যঙ্গ্যেরই আধিপত্য। ব্যাখ্যা নেই, বিশ্লেষণ নেই, একটিমাত্র শব্দরূপ মণিখণ্ড থেকে অনেকখানি ভাবের কিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে বাক্যকে রসাত্মক কাব্যে পরিণত করে। এখানেই অলংকারের প্রয়োজন ও সার্থকতা।

## অলংকার-বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রসংগীতে বিভিন্ন জাতীয় অলংকার থাকলেও, ‘সমাসোক্তি’, ‘অতিশয়োক্তি’ এবং ‘রূপক’ অলংকারেরই প্রাধান্য দেখা যায়। সমাসোক্তি মানে সংক্ষিপ্ত উক্তি। এই অলংকারে উপমানের পৃথক উল্লেখ থাকে না, কিন্তু উপমেয়ের ক্রিয়া উপমান-অনুসারী হয়; তাই অনুক্ত উপমানকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, অতিশয়োক্তি অলংকারে উপমেয় থাকে উহ্য। সেদিক থেকে অতিশয়োক্তি অলংকারও সমাসোক্তি। সংগীতে বাণীকে সংযত রাখতে হয় বলে

এই দুই অলংকারই সংগীতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। রূপক অলংকারে উপমাসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয় না, তাই গানে রূপকেরও প্রভূত সমাবেশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের হাতে সমাসোক্তি অলংকারের এমন সার্থক ও অ-পূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে যে, চমকিত ও বিস্মিত হতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি পঙ্‌ক্তি বা পঙ্‌ক্তির অংশ উৎকলিত হল। 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে', 'যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে', 'আগুন লেগেছে বনে বনে', 'কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে, পলাশ-কানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে', 'ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোজে', 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি', 'আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি, আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী', 'ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত', 'ভাঙল হাসির বাঁধ', 'ওই মালতীলতা দোলে পিয়ালতরুর কোলে', প্রভৃতি।

রূপক অলংকারেরও অপর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত আছে। 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে', 'ওগো আমার শ্রাবণ-মেঘের খেয়াতরীর মাঝি', 'বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা', 'আলোর অমল কমলখানি', 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল', 'যৌবনেরই ঝড়', 'আলোক-তরবারী', 'নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-স্রোতে শুক্লরাতে চাঁদের তরণী', 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে', 'ঝিল্লী যেমন ঝাউয়ের বনে নিদ্রানীরব রাতে, অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে' প্রভৃতি অলংকার-প্রয়োগের তুলনা কোথাও আছে কি না জানি না।

রবীন্দ্র-গীতরচনায় সমাসোক্তি ও রূপক অলংকারের ব্যবহারই সর্বাধিক বলে মনে হয়। অতিশয়োক্তির ব্যবহার হয় সাধারণতঃ সমাসোক্তি ও রূপকের সঙ্গে মিশে, কখনও বা পৃথকভাবে।

১. "বোস্‌-না ভ্রমর এই নীলিমায় আসন লয়ে
অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু-মাখা হয়ে।"

২. "মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা।"

৩. 'দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।'

৪. "দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-'পরে
এ পারে কৃষি হল সারা, যাব ও পারের ঘাটে।"

৫. "কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে।"

ভাবের দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা ( suggestiveness ) পরিস্ফুট করবার জন্ম এবং সেই সঙ্গে বাক্‌সংযম-সাধনের উদ্দেশ্যে সমাসোক্তি, রূপক ও অতিশয়োক্তির মত, রবীন্দ্রসংগীতে 'বিরোধাভাস' অলংকারও খুব বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি', 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে', 'অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে', 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে', 'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি', 'যে কথাটি যায় না বলা কইলে চুপে চুপে', 'তুমি আমার মুক্তি হয়ে এলে বাঁধনরূপে', 'গগন-জোড়া কোণ', 'নীরবের কানাকানি', 'অলখ আলোকে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি বা খণ্ড পঙ্‌ক্তিতে বিরোধ অলংকারের প্রভূত পরিচয়। এ ছাড়া, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য অর্থালংকারেরও প্রচুর নিদর্শন আছে গীতবিতানে। অলংকার-রসিক ব্যক্তিমাত্রই তার পরিচয় জানেন, উদাহরণযোগে রচনা ভারাক্রান্ত করা নিষ্প্রয়োজন।

শুধু অর্থালংকার নয়, শব্দালংকারও আছে গানে। অনুপ্রাস ও যমক কবি প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছেন। 'তরুণারুণরাগে', 'চমকে চকিত ছন্দ', 'মৃত্যুতোরণতরণ-চরণ-চারিণী', 'আনন্দছন্দের হিন্দোলা', 'পূর্ণসিতাংশুবিভাস-বিকাশিনী', 'অরুণ-চরণ-কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে', হার-মানা হার' প্রভৃতি প্রয়োগ গীতরচনায় সুপ্রচুর। কিন্তু কোথাও বাহুল্য নেই। সকল প্রকার অলংকারই গানে ভাষার আভরণ, ভাষার বোঝা নয়।

## ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ

রবীন্দ্রসংগীতে সার্থক এবং চমকৃপ্রদ অলংকারের সঙ্গেই আর একটি রূপগত বৈশিষ্ট্য দেখি, যাকে বলা যায় 'উৎপ্রেক্ষণ' বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ। এক ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কবি আস্বাদন করেছেন, অথচ তাতে অনুভূতির ছন্দপতন ঘটে নি। কথাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

এই বিশ্ব মানুষের বোধের দ্বারা সৃষ্ট।—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।...

মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।"

—'শ্যামলী', আমি

মানুষই সুন্দরকে সুন্দর করে, কুশ্রীকে কুশ্রী। একজনের কাছে যে সুন্দর আর একজনের কাছে সেই হয়তো কুশ্রী। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যেভাবে জগৎকে দেখছি, জানছি—অন্য প্রাণী সেভাবে দেখছেও না, জানছেও না।

"সুন্দর কাকে বলি। বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর, যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।"

—'মানুষের ধর্ম', মানবসত্য

এই কথাই আবার অন্যভাবে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ( 'নবজাতক', প্রজাপতি ) —

"বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি করে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে।"

লক্ষকোটি মনের আপন আপন বোধের দ্বারা বিশ্বভুবনও লক্ষকোটি হয়ে ওঠে। প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিতে বিশ্ব স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষ বিশ্বকে যেভাবে বোঝে, ভাবে,—কবিরা তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে বোঝেন। কারণ কবির মন সংবেদনশীল, বিশ্বের সঙ্গে তাঁব আত্মীয়তা নিবিড়তর। কবি তাঁর অন্তরতম সত্তার দ্বারা বিশ্বকে উপলব্ধি করেন। সেই সুগভীর অনুভূতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা খণ্ডিত নয়। কবিহৃদয়ের অতল গভীরে সেই চরম উপলব্ধি এক অখণ্ড সামগ্রিকতায় বিধৃত। পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়ানুভূতি সেখানে একাকার হয়ে যায়।

তাই কবি বলতে পারেন—

'সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়'

কিংবা

'ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে'।

এইরকম ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ পাঠকের কানেও বেমানান শোনায় না। কেননা কবির অনুভূতি পাঠকমনেও সঞ্চারিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের মতে 'সাহিত্যের তাৎপর্য' সেখানেই। সাধারণ মুখের কথাতেও এই জাতীয় উৎপ্রেক্ষণ পাওয়া যায়—'মিষ্টি চেহারা', 'মুখের লাবণ্য, 'মধুর হাসি' প্রভৃতি। নিম্নে রবীন্দ্র-গীতরচনার অসংখ্য উৎপ্রেক্ষণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

১. 'নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।'

২. 'নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে।'

৩. 'গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে।'

৪. 'হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি
সুদূর বনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া নিভৃত তরুছায়ে
চুপি চুপি কী করুণ কথা কহিল সারাগায়ে।'

৫. 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে।'

৬. 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।'

৭. সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী।'

৮. 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে।'

৯. 'মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে।'

১০. 'মোর আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য-পর্বত।'

১১. 'আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলো ছলো আঁখি মেঘে মেঘে।'

১২. 'পথ চেয়ে-থাকা মোর দৃষ্টিখানি
শুনিতে পাও কি তাহার বাণী।'

এই জাতীয় উৎপ্রেক্ষণ সাধারণ কবির পক্ষে সম্ভব নয়। এরকম অনুভূতিও সংবেদনশীল মহাকবির পক্ষেই সাজে এবং তাঁর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিতে সে সংবেদন পাঠকমনেও অঙ্কুরিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছন্দসচেতন ও ছন্দোবিদ্ কবি ছিলেন, কিন্তু অলংকারবিদ্ কবি ছিলেন না। অলংকার সম্বন্ধে তাঁর একটিও প্রবন্ধ নেই। অলংকার-প্রয়োগ তাঁর সচেতন প্রয়াসজাত নয়; শাস্ত্রানুযায়ী বৈচিত্র্যসাধনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল না। এগুলি একান্তই স্বতস্ফূর্ত, হয়তো সেইজন্যই অতুলনীয়। গানে বহু জায়গায় অলংকারের মিশ্রণ ঘটেছে, কোথাও বা একই অলংকারের পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে। কিন্তু কোথাও বিসদৃশ, নীরস বা একঘেয়ে হয় নি। রূপদক্ষ কবির অসাধারণ কারুনৈপুণ্যই তার কারণ। গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে এমন অলংকৃত ভাষা অন্যান্য ভারতীয় কবির লেখায় সুলভ কি না জানি না। আর, সেই অলংকৃত ভাষা চরম ও পরম পরিণতি লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্যে।

## শব্দ ও ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা

অলংকার এবং উৎপ্রেক্ষণ ব্যতীত ব্যঞ্জনাময় শব্দের ব্যবহারও রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ কৃতিত্ব। ডঃ সুকুমার সেন এই ব্যঞ্জনাময় শব্দগুলিকে বলেছেন—'কথার আভা'।[১] [illegible] বিশেষ শব্দপ্রয়োগের দ্বারাই যেন সব কথা বলা হয়ে যায়, কোন উপমা-অলংকারের প্রয়োজন থাকে না। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতে এই জাতীয় আভাময় শব্দের প্রয়োজন ও ব্যবহার সুপ্রচুর। 'পথ', 'উত্তরীয়', 'বাঁশি', 'বীণা,' 'পাখি', 'লিপি', 'গান', 'খেলা' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়। এগুলিকে যে কবি গানে কত বার, কত ভাবে, কত অর্থে ব্যবহার করেছেন, তার শেষ নেই। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রেই শব্দগুলি বিভিন্ন সূক্ষ্মতর অর্থ গ্রহণ করে গানের ব্যঞ্জনাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। অনেক কথা বলবার আর প্রয়োজন থাকে নি। এরকম ব্যঙ্গ্যার্থময় শব্দ[illegible]বহার মহা-কবির প্রতিভারই অপেক্ষা রাখে।

ব্যঙ্গ্যার্থময় শব্দ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ গানে এত বিভিন্ন ও বিচিত্র শব্দ ব্যবহার করেছেন যে, সে শব্দসম্ভারের তুলনা তাঁর কাব্যেও নেই। কোথাও অত্যন্ত সহজ চলতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে গানের ভাব ও সুরের সঙ্গে সংগতি রক্ষা ক'রে, আবার কোথাও তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের আধিক্য ঘটিয়ে ভাষাকে সুগম্ভীর ও ছন্দকে তরঙ্গিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে লিখেছেন —

"মধুসূদন...বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার

১. দ্রষ্টব্য : ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড

দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে।...বাংলাভাষার...সমতলতা,...দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।"

—'ছন্দ', ছন্দবিচার, প্রথম পর্যায়

গানে এই জাতীয় শব্দব্যবহার সমৃদ্ধির চূড়ান্তে পৌঁছেছে। 'মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ক-কলা', 'সঘনবর্ষণশব্দমুখরিত বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী', 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা', 'ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত', 'ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী', 'মৃদু বায়ুহিল্লোলবিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে', 'অতি নির্মল হাসবিভাসবিকাশ আকাশনীলাম্বুজ-মাঝে', 'ফুলগন্ধ-নিবেদনবেদনসুন্দর মালতী', নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা ব্যথিতা যামিনী' প্রভৃতি পদ কেবল ভাষার সম্পদ নয়, ভাষার সংগীত এতে ধরা পড়ে। 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতাতেও এই জাতীয় ভাষার নিদর্শন আছে। একদিকে হালকা, সহজ শব্দ, অন্যদিকে গুরুগম্ভীর, বলিষ্ঠ এবং ঝংকৃত সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ গীতরচনায় ভাষার সীমানাকে সুদূরপ্রসারী করেছেন।

কোনো কোনো গানে কবি এমন অতীন্দ্রিয় ভাবলোক সৃষ্টি করেছেন, যাকে মুখের ভাষায় কোনোমতেই ব্যক্ত করা যায় না। এ প্রসঙ্গে 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে' এবং 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে' গান দুটি স্মরণ করা যায়। এই দুই গানের ভাবদ্যোতনা ভাষাতীত। এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে এদের উত্তরণ—রূপকলা বা শিল্পকলা অর্থাৎ ব্যঞ্জনাময় শব্দ, ছন্দ, অলংকার এবং সুরের পথ বেয়ে। গান তখন শুধু 'দেহের সীমানা'ই পার হয়ে যায় না; বাক্য এবং মনের সীমানাও পার হয়ে চলে যায় সেই ভাবলোকে — যা 'অবাঙমনসগোচরম্'।

রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন কাব্য বা সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে রূপ। সেই রূপই অলংকার। কঠিন, নীরস ভাবনাকে বিশুদ্ধ ভাষায় সোজাসুজি ব্যক্ত করলে তাকে সাহিত্য বলা যায় না। অলংকারের সাহায্যেই ভাবনা রূপ পায়, সাহিত্য প্রাণ পায়। কারণ 'অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়'। সুনির্বাচিত শব্দ ও সুসমন্বিত অলংকার প্রয়োগের দ্বারা কি অত্যাশ্চর্য বাণীচিত্র বা 'বাক্‌প্রতিমা' (imagery) নির্মাণ করা যায়, রবীন্দ্রসাহিত্যেই তার অজস্র

নিদর্শন মেলে। যেমন—

১. 'গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিছে পশ্চিম মাঠ 'পরে

২. 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল-খসা, হাতে দীপশিখা'

৩. 'ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা'

এই তিনটি পঙ্‌ক্তিতে একই ভাব কি অপূর্ব ও বিচিত্র তিনটি বাঙ্‌মূর্তি পরিগ্রহ করেছে—তা সুরসিক পাঠকমাত্রেরই অনুভূতিগম্য।

পরিচ্ছেদের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে পাওয়া গেছে সাহিত্যের প্রধান সৃষ্টি চিত্র ও সংগীত, ছবি ও গান। ছন্দ বা 'ভাষার সংগীত' দ্বারা সাহিত্যের সংগীত রচিত হয়, আর অলংকারের সাহায্যে রচিত হয় চিত্র। এই ধ্বনিরূপ ও চিত্ররূপের আবেদন পাঠক মনের অতল গভীরে। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ধ্বনিরূপ ও চিত্ররূপ অনবদ্য।

রবীন্দ্র-গীতরচনার সংগীত ও চিত্র—ছন্দ ও অলংকারের সামান্য পরিচয় দেওয়া গেল। অলংকারগুলি ভাবনিরপেক্ষ আরোপিত অলংকার নয়; এগুলি অরূপ ভাবেরই রূপমূর্তি। অন্তরঙ্গ ভাব ও বহিরঙ্গ রূপ—দুইয়ে মিলে সাহিত্য। আর এদের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধনের ফলে, রবীন্দ্র-গীতসাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। পরিশেষে, সাহিত্যে ভাব ও রূপের এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি পুনরায় স্মরণ করি।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

—'উৎসর্গ', ১৭, 'ধূপ আপনারে'

## চতুর্থ অধ্যায়

# সমকালীন গীতরচয়িতা ও রবীন্দ্রনাথ

গীতরচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষবিচারে, তাঁর সমকালীন অন্যান্য গীত-সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, পরিবেশ ও পটভূমি ব্যতীত অন্যনিরপেক্ষ একক আলোচনা সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া কঠিন।

আধুনিক গীতসাহিত্যের শুরু বলা যায় রামমোহনের সময়ে। রামমোহনের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির অনেকে এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথও ব্রহ্মসংগীত রচনা করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু প্রমুখ বহু মনীষীর দ্বারা জাতীয় সংগীত রচনার প্রবর্তন ঘটে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ নাট্যকারগণ নাট্যগীতি-রচনার প্রচলন করেছিলেন। এ ছাড়া সেই সময় কিছু কিছু হাসির গানও রচিত হয়। অর্থাৎ উনবিংশ শতকে কাব্যরচনা-ধারার সমান্তরালে গীতরচনার ধারাটিও প্রবাহিত ছিল এবং সেই সময়ে বহু সংগীতকারের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এঁদের সকলেই সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নি। অধিকাংশ সংগীতকারের রচনার মূল্য সাময়িক ও অ-ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, আর যাঁরা যথার্থতঃ সংগীত-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী ও চিরন্তন স্থান লাভ করেছেন, তাঁরা হলেন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতসাহিত্য ছিল শ্রেণীগত। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, মালসী প্রভৃতি সবই শ্রেণী-সংগীত। এই জাতীয় গানে শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট, রচয়িতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন। আবার শ্রেণীগুলি প্রধানতঃ সুর-বৈশিষ্ট্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুরকার বা তাঁর রচনা-বৈশিষ্ট্যের উপরে নয়। কেবল-মাত্র মধ্যযুগের শেষে, রামপ্রসাদ সেন ও রামনিধি গুপ্ত সংগীতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রামপ্রসাদী গান বা নিধুবাবুর টপ্পা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের গান নয়, কোনো শ্রেণীর অধিগত নয়, সেগুলি রচয়িতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আধুনিক গীতসাহিত্যে কিন্তু শ্রেণী নয়, ব্যক্তিই প্রধান। গানের কথায়, ভাবে, সুরে প্রত্যেক রচয়িতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য চিনে নিতে কষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া উপরি-উল্লিখিত চারজন গীতরচয়িতার রচনাতে এই স্বাতন্ত্র্য

সুস্পষ্ট। তাই সাহিত্যগুণে এবং স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্যে এই চারজন সংগীতকারের নাম আধুনিক বাংলা গীতসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলাদেবী চৌধুরানীও স্বদেশী সংগীত-রচয়িতা হিসেবে স্মরণীয়। তাঁর 'শতগান' গ্রন্থটি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর রচিত গান গাওয়া হত, তিনি নিজেও সুগায়িকা ছিলেন। তাঁর লেখা 'নমো হিন্দুস্তান', 'বন্দি তোমারে ভারতজননী' প্রভৃতি গান সুবিখ্যাত।

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন গীতরচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ( ১৮৬৩-১৯১৩ ) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার হিসেবে সুপরিচিত হলেও তাঁর গানগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে এবং সংগীতকার রূপে তাঁর খ্যাতি বেশী ছাড়া কম নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রে গীত-সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় একজন সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন।

'হাসির গান' (১৯০০) এবং 'গান' (১৯১৫, কবির মৃত্যুর পর সংকলিত) — এই দুটিই দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত-সংকলন। রবীন্দ্রনাথের মত দ্বিজেন্দ্রলালেরও কবিপ্রতিভা ও সংগীতপ্রতিভা অল্প বয়সেই বিকশিত হয়। তাঁর সংগীতপ্রতিভার পরিধিও ছিল সুবিস্তৃত। একদিকে স্কচ, আইরিশ ও ইংরেজি সুর, অন্যদিকে ভারতীয় ক্লাসিকাল সুর — দুটিতেই তাঁর সমান দখল ছিল এবং এই সুরগুলিকে তিনি সার্থকভাবে গানে ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরও অল্প বয়সের রচনাগুলি সাহিত্যসমাজে আদরণীয় হয়েছিল। 'আর্যগাথা' প্রথম খণ্ডের (১৮৮২) ভূমিকায় কবি স্বয়ং কবিতাগুলিকে 'গীত' বা 'গীতি' বলেছেন। কিশোর বয়সে রচিত গানগুলিতে তিনি কোন শাস্ত্রগত সুরারোপ করেন নি।

> "যখন যে সুর ভাল লাগিত, তখন সেই সুরেই গাইতাম। আশৈশব আমার হৃদয়কাননে সময়ে সময়ে সেই প্রস্ফুটিত ভাব-কুসুমরাজি চয়ন করিয়া 'আর্যগাথা' রচিত হইল।"

এই গীতগুলিকে কবি কাব্যমূল্য দিতে এবং কবিতা হিসেবে ছাপাতে কুণ্ঠিত ছিলেন না—

> "আর্যগাথার সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবন্ধেই প্রায় রচিত হইয়াছে।··· গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে। সে জন্য ইহাদের ভাষায়

ও ছন্দোবন্ধে এত দৃষ্টি বোধ হয় আপত্তিকর হইবে না। যাহা হউক, ইহার জন্য গীতগুলি গাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।"

১২৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশের সময় সুর ছাড়া গান ছাপানোকে নিষ্ফল মনে করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পূর্বেই গানগুলিকে কাব্যরূপ ও কাব্যমূল্য দিয়েছিলেন নির্দ্বিধায়। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ('আধুনিক সাহিত্য', আর্যগাথা) —

"গ্রন্থখানিতে…কতকগুলি গান আছে…যাহা পাঠ মাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে। …কেবলমাত্র সেইসকল কবিতা হইতে গানের সমগ্র মাধুর্য আমরা মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে পারি।"

সমালোচক গ্রন্থখানিকে 'সংগীতপুস্তক' বললেও, বিচারে অনেক গানকে কবিতা বলতে চেয়েছেন।

কার্যোপলক্ষে গয়ায় প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সাক্ষাৎ ও বন্ধুতা ঘটে। লোকেন পালিতের মত সমঝদার ও সূক্ষ্ম বিচারশীল ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রসংগীতের যথার্থ মূল্য অনুভব করেছিলেন ও তাঁকে প্রভূত উৎসাহ দিয়েছিলেন। 'আমার দেশ', 'মেবার পাহাড়', 'ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর' ইত্যাদি বিখ্যাত গান এই সময়ে লেখা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতপ্রতিভার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। স্ত্রীবিয়োগের পব থেকেই তাঁর রচনায় ভাবগভীরতা দেখা দেয়। প্রকৃতি ও প্রেমের গানের গীতিরস এক নূতনতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। তাঁর সাহিত্যশক্তির সমালোচনা করে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখেছিলেন—

"নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষায় করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিলেন, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।"[১]

দ্বিজেন্দ্রলাল বিভিন্ন ভাবের গান রচনা করলেও তাঁর স্বদেশী সংগীত ও হাসির গানই সর্ববিখ্যাত। দেশপ্রেম তাঁর হাতে নবতর অর্থে মণ্ডিত হয়েছে। গানগুলি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রচণ্ড উন্মাদনার সঙ্গে গভীর আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতা বহন করছে।

---

১. দ্রষ্টব্য: রথীন্দ্রনাথ রায়, 'দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার'

"বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!...
যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য! মানুষ আমরা নহি ত মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'!"

দৃপ্ত বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি ও মর্মস্পর্শী আবেগ তাঁর দেশপ্রেমের গানগুলিকে সহজেই জনপ্রিয় করেছিল।

"ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা,—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।...
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
—ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।"

এর সঙ্গেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের গান—

"আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়াল
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥"

—সার্থক জনম আমার

বর্তমান অবস্থার জন্য আত্মধিক্কার ও অতীতের গৌরবকাহিনী স্মরণ করিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ—তাঁর অধিকাংশ স্বদেশী গানের মর্মকথা। 'ভারত আমার', 'মেবার পাহাড়' প্রভৃতি গানে ইতিহাস সঞ্চারিত, অতীতের গৌরবগাথা কীর্তিত। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও একই অনুপ্রাণনা থেকে রচিত। স্বদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপ কবি চিত্রিত করেছেন, আবার তার সঙ্গে দেশমাতৃকার ভাবরূপটিও পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

দেশকে অবলম্বন করে উচ্চতর ভাবলোক-সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ গানে 'দেশের মাটি'তে প্রাণসঞ্চার করেছেন;

দেশমাতার 'ভুবনমনোমোহিনী' রূপ দেখে দেখে তাঁর 'আঁখি না ফিরে'। দ্বিজেন্দ্রলালের গানেও আছে স্বদেশের সেই মহিমময়ী মাতৃমূর্তি।

"সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত।
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আননে দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।...
শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা!
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল 'জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ'!"

—'গান', ভারতবর্ষ

উচ্ছ্বসিত আবেগ ও বলিষ্ঠ উত্তেজনা তাঁর 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' প্রভৃতি বহু স্বদেশী গানের সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য। বাংলার জনজাগরণে রবীন্দ্রসংগীতের মতই দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিও বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। জনপ্রিয়তার দিক থেকে অনেক সময় দ্বিজেন্দ্রগীতিগুলি অগ্রগণ্যও হয়েছিল।

প্রেমসংগীত ও ভক্তিসংগীতে কবি ক্রমে আত্মস্থ ও ভাবনিমগ্ন হয়েছেন। পত্নী-বিয়োগের পর থেকে তিনি ক্রমেই শান্ত, সমাহিত হয়েছেন। তাঁর তার্কিক মন এক নতুন বিশ্বাসে পরিমার্জিত হয়েছে, প্রেম উর্ধ্বাভিমুখী আত্মনিবেদনে পরিণত হয়েছে। প্রেমসাধনা কিছুটা বৈষ্ণবীয় হয়ে উঠেছে এই সময়—

'তুমি যে হে প্রাণের বঁধু, আমরা তোমায় ভালবাসি।'

ভক্তিগীতিগুলির মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই ধরনের চিন্তাই দেখা যায়। তাঁর প্রকৃতিসংগীতগুলিও ভাবে, ছন্দে ও ভাষায় যথার্থ গীতশিল্প।

"এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্মর।
"এ কি নিখিল বিশ্বহাসি,—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।"

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংগীতগুলি বিশেষ মূল্যবান। সাধারণতঃ নাটকে বা যাত্রায় সংগীত সন্নিবিষ্ট হয় একটানা ঘটনার মধ্যে বিরতি ( dramatic relief ) আনবার জন্য। অবশ্য যাত্রায় গান প্রধানতঃ লঘু এবং মনোরঞ্জনী। কিন্তু সার্থক নাট্য-সংগীত, নাটকের চরিত্রবিকাশের সহায়ক। সংলাপে যা বলা কঠিন, সংগীতে তা ব্যক্ত হয় অতি সহজেই। অনেক সময় সামান্য ঘটনাও সংগীতের সাহায্যে নাটকীয় হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রথম নাটক ও সংগীতকে এইভাবে পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য করে তোলেন। কিন্তু তিনি নিজে সুরকার ছিলেন না।

দ্বিজেন্দ্রলাল মননধর্মী নাটক ও প্রহসন উভয়ক্ষেত্রেই প্রচুর গান ব্যবহার করেছেন। প্রহসনগুলির প্রাণকেন্দ্রই হল হাসির গান। কবি গানের অনুযায়ী ঘটনাসমাবেশ ও চরিত্রগঠন করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকে সংগীত-সন্নিবেশও বিশেষ কৃতিত্বময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষতঃ 'মেবারপতন', 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে সংগীত অন্যতম প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। নাটকের পটভূমি-রচনায়, চরিত্র বিশ্লেষণে, চরিত্রের মনোভাব প্রকাশে, কেন্দ্রীয় উত্তেজনা বিতরণে, সকরুণ বিষাদের ছায়ায়, আদর্শবাদ ঘোষণায় গানগুলির মূল্য অপরিসীম। 'মেবার পাহাড়' এবং 'কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ'—এই দুটি বিখ্যাত স্বদেশী গান 'মেবাবপতন' নাটকের অন্তর্ভুক্ত।

ইংবেজি নাটক, এবং প্রধানতঃ শেক্সপীয়রের নাটকের অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক রচিত। কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকে গানের বিশেষ কোন স্থান নেই। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেও সংগীত গৌণ বস্তু। নাটকে সংগীতযোজনা বিশেষভাবে বাংলা নাটকেরই বৈশিষ্ট্য, আর রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়ের নাটকেই গান অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু তাই নয়, গানগুলি নাটকের প্রাণ। অবশ্য তাঁদের প্রতিভা ও শিল্পধর্ম পৃথক, নাটকের স্বরূপ পৃথক ; তাই নাট্যগীতগুলির প্রকৃতিও পৃথক। কিন্তু উভয়েরই নাট্যসংগীত নাটকের মর্মকথাকে ব্যক্ত করে এবং সেগুলিকে বাদ দিলে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানি হয়। প্রসঙ্গতঃ এ কথাও স্মরণীয় যে উভয়ে কাছাকাছি সময়েই নাটকগুলি রচনা করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে 'হাসির গান' দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অনেকের কাছে হাসির গানের রচয়িতা হিসেবেই তাঁর একমাত্র পরিচয়। তাঁর হাসির গানে কাব্য ও সুরের সংমিশ্রণ হয়েছে। হাস্যরসের মূলে যে অসংগতি, হাসির গানের সুরেও সে অসংগতি লক্ষণীয়। হাসির গানে কবি ভারতীয় রাগরাগিণী ও বিলাতী সুরকে অবলীলাক্রমে মিলিয়ে দিয়েছেন।

একসময় বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থূল ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম সংগীতে নির্মল হাস্যরস যোগ করেন। ঈশ্বর গুপ্তের পরে আরও অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও হাসির গান রচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি সংখ্যাধিক্যে, বিষয়বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গিতে, ছন্দসমৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকেও অনেকাংশে ম্লান করে দিয়েছে বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের একজন সমঝ্‌দার শ্রোতা এবং গায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৯৬ সালে 'খামখেয়ালী' নামে যে সাহিত্য ও সংগীতসভা স্থাপিত হয়, তার সভ্য ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, লোকেন পালিত, রাধিকামোহন গোস্বামী, অতুলপ্রসাদ এবং আরও অনেকে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গান দিয়ে এই সভা মশগুল করে রাখতেন। তিনি গান গাইতেন, আর সকলে কোরাস ধরতেন; রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা।

"সকলের মুখে হাসি, কণ্ঠে গান, হাসির উচ্চরোলে সভাস্থল কম্পান্বিত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন, 'হতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন, 'তা বটেই ত তা বটেই ত'। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন, 'নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ' রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন 'বাহা রে নন্দ বাহা রে নন্দলাল।"

—অতুলপ্রসাদ সেন, 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি'

অবশ্য এ প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"উত্তরায় রবীন্দ্রনাথ নামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখেছ তা পড়ে উক্ত নামধারী খুসী হয়েছেন।...খামখেয়ালী পর্বের একটা কথা বোধহয় অযথা হয়েছে—সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অভিমুখে কৃষ্ণপক্ষের কালিমা উদ্‌ঘাটন করেচেন, তাঁকে আমাদের মজলিসে পাবার সৌভাগ্য হয় নি। তুমি যে ব্যাপারের বর্ণনা করেছ সেটা প্রাক্‌-খামখেয়ালী যুগের। তখন আমি আমার স্বজন বন্ধুমহলে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতির ভূমিকা করে বেড়াচ্ছিলুম। বস্তুত আমি ছিলুম তাঁর প্রথম ও প্রধান নকীব।[১]

অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলির উচ্চমান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিধাহীন, এগুলির প্রচারেও তিনি যত্নশীল ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'তা সে হবে

১. দ্রষ্টব্য: মানসী মুখোপাধ্যায়, 'অতুলপ্রসাদ'

কেন', 'নন্দলাল', 'প্রাণান্ত', 'প্রেমবিষয়ক', 'প্রণয়ের ইতিহাস', 'বদলে গেল মতটা', 'সবই মিঠে', 'বিলেত' প্রভৃতি হাসির গান বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর 'আমরা ও তোমরা' এবং 'তোমরা ও আমরা' গান দুটির সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের গান 'তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও'।

রবীন্দ্রনাথের হাসির গানগুলি প্রধানতঃ রঙ্গরসের গান। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে রহস্য, রঙ্গব্যঙ্গ এবং কদাচিৎ তিক্ততা দেখা গেলেও এগুলির পিছনে গভীর দুঃখের কথা আছে। সমাজচিন্তা, স্বদেশচিন্তা এই গানগুলিতে অনতি-প্রচ্ছন্ন। গানগুলিতে যথার্থই 'সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনাভরা প্রাণ'। দেশের দৈন্য, দুঃখ, সামাজিক ব্যবধান, সামাজিক অবিচার, বিদেশী শাসকবর্গের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা, সাহেব সাজার বিড়ম্বনা—সবই কবি হাস্যরসের আড়ালে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তার পিছনে অশ্রুসজল ব্যথার বাণী অ-ব্যক্ত থাকে নি।

"আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর
আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।...
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।"

—'হাসির গান', বিলাতফের্তা

এইরকম অশ্রুসজল হিউমারের অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে আর একটি উৎকলিত হল।

"সাহেব-তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর;
যবে সব কলম ধ'রে, গলার জোরে, দে.শাদ্ধারে ধায়;
তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে, হ'য়ে ওঠে দায়।"

—'হাসির গান', বলি ত হাসব না

সুরের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মুক্তপন্থী। সুরসৃষ্টিতে তাঁর মৌলিকতা ও স্বকীয়তা লক্ষণীয়। দেশী ও বিলাতী সুরের সংমিশ্রণে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে সে যুগের অন্যান্য সুরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও দেশী-বিলাতী সুরের সংমিশ্রণ করেছিলেন।

শুধু হাসির গানেই নয়, স্বদেশী সংগীতগুলিতেও দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় রাগিণী ও ইওরোপীয় সুরের মিলন ঘটিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই রীতির সংগীত সম্পর্কেই তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকায় এই মিলন কৃত্রিম হয় নি—বরং সামগ্রিক শিল্পরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে স্বদেশপ্রেমের কোরাস গানগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় রচনায় আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বিজেন্দ্র-সংগীতে দেশী-বিদেশী সুরের সংমিশ্রণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ('সংগীতচিন্তা', সোনার কাঠি)—

> "দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাঁকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। ···হিন্দুসংগীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে।"

শুধু সুরে নয়, ভাষাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা ও ইংরেজির প্রচুর মিশ্রণ করেছেন। তাঁর হাসির গানে প্রচুর ইংরেজি শব্দ আছে। রবীন্দ্রনাথের হাসির গান ও হাসির কবিতাতেও অনুরূপভাবে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার পাই। তবে এক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালই অগ্রগণ্যতার দাবি করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের মত দ্বিজেন্দ্রলালও কেবলমাত্র গীতকার নন, তিনি সংগীতশিল্পী। তাঁর গানে শব্দের ঐশ্বর্য, ছন্দোবৈচিত্র্য ও ছন্দসমৃদ্ধি এবং অলংকারের ঝংকার গানগুলিকে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত করেছে। সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে দ্বিজেন্দ্রলাল সার্থকভাবে সংগীতে প্রয়োগ করেছেন।

> "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
> শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!"

অপর দিকে, 'হাসির গানে'র লৌকিক ছন্দ ও লৌকিক শব্দ উপরন্তু বিদেশী শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহার যথার্থই বিস্ময়ের বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' ও রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'—দুটি গ্রন্থই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত; দুই গ্রন্থেরই বাহন দলবৃত্ত ছন্দ। তবে ক্ষণিকা ঐ সময়েই রচিত; যদিও হাসির গানগুলি এর

পূর্বেই রচিত হয়, ঐ সময়ে একত্র সংকলিত হয়েছিল মাত্র। ক্ষণিকায় হাল্কা সুরে হাল্কা কথা বললেও, প্রকৃতপক্ষে ক্ষণিকার শিল্প মার্জিত শিল্প। আর হাসির গানের শিল্প স্বাভাবিকতার শিল্প। কেবল স্বাভাবিক বাংলা শব্দই নয়, বাংলা ভাষায় কথা বলার স্বাভাবিক ভঙ্গীটিও হাসির গানে অবিকৃত আছে। অথচ এই স্বাভাবিকতায় বলিষ্ঠতার কোন অভাব নেই। ক্ষণিকার মার্জিত শিল্প এবং হাসির গানের বলিষ্ঠ স্বাভাবিকতার শিল্প, দুই কবির ভিন্ন জাতীয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে এবং ভিন্নতর আস্বাদ দেয়। এই পার্থক্য উক্ত দুটি গ্রন্থের যে কোন অংশেই পরিস্ফুট, উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে ( 'আধুনিক সাহিত্য', আষাঢ়ে ) যে কথাগুলি বলেছেন, তা তাঁর 'হাসির গান' সম্পর্কে অধিকতর প্রযোজ্য।

> "ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিল-বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মত আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ।··· লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।"

'বন্দুকের ক্যাপের মত' আকস্মিক মিলের দু' একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

১। "ছেলের দল সব চস্‌মা প'রে ব'সে আছে কাটখোট্টা,
সাহেবরা সব গেরুয়া পরছে, বাঙালী 'নেকটাইহ্যাটকোট্টা'
পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মত, ছেলেবেলায় খান নি কে ?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসছেন আহ্নিকে?"

—'হাসির গান', হল কি

২। "পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল
—বলে সর্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধর্লে ছাড়ে তবু
ধর্লে ছাড়ে না স্ত্রী॥"

—'হাসির গান', সংসার

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস-স্রষ্টাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান সর্বপ্রথম সারিতেই। রবীন্দ্রনাথের হাসির গানগুলিও বোধ হয় এতটা উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে না।

সুরের সঙ্গে, হাসির সঙ্গে, কথার সঙ্গে অদ্ভুত সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে হাসির গানগুলিতে। শুধুমাত্র 'হাসির গান'ই দ্বিজেন্দ্রলালকে বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখতে সক্ষম।

## অতুলপ্রসাদ সেন

রবীন্দ্র-সমকালীন গীতস্রষ্টাদের মধ্যে আর একজন প্রতিভাশালী শিল্পী — অতুল প্রসাদ সেন ( ১৮৭১-১৯৩৪ )। এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার কবি সমসাময়িক জাতীয় জাগরণের একজন পুরোধা ছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজনীতি, সমাজনীতি, পৌর-নীতি, জনসেবা, দেশের উন্নয়ন, সাহিত্যসেবা, অতিথিবাৎসল্য—সর্ববিষয়েই তিনি তাঁর কর্মস্থান ও আবাসভূমি লক্ষ্ণৌ নগরীতে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় সংগীতরচয়িতা হিসেবে এবং তাঁর আবাসস্থান লক্ষ্ণৌ ছিল গানেরই তীর্থক্ষেত্র।

লক্ষ্ণৌ নগরী গানের তীর্থস্থান হলেও, সে গান অ-বাংলা ক্লাসিকাল গান। কিন্তু সেখানে থেকেও অতুলপ্রসাদ বাংলা গান ও বাংলা ভাষারই চর্চা করেছেন। বাংলার বাইরে, ভিন্নতর পরিবেশে বঙ্গভারতীর সেবা করে তিনি বঙ্গ সাহিত্যকেই গৌরবান্বিত করলেন। সেই সঙ্গে মার্গ সংগীতের সুরমিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলা সুরেরও ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করলেন। এইটিই বাংলা ভাষা ও বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে অতুল প্রসাদের মহত্তম দান।

তৎকালীন একটি বিখ্যাত সাময়িক পত্র 'উত্তরা' ( প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩২ ) প্রকাশের পিছনে ছিল অতুলপ্রসাদের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সাহায্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামতি গোখলে, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশনেতার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বলেন্দ্রনাথ, সরলা দেবী, আলাউদ্দীন খাঁ, শ্রীকৃষ্ণ রতনজঙ্কর, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধিকামোহন গোস্বামী প্রমুখ সাহিত্যসেবী, সংগীতস্রষ্টা ও সংগীতশিল্পীরাও অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। অতুলপ্রসাদ যে দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তার ফলে তাঁর কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরও বেশি কিছু প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্র, সমাজ-সেবা, জাতির সেবা প্রভৃতিতে তিনি এত বেশি লিপ্ত ছিলেন যে, প্রত্যাশিত মাত্রায় সাহিত্যসেবা করতে পারেন নি। তৎসত্ত্বেও, বঙ্গ সাহিত্যভাণ্ডারে যে রত্ন তিনি সংযোজন করেছেন, তার মূল্য কম নয়।

অতুলপ্রসাদের গানগুলি 'গীতিগুঞ্জ' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ( প্রথম

প্রকাশ : ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ )। এর পূর্বে 'কয়েকটি গান' নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তার গানগুলিও পরে গীতিগুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে 'গীতিগুঞ্জে'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে পূর্বে অপ্রকাশিত আরও কয়েকটি গান 'পরিশিষ্ট' অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'গীতবিতানে'র মত গীতিগুঞ্জের গানগুলিও দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব, বিবিধ—এই কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত।

অতুলপ্রসাদী গানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য — এগুলির ভাষা সহজ, সবল বাংলা। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল কবির অপরিসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা।
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা।"

এরই সঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য পঙ্‌ক্তি—

'মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত'।

—আমার সোনার বাংলা

এবং দ্বিজেন্দ্রলালের—

"জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান!"

—'গান', আজি গো তোমার চরণে, জননি

অতুলপ্রসাদের গানে সাধারণতঃ গম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কম। সাধারণ চলতি শব্দ, নামধাতু ও স্বরভক্তি তাঁর বাণীকে সুললিত করে তুলেছে। দেশমহিমা যেখানে বর্ণনা করেছেন, সেখানে স্বভাবতঃই গম্ভীর শব্দ এসেছে কিন্তু যেখানে প্রাণের কথা সেখানে ভাষা সরল।

"বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।"

অথবা,

"উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!"

উপরিলিখিত দুটি গীতাংশে আছে অতুলপ্রসাদের ভাষা এবং ভাবনার সহজ, সরল অথচ সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ। 'হও ধরমেতে ধীর' তাঁর আর একটি সুপ্রচলিত স্বদেশী সংগীত।, বস্তুতঃ অতুলপ্রসাদ শুধু স্বদেশী গানগুলির জন্যই চিরস্মরণীয় হতে পারেন। তাঁর স্বদেশচিন্তায় হিন্দু মুসলমান ঐক্য, শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন সবই স্থান পেয়েছে।

তবে, তাঁর 'আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস'গুলিও বিস্মরণীয় নয়। অতুলপ্রসাদের প্রেম-সংগীত ও ভক্তিসংগীত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিতে রচিত। 'পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী হন নি, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল প্রেমে পূর্ণ। কখনও অভিমানভরে গেয়েছেন—

'যাব না, যাব না, যাব না, ঘরে'

কিংবা,

"তখনি তোরে বলেছিনু মন
যাস নে রে তুই এ বিপথে
মানলি নি তখন।"

আবার প্রিয়ার আগমনে উৎফুল্ল হয়ে লিখলেন—

'আজ আমার শূন্য ঘরে
আসিল সুন্দর।'

কখনও হতাশায় ভেঙে পড়ে লেখেন—'ওগো নিঠুর দরদী, এ কী খেলছ অনুক্ষণ'। আনন্দোজ্জ্বল পৃথিবী আর নিজের ব্যর্থ জীবনের দিকে তাকিয়ে গাইলেন—

"এত হাসি আছে জগতে তোমার,
বঞ্চিলে শুধু মোরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।'

সাধকের মত বলেছেন 'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ।' নিজের ভাগ্যবিধাতাকে প্রশ্ন করেছেন—'আর কত কাল থাকব বসে দুয়ার খুলে? বঁধু আমার!' এইভাবে আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলে, হতাশা ও আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কবি ক্রমে ক্রমে নিরপেক্ষ, নির্বিকার হয়ে উঠেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এক অদৃশ্য প্রেমিকের বিরহী ভক্তে পরিণত হয়েছেন।—

"কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে, কেন মোরে,
ডাকিলে গো এ আঁধারে?

স্বপ্নে যারে চেয়েছিনু
সে বুঝি চাহে আমারে।
কেন তবে দাও না ধরা ?
কেন খোঁজাও সারা ধরা ?
কেন বাজাও মন-হরা ?
ও মুরলী বারে বারে।"

এরই মধ্যে লাভ করলেন অপার শান্তি।

"তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে ল'ও বুকে।"

তাই শেষে গাইলেন—

"তুমি গাও, তুমি গাও গো।
গাহো মম জীবনে বসি, বেদনে বাঁধা জীবনবীণা
ঝংকারি বাজাও গো।"

এখানে যেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

"যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা—
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও সকল দুখের কথা॥"

প্রকৃতপক্ষে, অতুলপ্রসাদের গানে অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রভাবনার অনুরণন শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও গানে বাউলের সুর, কীর্তনের সুর গ্রহণ করেছেন। ১৯৩৩ সালে গোরক্ষপুরে 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে' কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে 'বাউল' বলে উল্লেখ করেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও সম্প্রীতি ছিল। রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কে অতুলপ্রসাদ ছিলেন পরম শ্রদ্ধাবান। রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে তিনি 'গাহো রবীন্দ্রজয়ন্তী-বন্দন', 'জয়তু জয়তু জয়তু কবি' ইত্যাদি গান রচনা করেন। তাছাড়া 'আ মরি বাংলা ভাষা' গানেও বলেছেন—

"বাজিয়ে রবি তোমার বীনে
আনল মালা জগৎ জিনে!—
গরব কোথায় রাখি গো ?"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অনুজপ্রতিম কবি-সুহৃদটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থটি ( ১৯৩২ ) তিনি অতুলপ্রসাদকে উৎসর্গ করেন। বাংলা গীতসাহিত্যে

১. দ্রষ্টব্য : মানসী মুখোপাধ্যায়, 'অতুলপ্রসাদ'

অতুলপ্রসাদের দান স্মরণ করে উক্ত গ্রন্থের উৎসর্গ-কবিতাটিতে লেখেন—

"দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।"

এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের কিঞ্চিৎ তুলনা করলে হয়তো অন্যায় হবে না। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ—উভয়েই গীতশিল্পী। ভাবগত ঐশ্বর্যে উভয়ের গানের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উভয়ের গানেই স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম রূপলাভ করেছে। তবে, অতুলপ্রসাদের প্রেমগীতিগুলি মূলতঃ ব্যক্তিগত ভিত্তিতে রচিত। আর, জীবনের শেষে প্রেমও ভক্তির আত্মনিবেদনে পরিণত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ভক্তিগীতি রচনা করলেও, তাঁকে অনুরূপভাবে ভক্ত কবি হয়তো বলা যায় না। পক্ষান্তরে, অতুলপ্রসাদ হাসির গান রচনা করেন নি, কিন্তু হাসির গানেই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ও উৎকর্ষ। উপরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু গীতস্রষ্টা নন, কবিও। অর্থাৎ তিনি একাধারে কাব্যশিল্পী ও গীতসাহিত্যশিল্পী। ছন্দে, অলংকারে, শব্দপ্রয়োগে তাঁর শিল্পপ্রতিভা গানে সমুজ্জ্বল। অতুলপ্রসাদের গানে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রগীতির শিল্পোৎকর্ষ সর্বদা পরিলক্ষিত হয় না।

তথাপি এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, স্বক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদ যে প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। স্বাতন্ত্র্যে ও স্বকীয়তায় তার গানগুলি বাংলা গীতসাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। সেই কারণেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে অতুলপ্রসাদ স্বীকৃতি ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। অতুল-প্রসাদের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মরণে লেখেন—

"মৈত্রী তব সমুচ্ছল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো,
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো॥"

—'পরিশেষ' সংযোজন, অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদ স্বীয় ক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন 'পরিশেষ' কাব্যে সন্নিবিষ্ট উপরে উল্লিখিত কবিতা দুটি। বাংলা সাহিত্যে অতুলপ্রসাদের দান ও মূল্যায়ন সম্পর্কে এই উক্তিগুলিই শেষ কথা; তার উপরে আর কিছু বলা অনাবশ্যক।

## রজনীকান্ত সেন

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন অপর একজন গীতশিল্পী রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)। সাহিত্যসাধনা ও সাহিত্যসেবা অল্প বয়স থেকেই তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল।

কাব্যসাধনায় রজনীকান্তের পারিবারিক প্রভাব ও সহজাত প্রতিভা একত্রে মিলেছিল। রাজসাহীতে অবস্থানকালে স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য জন্মায়। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি হাসির গান রচনায় প্রবৃত্ত হন। অনেকের মতে হাসির গান রচনায় রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাছ থেকে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং রঙ্গব্যঙ্গমূলক বিষয়বস্তুতে, ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত কাব্যরীতিতে, উভয়ের রচনাগত কিছু সাদৃশ্যও হয়তো দেখা যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কাব্যশৈলীগত এবং ভাবগত ঐশ্বর্য শুধু রজনীকান্ত নন, আরও অনেক কবির গানেই অবিদ্যমান।

এখানে রজনীকান্তের হাসির গানের একটু পরিচয় দেওয়া যাক্—

"আমরা 'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal'
আমরা, Criminal Bench এ Daniél,
আমরা আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Blood hound কি Spaniel।"

গানরচনা এবং সুকণ্ঠে গান গাইবার জন্য রজনীকান্ত খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর ও অক্ষয়কুমারের মিলিত উদ্যম ও প্রচেষ্টায় 'উৎসাহ' নামক মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

রজনীকান্তের 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'আঁনন্দময়ী' (১৯১০), বিশ্রাম (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০) ও শেষ দান (১৯২৭)—এই কয়েকটি কাব্য প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'অমৃত' ও 'সদ্ভাব-কুসুম' নামক দুটি নীতিকবিতার গ্রন্থ আছে। 'আনন্দময়ী'তে আছে আগমনী বিজয়ার গান। 'বাণী' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন-অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এই গ্রন্থের গানগুলি 'আলাপে', 'বিলাপে', 'প্রলাপে' এই তিন বিভাগে বিভক্ত। অক্ষয়কুমার লিখেছেন—

"রজনীকান্তের 'আলাপ'ই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার ধারণা; তাহা অনাবিল, তাহা মধুময়, তাহা ভাবে ভক্তিতে রচনালালিত্যে অনুপম।"[১]

---

১. দ্রষ্টব্য: 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' ৭ম খণ্ড, 'রজনীকান্ত সেন'

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কল্যাণী' প্রকাশের সময় বাংলাদেশে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। সেই অনুপ্রাণনায় রজনীকান্তও দেশাত্মবোধক সংগীতরচনায় মেতে উঠলেন। তাঁর সর্ববিখ্যাত এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় গানটি সেই সময়েই লেখা।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

এই গান সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মন্তব্য করেন —

"কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সংগীতসাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান।...স্বদেশী যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করি।"[১]

রাজসাহীর কবি স্বদেশী আন্দোলনের সময় সমগ্র বাংলাদেশের প্রিয় কান্তকবি হয়ে উঠলেন। স্বদেশী আন্দোলনকে যাঁরা বাণীমূর্তি দিয়েছিলেন, রজনীকান্ত তাঁদের অন্যতম। এই আন্দোলনের যুগে লেখা রজনীকান্তের অপর একটি উল্লেখযোগ্য গান—

"আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ!"

এই গানগুলিতে অকৃত্রিম দেশভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ জনতাকে মাতিয়ে তুলতে এই গানগুলি একসময় বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন, 'যে-সকল গান ক্ষুদ্র-প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে'—অর্থাৎ গানটির মূল্য ক্ষণস্থায়ী নয়। কিন্তু রজনীকান্তের স্বদেশী গানগুলির বক্তব্যবিষয় অনুধাবন করলে দেখা যায় গানগুলির মূল্য প্রকৃতপক্ষে ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক। এদের বিষয়বস্তু ও ভাষা সাময়িকতার সীমা অতিক্রম করে চিরন্তন সাহিত্যরূপে চিহ্নিত হবার উপযুক্ত নয়। 'শুধু, তাই বেচে কাচ

---

১. দ্রষ্টব্য : 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' ৭ম খণ্ড, 'রজনীকান্ত সেন'

সাবান মোজা কিনে কল্লি ঘর বোঝাই' কিংবা 'মাখব না ল্যাভেণ্ডার চাই নে অটো' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করলেই সে কথা সুস্পষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত—এঁরা সকলেই স্বদেশী গান রচনা করেছেন। তবে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলির যে চিরন্তন মূল্য, অন্যদের গানে তা সর্বাংশে নেই। রবীন্দ্রনাথ সাময়িক বা ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিষয়কে সর্বদাই চিরন্তন সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। তাই তাঁর স্বদেশী গানেও 'তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি এসে যায়। ভাবের উচ্চতা ও গভীরতার সঙ্গে শিল্পোৎকর্ষের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলি সর্বাগ্রগণ্য—এ কথা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের প্রধান সম্পদ তার সুরসমৃদ্ধি। এই সমৃদ্ধি রবীন্দ্রসংগীতেও সর্বত্র নেই।

তবুও এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুলপ্রসাদের দেশাত্মবোধক গানগুলি সাময়িকতার গণ্ডী থেকে মুক্ত। যে কোন দেশপ্রেমিক ব্যক্তির কাছে সেগুলি আজও আদরণীয়। কিন্তু রজনীকান্তের গান সর্বজনবোধ্য হলেও সর্ব-কালের উপযোগী নয়। এগুলি বিশেষভাবে তৎকালীন স্বদেশী পটভূমির দ্বারা চিহ্নিত ও সীমায়িত।

বস্তুতঃ রজনীকান্তের ভগবৎভক্তির গানগুলি স্থায়ী মূল্য লাভের যোগ্য।

"তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম মুছায়ে,
তব পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে॥"

এই জাতীয় ভক্তিমূলক গানেই কবির চরম সিদ্ধি। তাঁর নিজের জীবনের গতি-প্রকৃতিও সেই সুরেই নিয়ন্ত্রিত। তাই গভীর পুত্রশোকেও তাঁর সান্ত্বনা—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহারব।"

মৃত্যুও তাঁর কাছে সুন্দর ও বরণীয়।

"কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে,

কবে, তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা চন্দনে।”

স্বদেশী গানে রজনীকান্ত সাধারণতঃ চলতি ভাষা ব্যবহার করলেও, তাঁর কিছু গানে কাব্যময় ভাষারও ব্যবহার দেখা যায়।

“তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা,
ঊর্ধ্বে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা। ...
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি, ডাকিছে সুপ্তি-মগনে,
নিদ্রালস নয়নে,
এখনও কি রবে শয়নে ?
জাগাও বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা॥”

ভাবগত এবং ভাষাগত উৎকর্ষ দেখা গেলেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের গানের মত একে ‘কাব্যগীতি’ আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ সমগ্র গানটিতে ছন্দোগত ত্রুটি আছে, পড়তে গেলে বারে বারে ঠেকতে হয়।

রজনীকান্তের ভক্তিমূলক গান, স্বদেশী গান, হাসির গান — কোনটিই রবীন্দ্র-সংগীতের তুল্য নয়। ভাষায়, ছন্দে, অলংকারে, ভাবে, দুই কবি দুই ভিন্ন লোকবাসী। অনেকে মনে করেন, রজনীকান্ত গীতরচনায় কবি রামপ্রসাদের সমকক্ষ। অনুভূতির গভীরতায়, ভাবের অকৃত্রিমতায়, ভাষার সরলতায় বা লোকজীবন থেকে উপমা-সংগ্রহণে দুই কবির রচনার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা গেলেও বস্তুতঃ উভয় কবির মধ্যে কালগত ব্যবধান যত, ভাবগত এবং ধর্মচিন্তাগত ব্যবধান তার থেকে কিছু কম নয়।

অকৃত্রিম অনুভূতি রজনীকান্তের গানের প্রধান সম্পদ। ভগবৎভক্তির গান, দেশপ্রেমের গান—সর্বত্রই আছে অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ। কখনও কখনও শিল্পগত উৎকর্ষের অভাব দেখা গেলেও গভীর ও আন্তরিক ভাবনার বাহক বলেই তাঁর গানগুলি এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

অত্যন্ত অল্পবয়সে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে কবির অকালমৃত্যু ঘটে। অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি বাক্‌শক্তিহীন হয়ে পড়লেও, সংগীত-উৎসধারা বয়ে চলেছিল নিরন্তর। নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্বে

তিনি লিখেছেন—

"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে
গর্ব করিতে চুর ;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকলি করেছে দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর।...
ভাবিতাম, 'আমি লিখি বুঝি বেশ
আমার সংগীত ভালবাসে দেশ,'
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব করিতে চুর।"

এই গানের সঙ্গে গীতবিতানের 'পূজা' অংশের দুটি গান মনে পড়ে—

"আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে, জীবন-তারে ঝংকারো॥"

এবং

"এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো॥"

রজনীকান্তের পূর্বোদ্ধৃত গানটির চিরন্তন মূল্য আছে। বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের অকৃত্রিম ঈশ্বর-অনুভূতি এবং ঈশ্বরের উপর অসীম বিশ্বাস—এই গানে সরল আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। এই গান এবং রজনীকান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি স্মরণ করে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।—

"সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।...ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে

পূর্ণ করিয়া থাকেন ; আজ আপনার জীবন-সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"[১]

—রজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১৬ই আষাঢ় ১৩১৭

## কাজী নজরুল ইসলাম

রবীন্দ্র-সমকালীন উল্লেখযোগ্য সংগীতকারদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম ( ১৮৯৯-১৯৭৬ )। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ, দৈন্য, হতাশার আগুনে দগ্ধ হলেও, নজরুলের কাব্য উৎসাহ উদ্দীপনায় সমুজ্জ্বল। অবশ্য উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্য, ব্যর্থতার কথাও তাঁর রচনায় বিদ্যমান। বৈচিত্র্য তাঁর রচনাব অন্যতম প্রধান গুণ।

নজরুলের প্রধান পরিচয়—তিনি বিদ্রোহী কবি। এ বিদ্রোহ শুধু ব্যক্তি-জীবনের বাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় বিদ্রোহ নয়, কাব্য ও সাহিত্যজগতের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। রবীন্দ্রপ্রতিভার চরম উৎকর্ষের সময়ে যখন অধিকাংশ কবিই ববীন্দ্রনাথেব সর্বব্যাপী প্রতিভার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে কাব্যভারতীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় নজরুল তাঁর 'অগ্নিবীণা' হাতে 'বিদ্রোহী'-বেশে সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হন। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রভাবকে অনেকাংশে অস্বীকার না করেও তাঁর কাব্য ভাষায় ও ভাবে বিশিষ্ট। এর পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৮৮২-১৯২২ ), মোহিতলাল মজুমদার ( ১৮৮৮-১৯৫২ ) ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ( ১৮৮৭-১৯৫৪ ) প্রমুখ কবিদের রচনায় বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হলেও, নজরুলের রচনাতেও যে বাংলা দেশের ব্যথা-নৈরাশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিদ্রোহ-বিক্ষোভের যথার্থ সুরটি ধরা পড়েছিল এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। বাংলা কাব্যে বিদ্রোহ, পৌরুষ এবং বলিষ্ঠতার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক তিনিই। জনজীবনের সঙ্গে কাব্যকে তিনি সার্থকভাবে যুক্ত করেছিলেন। পরবর্তী কালে জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কবিরা অল্পাধিক পরিমাণে তাঁরই প্রদর্শিত পথে যাত্রা করেছিলেন।

অথচ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন ( ১৯২৩ )। নজরুলের কারাবাস-কালীন অনশনব্রত ভাঙবার উদ্দেশ্যে কবি টেলিগ্রাম করেন—'Give up hunger strike our literature claims you'। অবশ্য সেই টেলিগ্রাম নজরুল পান নি।[২]

১. দ্রষ্টব্য : 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' ৭ম খণ্ড, 'রজনীকান্ত সেন'

২. দ্রষ্টব্য : ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, 'নজরুল চরিতমানস'

নজরুল 'ধূমকেতু' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন (১৯২২)। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার উপরে রবীন্দ্রনাথের যে আশীর্বাণী ছাপা হত, তার থেকে নজরুলের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। নীচে সেটি উৎকলিত হল—

"কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু—

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন!"

রবীন্দ্রনাথের অশীতি বৎসরের জন্মদিন উপলক্ষে রচিত 'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' নামক কবিতায় ('নূতন চাঁদ' কাব্যের অন্তর্গত) নজরুল স্বীকার করেছেন, রবি-পরিমণ্ডল থেকেই এই 'ধূমকেতু'র জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, রচনাশৈলী—সবকিছুর প্রতিই গভীর শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হয়েও, নজরুল ঠিক রবীন্দ্র-পথের পথিক ছিলেন না। বরং রবীন্দ্র-পরিমণ্ডল থেকে ভিন্ন যে একটি স্বতন্ত্র কাব্যবৃত্ত সৃষ্ট হচ্ছিল, নজরুল ছিলেন তারই অন্যতম পুরোধা। এই নবীন সাহিত্যিকদের মুখপত্র ছিল 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকা। এগুলিতে নজরুলের লেখা নিয়মিত প্রকাশ পেত। একটি অভিভাষণে নজরুলের কবিমানসের যথার্থ পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়।

"আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।"[১]

---

১. ১৯১৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতা অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সভায় প্রদত্ত অভিভাষণের অংশ উৎকলিত হল। দ্রষ্টব্য: ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, 'নজরুল চরিতমানস'

নজরুলপ্রতিভা কবিতা অপেক্ষা গানেই সমধিক স্ফূর্তি পেয়েছে। সংগীতের প্রতি আকর্ষণ নজরুলের সহজাত। কবিতারচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গানও রচনা করতেন। আর, কাব্যজীবনের শেষের দিকে অর্থোপার্জনের জন্য কবিতার চেয়ে সংগীতই বেশি রচনা করতে হয়েছে তাঁকে। নজরুল একাধারে গীতকার, সুরকার এবং সুগায়ক ছিলেন। প্রতিভার এই ত্রিবেণীসংগম তাঁর গানগুলিকে বিশেষ উৎকর্ষ দান করেছে। তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থে কবিতা ও গান পাশাপাশি স্থান লাভ করেছে। নজরুলের গান সহজ, সরল, স্বতস্ফূর্ত। তাঁর গানগুলিকে—স্বদেশপ্রেম, মানবিক প্রেম, ভক্তি, প্রকৃতি ও হাসির গান—বিষয়ানুসারে এই পাঁচভাগে ভাগ করা যায়।

উনবিংশ শতকে নবজাগরণের ফলে, দেশের লোকের স্বদেশ-সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে। তৎকালীন সমস্ত মনীষী ও সাহিত্যিকের রচনায় স্বদেশপ্রেমের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। নজরুলসংগীতও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং নজরুলের স্বদেশপ্রেমের গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি আজও পর্যন্ত বিশেষ জনপ্রিয়। নজরুলের অন্যান্য কোরাস ও মার্চ সংগীতগুলিও অদ্যাপি অম্লান। 'আমরা শক্তি আমরা বল', 'অগ্রপথিক হে সেনাদল', 'চল্, চল্, চল্', 'টলমল টলমল পদভরে' প্রভৃতি কোরাস ও মার্চ সংগীতগুলি অতুলনীয়। এগুলির ভাষা ও সুরের বলিষ্ঠতাই এগুলির প্রাণ।

"দুরন্ত দুর্মদ প্রাণ অফুরান  
গাহে আজি উদ্ধত গান।  
লঙ্ঘি গিরি-দরী  
ঝঞ্ঝানূপুর পরি  
ফেরে মন্থন করি অসীম বিমান॥  
আমাদের পদভরে ধরা টলমল,  
অগ্নিগিরি ভয়ে মন্থর নিশ্চল,  
কম্পমানা ধরা শান্ত অটল  
চরণে লুটায় ঘোর সিন্ধু-তুফান॥"

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুতীব্র স্বাধীনতা-স্পৃহা 'কারার ঐ লৌহকপাট' বা "শিকল পরা ছল' প্রভৃতি গানে প্রকাশিত।

"কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশাণ!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ।
ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি॥"

আবার কোথাও শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রতি ভক্তি ও প্রেম অপূর্ব আন্তরিকতার সঙ্গে শান্তরসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

"আমার শ্যামলা বরণ বাঙ্‌লা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয় রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে-প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা'কে,
ধূলি রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়॥"

'নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম চির মনোরম চিব মধুর', 'লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে' প্রভৃতি গানও এই পর্যায়ভুক্ত। হিন্দু মুসলমান মৈত্রী-বিষয়ক বহু গানেও দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মানবিক প্রেমের গানে নজরুল সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। প্রেমেব বিরহ, ব্যর্থতা, আশা, নৈরাশ্য প্রভৃতি বিচিত্র অভিব্যক্তি তাঁর গানে অতি সার্থক। প্রেমসংগীতের মধ্যে তাঁর গজল গানগুলি সর্বাধিক জনপ্রিয়। নজরুলের পূর্বে অতুলপ্রসাদ গজল রচনা করলেও সেগুলি নজরুলের গজলের মত সার্থক নয়। গজল রচনায় নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', 'আমারে চোখ-ইশারায়', 'মৃদুলবায়ে বকুলছায়ে', 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে'—ইত্যাদি গজলগুলি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

"গুল-বাগিচায় বুলবুলি আমি রঙিন প্রেমের গাই গজল।
অনুরাগের লাল শারাবে মোর আঁখি ঝলে ঝলমল॥
আমার গানের মদির ছোঁয়ায়
গোলাপ কুঁড়ির ঘুম টুটে যায়।
সে গান শুনে প্রেম-দিওয়ানা কবির আঁখি ছলছল॥"

প্রেমসংগীত-গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক' সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্যামাসংগীত ও ইসলামী সংগীত উভয় ক্ষেত্রেই নজরুলের উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। 'বল্ রে জবা বল্ কোন সাধনায় পেলি রে তুই শ্যামা মায়ের চরণতল', 'মা তোর কালো রূপের মাঝে', 'শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে', 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়' ইত্যাদি গান উল্লেখযোগ্য। ইসলামী সংগীতগুলিতেও কবি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। নজরুলের বৈষ্ণব গানগুলিও উপেক্ষণীয় নয়; তবে অনেক স্থলেই রাধাকৃষ্ণ মানবিক প্রেমের প্রতীক মাত্র। নজরুলের প্রকৃতি-সংগীতগুলিও চিত্রকল্প ও ভাষার কারুকার্যে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে।

'চন্দ্রবিন্দু' সংগীতগ্রন্থের আঠারোটি গান ও 'সুরসাকী' সংগীতগ্রন্থের কয়েকটি গান নজরুলের হাসির গানের উল্লেখ্য নিদর্শন। হাসির গানগুলিতে হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনাসম্পন্ন দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ, নতুবা মানবপ্রেম ও ধর্মসম্বন্ধীয় লঘু রঙ্গরস স্থান পেয়েছে। যথার্থ অশ্রুসজল 'হিউমার'-এর পরিবর্তে ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং রঙ্গরসই তাঁর হাসির গানে প্রধান স্থান লাভ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষার রুচিহীনতা এবং ভাবের দৈন্য ও স্থূলতাও দেখা যায়। তবে বিষয়বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

"দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের,
রাজা আংরেজ হারাম-খোর।
ওদের পোষাকের চেয়ে অঙ্গই বেশী,
হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর।
আর মেয়েরা ওদের মদ্দের সাথে
রাজপথে করে গলাগলি,
আরে শুধু তাই নয়, নাচে গলা ধরে
ব্যাণ্ড বাজায়ে ধলাধলী॥"

সুরসৃষ্টিতে নজরুল অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পাশ্চাত্ত্য সংগীত ও হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী সুরের সংমিশ্রণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও ইওরোপীয় সুর কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছেন। প্রথম জীবনে ক্লাসিকাল রাগরাগিণী দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হলেও রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ বিভিন্ন সুরমিশ্রণে একটি নিজস্ব সুরলোক সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী সুরও তাঁর গানে স্থান পেয়েছে। অতুলপ্রসাদ বাংলার গ্রামগীতি ও লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী উভয়ের সুরকেই গ্রহণ করেছেন। আর নজরুল, উত্তর-ভারতীয়

রাগরাগিণী ও ধ্রুপদ, ঠুংরীর সুরের সঙ্গে বাউল ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী, ঝুমুর বা আরও অনেক লোকগীতির সুর নিজের গানে গ্রহণ করেছেন। শুধু রাগসংগীত বা লোকসংগীত নয়, পারস্যের গজল এবং আরবী গান ও নাচের সুরও তিনি নিয়েছেন। তাঁর এই দেশী বিদেশী সুর-সংমিশ্রণ বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। কীর্তন, ভজন, ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, রাগপ্রধান প্রভৃতি গান রচনা করে তিনি বঙ্গীয় সুর-সরস্বতীর সম্পদ বর্ধন করেছেন। এই ভাঙাগড়া বা মিশ্রণ নজরুলের স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা সম্পন্ন বলে কখনই তা যান্ত্রিক বা কৃত্রিম হয় নি। তাঁর সুরবৈচিত্র্য-সাধন যথার্থই সার্থক।

শুধু সুরে নয়, গীতভাবনাতেও তিনি বৈচিত্র্যসাধন করেছেন। নজরুলের কাব্য ও গীতিরচনার সময়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা ছিল মধ্যাহ্নগগনে দীপ্যমান। রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের বিপুল বৈচিত্র্যের পূর্ণ বিকাশ সে যুগেই। নজরুলের সামনে সেই বৈচিত্র্যের আদর্শ সর্বদা জাগরূক ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত—উভয়েই রবীন্দ্রসংগীত-শাখার পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্বেই পরলোকগমন করেন। আর অতুলপ্রসাদেরও অধিকাংশ গান সে যুগের পূর্বেই রচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি অনেক পরিমাণে প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছিলেন তৎপূর্বেই। কিন্তু নজরুল রবীন্দ্র-গীতসাহিত্যের পরিপূর্ণ বৈচিত্র্যের স্বাদ ও বিচিত্র গতির নির্দেশ পেয়ে-ছিলেন সর্বৈবরূপে এবং নিজের গানকেও বিচিত্র করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে বৈচিত্র্যসাধনে নজরুল অদ্বিতীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অন্যান্য কবিদের সামনেও ছিল, কিন্তু কেউই এ পথে অগ্রসর হয়ে তদনুরূপ সার্থকতা অর্জন করেন নি। আবার সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, নজরুল কখনও রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও, তিনি স্বাধীন পন্থা অনুসরণ করেই সংগীতে বৈচিত্র্য এনেছেন। রবীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত অথচ রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত হয়ে তাঁর রচনাকার্য চলেছিল এটা কম কথা নয়। সে যুগের আর কেউ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে অথবা স্বাধীন পন্থায়—এই বিচিত্রতার পথের পথিক হন নি।

নজরুলের রচনা সংখ্যাতেও বিপুল। তবে গানগুলি অনেকাংশেই কারও ফরমায়েস বা কোনো প্রয়োজনের তাগিদে অথবা সাময়িক কারণে রচিত। তার ফলে অনেক গানই স্থায়ী মূল্য লাভের যোগ্য হয় নি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে চঞ্চলতা, অ-স্থিতি লক্ষ করা যায়; সাহিত্যজীবনেও তার প্রকাশ আছে। অনেক ক্ষেত্রেই গানগুলি অন্তর থেকে সৃষ্ট নয়, নির্মাণমাত্র এবং সেই কারণেই

অ-সার্থক। যে গানগুলি হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিজাত, সেগুলি স্থায়ী মূল্য লাভ করেছে। বহু স্বদেশপ্রেমের গানে, মানবিক প্রেমের গানে, প্রকৃতির গানে এই অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির পরিচয় আছে। বস্তুতঃ নজরুলের যে অসাধারণ প্রতিভা ছিল, তিনি তার বহু অপচয় করেছেন। বসন্তের উন্মাদনায় তিনি ফুল ফুটিয়েছেন অজস্র, কিন্তু সবই ফলবান হয় নি। যেগুলি ফলবান হয়েছে, সেগুলি যথার্থই মূল্যবান।

তথাপি, বিষয়বৈচিত্র্যে, ভাবেব বিভিন্নতায়, সুর ও শিল্পকলার নৈপুণ্যে এবং সংখ্যাধিক্যে নজরুলগীতি বাংলা গীতসাহিত্যেব ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নজরুলের গানে যে প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আছে, তা বাংলা গীতসাহিত্যেব অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ নজরুল-গীতরচনাব যথাযথ বিচার এখনও হয় নি। কাবণ কালগত ব্যবধান ব্যতীত সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। তা ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কাবণেও তাঁর সম্পর্কে নানা মতামত প্রচলিত আছে। সেই সব সাময়িক মতামতের উর্ধ্বে নজরুল-গীতি সম্পর্কে দেশ-কাল-ধর্ম-সমাজ-নিরপেক্ষ চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্যাযন এখনও হয় নি, ভবিষ্যতে হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুল—এই চারজন গীতশিল্পীব মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল কবি হিসাবেও সুবিখ্যাত এবং তাঁদের কাব্যের সংখ্যা কম নয়। সেজন্যই এই দুজনেব গীতরচনায় কাব্যশিল্প সুপবিস্ফুট, অর্থাৎ শব্দে, ছন্দে, অলংকারে ওঁদের গানগুলি সুপাঠ্য। অতুলপ্রসাদের গীতরচনা ভাবসমৃদ্ধ হলেও ছন্দ সর্বদা সুনিয়মিত বা সুপরিমিত নয়, অনেক সময় পড়তে গেলে তাল কেটে যায়। আর রজনীকান্তের রচনায় ছন্দপতন তেমন না ঘটলেও, তাঁর অনেক গানই ভাবৈশ্বর্যে ও ভাবোৎকর্ষে তুল্যমূল্য নয়। অর্থাৎ এই চাবজন শিল্পীর মধ্যে ভাবৈশ্বর্য ও কাব্যগত শিল্পোৎকর্ষ—দুটির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের রচনায়। এঁদের গান 'সুরের সহযোগিতা' ছাড়াও 'গীতিকাব্যরূপে অনুসরণ' করা যায়। এঁরা যথার্থ গীতসাহিত্য-স্রষ্টা।

এই দুজনের মধ্যে নজরুলের গানের সংখ্যা অনেক বেশি। অবশ্য তার সবগুলিই সাহিত্যের আসরে আদরণীয় নয়। যেগুলি সমাদরের যোগ্য, সেগুলি নজরুলপ্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। দ্বিজেন্দ্রগীতির সংখ্যা তত বেশী না হলেও, অধিকাংশ গানই কবির বিশিষ্ট রচনাশৈলী ও ভাবগভীরতা দ্বারা চিহ্নিত। বস্তুতঃ দুই কবিই স্ব-ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা প্রদর্শন করে বাংলা গীত-

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে অন্তত: হাসির গানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অগ্রগণ্যতার দাবি করতে পারেন। তাঁর 'বেদনাভরা প্রাণ' বাঙালিকে যেভাবে বেদনা দিয়েছে এবং 'হাসির ছলে লাজদান' করেছে তার তুলনা নিঃসন্দেহে বিরল। সে ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই তাঁর দাবি সর্বাগ্রে।

## পঞ্চম অধ্যায়

# উপসংহার

### বাংলা গীতসাহিত্যের সার্থকতম পরিণতি

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গীতসাহিত্য এবং রবীন্দ্র-সমকালীন আধুনিক গীতকারদের সম্পর্কে আলোচনার শেষে, বাংলা গীতসাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় গীতকবিরূপে রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। অবশ্য এ কথা নতুন নয়, সর্বজনবিদিত ও সর্বজনস্বীকৃত সত্য। সংগীতকার রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষ ও বিশিষ্টতার স্বরূপ কি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে এই কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় যে অধুনা-পূর্ব যুগের রাজকবি জয়দেব-বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবি, রামপ্রসাদের ন্যায় সাধক কবি, লালন-শাহ্ প্রমুখ বাউল কবি এবং আধুনিক যুগের দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল—এঁরা কেউই তুচ্ছ নন, এঁদের সৃষ্টিশীল রচনা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ গৌরবময় সম্পদ।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতই গীতশাখাতেও রবীন্দ্রনাথের মহিমময় প্রতিভা সফলতার তুঙ্গে আরোহণ করেছে এবং বলা চলে যে গীতশাখাতেই তাঁর কবিপ্রতিভা পূর্ণতম স্ফূর্তি লাভ করেছে। তার কারণ গানের মধ্যেই কবি তাঁর জীবনের ও বিশ্বের সমগ্র সত্তা ও স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিলেন সবচেয়ে বেশি।

> "চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই-সমস্ত চোখে-দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কী নূতন অর্থলাভ করে।...এই [ বিশ্বের ] অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর-কিছু না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতি বিচিত্র সংগীতরূপেই প্রকাশ পাইত, তবে অক্ষররূপে নহে, বাণীরূপেই আমরা সমস্ত পাইতাম। গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার-আয়তন-হীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে—তখন

১৮এ ৬

গানের ভিতর
~~সুরের মধ্যে~~ দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধূলায় ধূলায় জাগে পরম বাণী।

তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে
তখন আমার হৃদয় তারি কাঁপে ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।

পাণ্ডুলিপি : 'গানের ভিতর দিয়ে যখন' (১১২)

রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ

যেন বুঝিতে পারি, জগৎটাকে যে-ভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কতরকম ভাবেই যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত, তাহা আমরা কিছুই জানি না।"

—'জীবনস্মৃতি', গ্রন্থপরিচয় : গীতচর্চা

এর সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত একটি গান আবারও মনে পড়ে।

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী।"

সংগীতরসধারায় নিবিড় আত্মনিমজ্জনেই ছিল কবির যথার্থ আনন্দ। 'আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে'। তাই বলেছেন ('সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা ৬) —

"আমি যখন গান বাঁধি তখনই সব চেয়ে আনন্দ পাই। ...গানে যে আলো মনের মধ্যে ছিটিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন ক'রে, নতুন ক'রে।"[১]

রবীন্দ্রসংগীত ভাবে, রূপে, রসে বহুবিচিত্র। 'জগতের বিচিত্ররূপিণী'কে কবি যেন তাঁর গীতরচনায় ধরে রেখেছেন, 'সুরের বাঁধনে'।

"বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা— এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, র রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার পর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।"

—'আত্মপরিচয়', চতুর্থ প্রবন্ধ

বিচিত্র রূপগুলিকে সাজিয়ে তোলাই নয়, তাদের ঐক্য ও সংগতি দান [illegible] কাজ। কেননা, এই ঐক্য স্থাপনাতেই শিল্পীর সার্থকতা।—

[১] প্রসঙ্গে মনে পড়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সুবিখ্যাত পঙ্‌ক্তি—'The light that was never on sea or land'.

"Art is never an exhibition but a revelation। exhibitionএর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelationএর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে।"

—'সংগীতচিন্তা', সুর ও সংগতি

এই পরিপূর্ণ ঐক্য বা সামঞ্জস্য স্থাপনাতেই রবীন্দ্রনাথের গীতসাধনার চরম পরিণতি ও 'পরমা সিদ্ধি'।

বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ঐক্য ও গভীর সত্তাকে উপলব্ধি করাই ছিল বিশ্বকবির সাধনা। তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তার মধ্যেও ছিল সেই রকমই এক সমগ্রতা। তাঁর জীবনতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব, আনন্দতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব সবই এক অখণ্ড বিশ্ববোধ-জাত। জগৎ ও জীবন কবির দৃষ্টিতে নদীর ধারার মতই বিরামহীন, ছেদহীন ('বলাকা,' ৮)। ব্যক্তিজীবন সেই অখণ্ড প্রাণপ্রবাহের উর্মিলীলা মাত্র। পরন্তু শুধু চেতন জগৎই নয়, অচেতন জড় জগতের সঙ্গেও তাঁর নিবিড়, গভীর একাত্মতা। অসামঞ্জস্য, ছেদ, বিরোধ কবির দৃষ্টিতে ছিল না, তাঁর সৃষ্টিতেও নেই। তিনি ছিলেন বিশ্বজগতের সুষমায় বিমুগ্ধ।

"আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন।"

—'রোগশয্যায়', ২১, সকালে জাগিয়া উঠি

রবীন্দ্রসংগীতে পূজা, মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম সবই পরস্পর অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। কোনটিকেই পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। তাঁর পূজা ও প্রেম অঙ্গাঙ্গীরূপে সংবদ্ধ, কেননা 'যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা'। আবার প্রকৃতির মধ্যেও তিনি পেয়েছিলেন বহুবিচিত্রের সঙ্গে পরম একের সন্ধান, বিশ্বরূপে দেখেছিলেন সেই অরূপেরই প্রতিফলন। জীবনের শেষে তাই জগৎ তাঁর চোখে দেখা দিয়েছিল নবতর রূপে—

"রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।"

—'শেষলেখা', ১১, রূপনারানের কূলে

আবার জীবন-সায়াহ্নে মানুষের মধ্যেই খুঁজে পেলেন 'মানবব্রহ্ম'কে, 'পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ'। এই ভাবগত সৌন্দর্য, সংহতি ও সমগ্রতা বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। মহাবিশ্ব ছন্দোময়, সেই 'বিশ্বতালে রেখে তাল' রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনা করেছেন। ফলে তাঁর গানে শুধু ভাবগত সংহতি ও সুষমাই নয়, অঙ্গগত সুষমতাও দেখা দিয়েছে। বৈষম্য ছিল না কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে; তাঁর রচনাতেও ভাবে, ভাষায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোথাও বৈষম্য বা বিরোধ নেই, আছে পরিপূর্ণ সুষমা ও নিটোলতা। গানগুলি শব্দে, ছন্দে, অলংকারে সুসমঞ্জস, সম্পূর্ণ। সুরের সাহায্য ব্যতিরেকে 'গীতিকাব্য' রূপেই এগুলি পড়া যায়। আবার, গীতরচনার ছন্দের সঙ্গে গানের তালেরও কোন বিরোধ নেই। অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীতে, ধ্বনির সঙ্গে বাণীর এবং বাণীর সঙ্গে ভাবের অসাধারণ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। শব্দ এবং অলংকার-প্রয়োগেও সেই অসাধারণতার প্রকাশ। কোথাও কৃত্রিমতা নেই, আতিশয্য নেই; নিপুণ ও নিখুঁত শব্দ বা অলংকার ব্যবহারের দ্বারাই রচনা সার্থক পরিণতি ও ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ভাবগত বা রূপগত এতখানি সামঞ্জস্য ও পরিপূর্ণতা বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, বিশ্ব সাহিত্যেও আর কোনো শিল্পীর রচনায় আছে কি না বলা শক্ত।

রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দে একদিকে জয়দেবীয় সংস্কৃত রীতি, অন্যদিকে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতি, ভাষার পরিধিতে একদিকে তৎসম শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ পদ, অন্যদিকে একেবারে লৌকিক ও মৌখিক শব্দ—গীতভাবনায় সৌন্দর্যোপলব্ধির এমন বিচিত্র প্রকাশ, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের এমন অচিন্তনীয় সমন্বয়, জীবনবোধের এমন বিস্তৃতি ও সংহতি, এমন উচ্চতা ও গভীরতা—সব মিলিয়ে চিন্তা ও মননের এতখানি বিস্তার ও ভাবরূপের এত বৈচিত্র্য আর কোনো সাহিত্যে আছে বলে জানি না। কত গভীর তত্ত্ব, কত অতলস্পর্শী ভাবনা কত সহজে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর গানে ইহলৌকিক জগৎ যেন অতিলৌকিক জগতে পৌঁছে যায়। সে জগৎ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, এমন কি মননেরও অতীত—'অবাঙ্‌মনসগোচরম্'। অথচ তা দুর্বোধ্য, জটিল বা অবাস্তব নয়। রবীন্দ্রপ্রতিভার মোহমন্ত্রে যে ইন্দ্রিয়াতীত রসবোধ ও রসোপলব্ধি ঘটে, তাকে হৃদয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গানগুলি ভাবে এবং রূপে, অনুভূতিতে এবং গঠনে অখণ্ড ও অপূর্ব। তাদের যেমন রূপ ও রেখা, তেমনই সৌরভ। এর উপরে সুরের আলো পড়লে যে আভা ও দ্যুতি বেরোয়, তা ব্যাখ্যাগম্য নয়। কবি তাই নিজেই বলেছেন 'আপন গানের কাছেতে আপনি হারি'।

ধনুকের ছিলাকে আঁট করে বাঁধলে যেমন সহজে লক্ষ্যবেধ করা যায়, তেমনই শব্দে, ছন্দে, অলংকারে, ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি এমনই আঁট করে বাঁধা যে সেগুলি অনায়াসে মর্মস্থান বিদ্ধ করে। বাংলা ভাষায় গীতসাহিত্যের অভাব নেই কিন্তু গীতসাহিত্য যে এমন অসাধারণভাবে পূর্ণাঙ্গ, নিটোল ও সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে, এ কথা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। অন্যান্য গীতকবির রচনায় প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ দেখা গেলেও, গানের এমন সামগ্রিক রূপ আর কোথাও চোখে পড়ে না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, ছোট গল্প, বড় কাব্য, ছোট কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন প্রভৃতি বিচিত্র শাখা পরিপুষ্টি লাভ করেছে বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনায়। এই শাখাগুলির চর্চায় ও বিকাশে রবীন্দ্রনাথকে অগ্রণী বলা যায় না, যদিও এই সমস্ত ধারাকেই তিনি নূতনতর সার্থকতায় মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালে গীতসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোন পূর্ব-সূরীর অনুবর্তন করেছেন বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে তিনিই একাধারে প্রবর্তক ও শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, এ কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। তাঁর প্রদর্শিত পথে আরও অনেকে অগ্রসর হলেও, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই আধুনিক গীতসাহিত্য-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি।

চর্যাগীতি-পদাবলী থেকে শুরু করে যে গীতসাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগে, রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের ঊষর মরুভূমিতে সে ধারা প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ভগীরথের ন্যায় সে ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে ও নূতন সার্থকতার পথে প্রবাহিত করে, অবশেষে অভাবনীয় ব্যঞ্জনার সমুদ্রমোহানায় এনে পৌঁছে দিলেন। চর্যাগীতির গোমুখীতীর্থে যে নির্ঝরিণীর উদ্‌ভব, বহু শতাব্দীর সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করে তার সুগভীর ও সুপ্রশস্ত প্রবাহ অবশেষে পরিণতি লাভ করল 'গীতবিতানে'র সাগরসঙ্গমে। 'শতেক যুগের কবিদলে মিলি' যে কাজের শুভ-সূচনা করেছিলেন, তাকে পরিপূর্ণতা দান করলেন একা রবীন্দ্রনাথ। এখানেই সাহিত্য ও শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মহত্তম অবদান এবং বাঙালির গীত-সাধনার সার্থকতম পরিণতি।

---

# উৎসনির্দেশ

## নির্বাচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা

### গ্রন্থ


শ্রীঅজিত দত্ত—'বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস'

অতুলপ্রসাদ সেন—'গীতিগুঞ্জ'

অমিয়কুমার সেন—'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ'

অমিয়কুমার সেন ও শ্রীমতী নীলিমা সেন—'সুরের গুরু'

শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব—'পান্থজনের সখা'

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী—'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' : বসুমতী

কাজী নজরুল ইসলাম—'নজরুলগীতি' : হরফ প্রকাশনী

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা',

চন্দ্রমোহন ঘোষ—'ছন্দঃসারসংগ্রহ', ১৮৯৩

'জয়ন্তী উৎসর্গ'—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৌষ ১৩৩৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য—'রবীন্দ্রচর্যা'

শ্রীদিলীপকুমার রায়—'তীর্থংকর', ১৩৫১, কালচার পাবলিশর্স ; 'সাঙ্গীতিকী' ১৯৩৮, কলকাতা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—'দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী' : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'কথা ও সুর', ভাদ্র ১৩৪৫ , 'সুর ও সংগীত' শ্রাবণ ১৩৪২

শ্রীমতী পম্পা মজুমদার—'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস'

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', ১৩৫৬ ; 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত', ১৩৫৬ ; 'ছন্দপরিক্রমা'

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রজীবনী' ; 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী', প্রথম খণ্ড

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্কিম রচনাবলী' : সাহিত্য সংসদ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়' ; 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'

মধুসূদন দত্ত—'মধুসূদন গ্রন্থাবলী' : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

শ্রীমতী মানসী মুখোপাধ্যায়—'অতুলপ্রসাদ'

রজনীকান্ত সেন—'রজনীকান্ত রচনাসম্ভার' : মিত্র ও ঘোষ

রথীন্দ্রনাথ রায়—'দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার'

'রবীন্দ্রায়ণ'—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'অচলায়তন', 'আত্মপরিচয়'; 'আত্মশক্তি'; 'আধুনিক সাহিত্য'; 'উৎসর্গ'; 'কড়ি ও কোমল'; 'কথা ও কাহিনী'; 'কল্পনা'; 'কালান্তর'; 'ক্ষণিকা'; 'খেয়া'; 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' ১৩০০ বৈশাখ; 'গীতবিতান', ১ম সং, ২য় সং ও অখণ্ড সং; 'গীতাঞ্জলি'; 'গীতালি'; 'গীতিমাল্য'; 'গোরা', 'চিঠিপত্র'; 'চিত্রা'; 'চৈতালি'; 'ছন্দ' ৩য় সং ১৩৫৬; 'ছবি ও গান'; 'ছিন্নপত্রাবলী', 'ছেলেবেলা'; 'জন্মদিনে'; 'জীবনস্মৃতি' ১৩৫৬; 'তাসের দেশ'; 'নটীর পূজা'; 'নৈবেদ্য'; 'পঞ্চভূত'; 'পত্রপুট'; 'পথে ও পথের প্রান্তে'; 'পরিত্রাণ'; 'পলাতকা'; 'পুনশ্চ'; 'প্রবাহিণী; 'প্রাচীন সাহিত্য'; 'বলাকা'; 'বাউল'; 'বিচিত্র প্রবন্ধ'; 'মানসী'; 'মানুষের ধর্ম'; 'রবিচ্ছায়া' ১২৯২ বৈশাখ; 'রোগশয্যায়'; 'লোকসাহিত্য'; 'শারদোৎসব'; 'সংগীতচিন্তা'; 'সমালোচনা', 'সাহিত্য'; 'সাহিত্যের স্বরূপ'; 'সোনার তরী'; 'The Religion of an Artist'; 'The Religion of Man'.

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ—'রবীন্দ্রসঙ্গীত'

শিবনাথ শাস্ত্রী—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ভাদ্র ১৩৬২

সজনীকান্ত দাস—'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য', ১৩৬৭

শ্রীসন্তোষকুমার দে ও শ্রীকল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য—'কবিকণ্ঠ'

শ্রীসরোজকুমার বসু—'রবীন্দ্ররঙ্গ'

শ্রীসুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া—'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি'

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত—'নজরুল-চরিতমানস'

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'রবীন্দ্রনাথের গান', সংশোধিত সং

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'কবিতাবলী'

**Arnold A. Bake—'Indian Music and Rabindranath Tagore', The Indian Society.**

**Krishna Kripalani—'Tagore, A Life'**

**'Tagore 1861-1961', A Centenary Volume, Sahitya Akademi.**

## পত্রপত্রিকা

গীতবিতান পত্রিকা—রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা

দেশ — সাহিত্যসংখ্যা ১৩৫৬,

প্রবাসী — জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

বঙ্গদর্শন — আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা, ১৩১২

বিশ্বভারতী পত্রিকা —বৈশাখ-আষাঢ়, ১৮৮০ শকাব্দ; কার্তিক-পৌষ

ভাণ্ডার — আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা, ১৩১২

## প্রবন্ধ

শ্রীঅমলেন্দু বসু—'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা', রবীন্দ্রায়ণ প্রথম খণ্ড

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী—'গানের গান', গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী—'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ', জয়ন্তী উৎসর্গ, পৌষ ১৩৩৮

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রনাথের সংগীত', জয়ন্তী উৎসর্গ, পৌষ ১৩৩৮

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—'বাণী ও বীণা', গীতবিতান পত্রিকা, ১৩৫৬, 'রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতবর্ষ', দেশ, ১৩৫৬, 'রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ', বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৬, 'রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ', সম্মেলনী, আশ্বিন ১৩৫৬, 'পরিচয়', কবিকণ্ঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'কঙ্কাবতী'র সমালোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে (১৩৫৪) সংকলিত

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র—'রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা', রবীন্দ্রায়ণ দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার—'রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহ্য', গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা; 'রবীন্দ্রসংগীতের গায়কি', দেশ, সাহিত্যসংখ্যা

শ্রীসাহানা দেবী—'কবির সংস্পর্শে', রবীন্দ্রায়ণ দ্বিতীয় খণ্ড

Dhurjati Prasad Mukerji—'Tagore's Music', Tagore 1861

# নির্দেশিকা

গ্রন্থভুক্ত যাবতীয় নাম-নির্দেশ সংবলিত এই বিভাগটিকে ব্যবহারের সুবিধার্থে 'রবীন্দ্রসাহিত্য', 'অন্যান্য ব্যক্তি ও সাহিত্য' এবং 'নানা প্রসঙ্গ' এই তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করা গেল। কেবল বাহুল্য বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য গীতকারের রচিত গানের নামোল্লেখ করা হয় নি, গীতগ্রন্থগুলির নামনির্দেশ আছে মাত্র। গ্রন্থের পাদটীকাভুক্ত শব্দগুলি নির্দেশ করা হল পৃষ্ঠাঙ্কের ঊর্ধ্বকোণে মুদ্রিত পাদটীকার সংখ্যাক্রমসূচক অঙ্কচিহ্নের দ্বারা।

## রবীন্দ্রসাহিত্য

## অন্যান্য ব্যক্তি ও সাহিত্য

সাহিত্যের নাম উদ্ধৃতিচিহ্ন-সূচিত। পৃষ্ঠাঙ্কের ঊর্ধ্বকোণে মুদ্রিত সংখ্যা পাদটীকার ক্রমাঙ্কসূচক।

পত্র-পত্রিকা



নানা প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের বিস্তীর্ণ গীতবিতানের সুর-তাল-মাত্রা, রাগ-রাগিণী ইত্যাদি নিয়ে, গীতাবলীর উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে, এমন কি তাদের তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু সার্থক আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে, প্রায়শ হচ্ছে ; ক্রমশ আরও বেশী হবে, সন্দেহ নেই। বাংলা গান মুখ্যত কথা বা প্রবন্ধ-সংগীত, রাগপ্রধান মার্গসংগীত নয় এবং যেহেতু তার চরিত্রে কথার প্রাধান্য সেই হেতু সাহিত্যমূল্যকে কিছুতেই অবজ্ঞা করা চলে না। আর, যিনি কবিশ্রেষ্ঠ সেই রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সাহিত্যমূল্যের প্রাধান্য স্বীকার না করে তো কোনও উপায়ই নেই।

পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী সুপ্রভা সেন-এর 'রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্য' গ্রন্থটি যে কবির গীতবিতানের সাহিত্য-মূল্যেরই আলোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা তা তো গ্রন্থটির শিরোনামাতেই সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা গীতসাহিত্য থেকে সুরু করে রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁর গানের স্থান, তাঁর গীতসাহিত্যের বিবর্তন ও পর্ব-বিভাগ, গানগুলির ভাবসম্পদ, ভাষা ও ভাবানুষঙ্গ, আঙ্গিকবিচার, ছন্দ, অলংকরণ প্রভৃতি নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় এই গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে নানা বিভিন্ন অধ্যায়ে ; এই আলোচনা স্পষ্ট, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন গীতরচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ইসলামের গানের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনাও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বাংলা গীতসাহিত্যের চরম পরিণতি যে রবীন্দ্রনাথে— এ কথাটি বইটিতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

বইখানা পড়ে আমি পরম প্রীতিলাভ করেছি।

নীহাররঞ্জন রায়